"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্ পরিচালিত

বিংশতিতম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা — ফেব্রুয়ারী, 1974

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

স-ব-চে-য়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জন্ম —1লা জানুয়ারী, 1894 মৃত্যু—4ঠা ফেব্রুয়ারী, 1974

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মহাপ্রয়াণে আমরা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ও কর্মীবৃন্দ—গভীর শোকসন্তপ্ত। তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রতি আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

গত 1লা জানুয়ারী (1974) বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অশীতিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর আব্দুল মোতিন চৌধুরী বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চিত্রের বামপার্শ্বে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ, মধ্যস্থলে ডক্টর সেন ও মাইক্রোফোনের সম্মুখে ডক্টর চৌধুরীকে দেখা যাইতেছে।
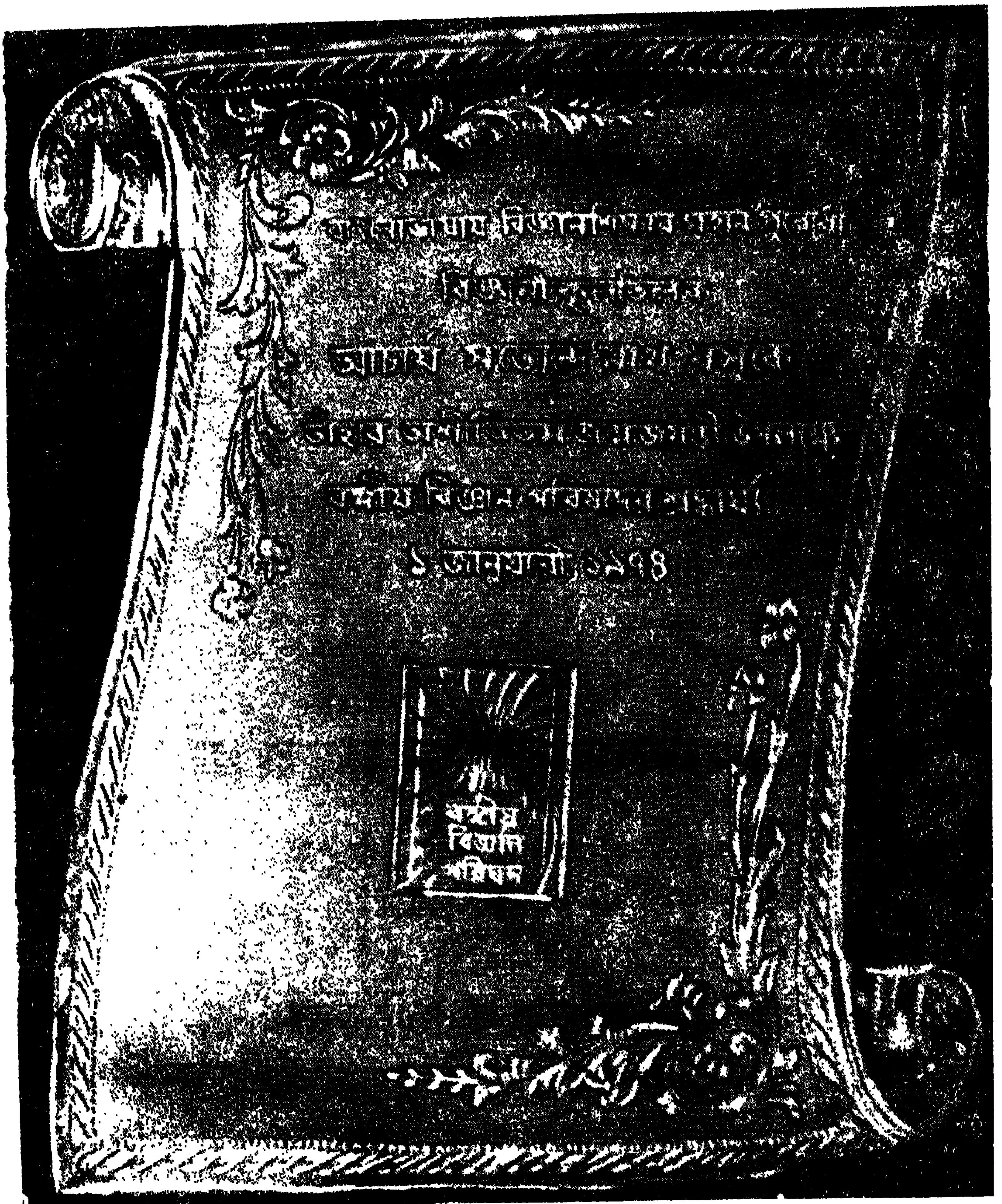
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অশীতিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গত 1লা জানুয়ারী (1974) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে প্রদত্ত রৌপ্যফলকে উৎকীর্ণ মানপত্রের প্রতিলিপি।
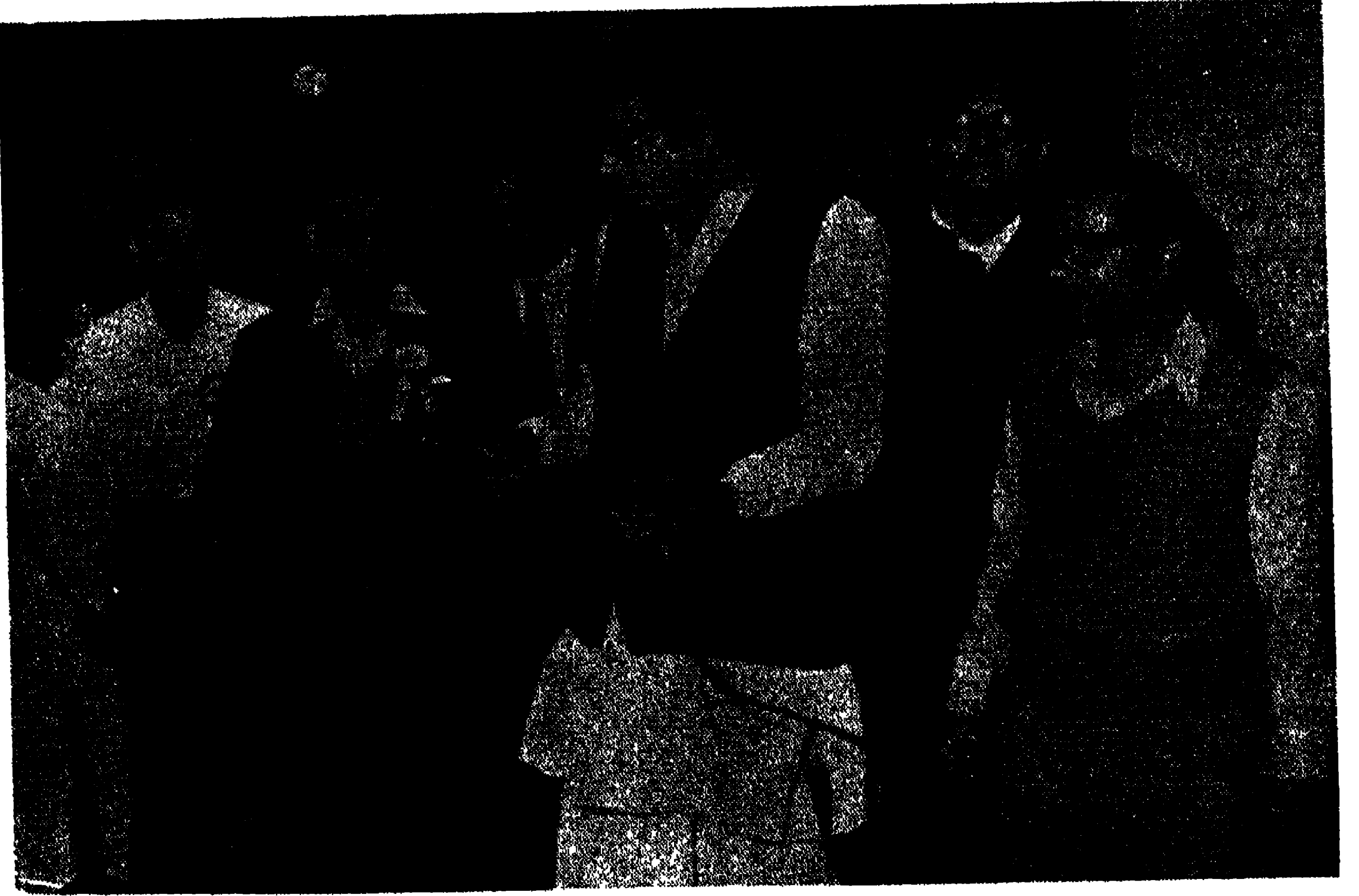
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অশীতিতম জন্মজয়ন্তী ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিজ্ঞান কলেজে আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (উপরের চিত্র)। অনুষ্ঠানের পর শ্রীরায় প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন (নীচের চিত্র)।

[বিশেষ রচনা 96নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তবিংশতিতম বর্ষ　　ফেব্রুয়ারী, 1974　　দ্বিতীয় সংখ্যা

ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধনার ধারা

বিজ্ঞানের সাধনা কোন দেশ, জাতি বা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে ব্যবহারের তাগিদে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে আদিম যুগ হইতেই বুদ্ধিমান মানুষ বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করিয়া আসিয়াছে। ভারতে বৈদিক যুগে বেদশাখার অনুশীলনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকাণ্ডের পাশাপাশি সেই যুগের মানুষ পার্থিব বিজ্ঞানের চর্চাও করিয়াছে। অথর্ববেদ হইতে তাহার নিদর্শনগুলি উদ্ধার করিয়া শঙ্করাচার্য Vedic Mathematics বা বৈদিক গণিত (বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত) নামক পুস্তক সংকলন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে যে সূত্রগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যায় বৈদিক যুগের ভারতীয় গণিত যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

পরবর্তী কালে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, লীলাবতী, ভাস্করাচার্য, নাগার্জুন, শ্রীধর, চরক, সুশ্রুত প্রমুখ যে সব বিজ্ঞানীর নাম ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে—তাঁহাদের সাধনার ধারা ছিল একান্ত ভারতীয়। বৈশেষিক দর্শনে কণাদ সূক্ষ্মতম বস্তুকণার ধারণা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে আধুনিক বিজ্ঞানের পরমাণুসম্পর্কিত ধারণার ইঙ্গিতরূপে তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। ভারত যে শুধু আধ্যাত্মিক ধর্ম ও দর্শন সাধনার পীঠভূমি নহে—বস্তু বিজ্ঞানের সাধনায় যে ভারতীয় ধারা প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে প্রবহমান আছে, তাহা বিস্মৃত হইবার নহে। গ্রীস, আরব, চীন প্রভৃতি তৎকালীন সুসভ্য দেশগুলির পাশাপাশি ভারত গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থতত্ত্ব, রসায়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে নিজস্ব সাধনার স্বাক্ষর রাখিয়াছিল, তাহাতে ভারতবাসী

গৌরব বোধ করিতে পারে। প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশ ও ভাবাভাষীর মধ্যে মত বিনিময়ের বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না। তাই অন্যান্য দেশের মত ভারতীয় বিজ্ঞানিগণ স্বাধীনভাবেই তাঁহাদের সাধনার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় নবজাগরণের ফলে সারা পৃথিবীব্যাপী চিন্তাজগতে একটি নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়া যায়। তাহার মূলে ছিল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্মেষ। সেই নবজাগরণের ঢেউ ভারতেও আঘাত হানিয়াছিল। আধুনিক শিক্ষার বহুল প্রচারের জন্য সেই সময় এই দেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন প্রচেষ্টা তখন সম্ভব হয় নাই। তখন সরকারী আনুকূল্যই যে শুধু পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে—বিদেশী শাসক-গোষ্ঠী আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু শিক্ষক এই দেশে আমদানী করিয়াছিল, কিন্তু সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণার প্রসার করা প্রয়োজন মনে করে নাই। সেই যুগে ভারতীয় আধুনিক বিজ্ঞানের পথিকৃৎ, যিনি বিদেশে বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করিয়া ভারতের মাটিতে পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণার প্রথম প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। বিদেশী বিজ্ঞান-সাধনার ধারা তিনিই প্রথম এই দেশে আমদানী করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ধারার অনুসরণে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। যদিও বেতার-বিজ্ঞানে তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে, কিন্তু জড় ও জৈব চেতনার সমন্বয়ী যোগসূত্র সন্ধানে তিনি যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভারতীয় ধারার নিজস্ব সম্পদ। সেই যুগের পটভূমিতে জগদীশচন্দ্রের অবদানের মূল্যায়ন প্রয়োজন। নবীন ভাবধারার সহিত সমন্বয়ের সাধনায় সেদিন ভারতের প্রতি ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল বৈপ্লবিক প্রয়াস। আমেরিকায় ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। সমাজে, সংস্কৃতিতে চলিয়াছে সমন্বয়ের সাধনা। এই সমন্বয়ের সাধনায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকের অন্তর লইয়া তিনি যেন এক নূতন সমন্বয়ের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিলেন। সেই যুগে একক প্রচেষ্টায় তিনি যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, বহু বৈজ্ঞানিক একযোগে এই সাফল্য লাভ করিতেন কিনা সন্দেহ আছে। তাঁহার এই সাধনার ফল প্রচারে বিদেশে তাঁহাকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার চিন্তাধারা হইতে বিচ্যুত হন নাই। সাধনার ধারা যাহাই হউক না কেন, বিজ্ঞানের আবেদন সার্বজনীন। সাইবারনেটিক্স (Cybernetics) নামে বিজ্ঞানের যে শাখা বর্তমান একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, জগদীশচন্দ্রের গবেষণা যে তাহার ইঙ্গিত দিয়াছিল—ইহা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান যুগে জড় ও শক্তির অভিন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। জীব-বিজ্ঞানের প্রগতি আজ এমন একটি পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে জড় ও জীবনের অভিন্নতা প্রমাণের যোগসূত্রটি হয়তো খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। সে দিন জগদীশচন্দ্রের অবদানের গুরুত্ব বিশ্ববাসী উপলব্ধি করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। তাহার প্রতিষ্ঠিত বোস ইনষ্টিটিউট ভারতের বিজ্ঞান-সাধনাকে আধুনিক ধারায় সঞ্জীবিত করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসুর বিজ্ঞান-গবেষণাও ভারতীয় বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান। পদার্থ-বিজ্ঞানে মহাজাগতিক রশ্মি ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে এদেশে নির্মিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি যে গবেষণার পথিকৃৎরূপে চিহ্নিত, ভারতবাসী-মাত্রেই তাহা চিরকাল স্মরণ করিবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে যাঁহার ত্যাগীর আয়নন জন্য জ্যোতির্পদার্থ-বিজ্ঞানে সঠিক পথ

নির্দেশ করিতে পারিয়াছিল। পরবর্তী কালে বিজ্ঞানী ল্যাংমুইর (Langmuir) সাহার সূত্রের সাহায্যে সাধারণ মৌলিক পদার্থের তাপজনিত আয়ননের মাত্রা পরিমাপে যে সমীকরণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সাহা-ল্যাংমুইর সমীকরণ নামে আখ্যাত হইয়াছে। কঠিন পদার্থের তাপীয় আয়নন সমস্যায় অর্ধশতাব্দীর পরেও এই সমীকরণের উপযোগিতা কমে নাই। সাহার আবিষ্কারের প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিজ্ঞানী লক্‌ইয়ার একটি পরীক্ষায় তাপ ও আয়ননের মাত্রার সম্পর্ক লইয়া নিজের গবেষণাগারে কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন—কিন্তু সেই ফলাফলের উপর কেহ গুরুত্ব দেয় নাই। সাহার আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাপীয় আয়নন সম্পর্কে গবেষণার সাড়া পড়িয়া গেল। এই সময় লকইয়ারের বিধবা পত্নী মিসেস লক্‌ইয়ার অধ্যাপক সাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া লিখিয়াছিলেন, "আমার স্বামীর গবেষণার ফল এতদিন অবজ্ঞাত ছিল, আপনার মহান আবিষ্কারের ফলে তাহার গুরুত্ব বিজ্ঞানী সমাজে ধরা পড়িয়াছে, সেই জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ"। নোবেল পুরস্কারের জন্য অধ্যাপক সাহার নাম এক সময়ে প্রস্তাবিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ক্ষমতা ও পদমর্যাদার লিপ্সা ব্যতিরেকে তিনি আজীবন যে সাধনা করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। C. S. I. R কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধের সঙ্কলন হইতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার বিপুল অবদানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নিজস্ব অবদান ছাড়াও তিনি এই দেশে নিউক্লীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হয়। কণাত্বরণ-যন্ত্র সাইক্লোট্রন এই দেশে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। তাহা ছাড়া বিটা-গামা স্পেক্ট্রোস্কোপি, নিউক্লীয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স, ইলেকট্রন প্যারাম্যাগনেটিক রেজোনেন্স, ম্যাস-স্পেক্ট্রোস্কোপি, নিউক্লিয়ার রসায়ন, নিউক্লিয়ার ইলেকট্রনিক্স সংক্রান্ত বহু আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে স্বয়ম্ভরতা ও গবেষণার প্রবর্তনে তিনি ভারতকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কালাধিক সময়ের অগ্রবর্তী করিয়া গিয়াছেন। এই কথা হয়তো অনেকেই জানেন না যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নিউক্লীয় বোমা ও রিয়্যাক্টর আবিষ্কারের পূর্বে যখন ফিসন সংক্রান্ত গবেষণা বিদেশে গোপনীয় ছিল, অন্তনিরপেক্ষভাবে অধ্যাপক সাহার গবেষণাগারে মৃদু নিউট্রন সংঘাতে ইউরেনিয়াম বিভাজনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা সম্পাদিত হইয়াছিল। ভারতের প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপটি তাঁহার গবেষণাগারে নির্মিত হইয়াছিল ও এই দেশে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে জীব-পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণার তিনিই প্রথম প্রবর্তক।

অধ্যাপক সাহার পূর্ববর্তী যুগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রসায়ন-বিজ্ঞান গবেষণায় যে ভাবমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে আধুনিক ভারতীয় রসায়ন-বিজ্ঞানের জনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ সম্পূর্ণ ভারতীয় চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত, প্রাচীন যুগের বিস্মৃত বিজ্ঞানীদের প্রতীকরূপে তিনি বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রচেষ্টার একটি নূতন যুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ভারতীয় বিজ্ঞানী রামন 'রামন-এফেক্টের' আবিষ্কারে বিশ্বের বিজ্ঞান-জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। আলোক-বিজ্ঞানে ভারতের গবেষণাকে তিনি বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রামন-এফেক্টের গুরুত্ব লেসার আবিষ্কারের পর আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। একবর্ণী পারদ-দীপের পরিবর্তে লেসারের আলো ও উন্নততর ইলেকট্রনিক পরিমাপক-যন্ত্রে আধুনিক যুগে ক্ষীণতম রামন-বর্ণালীরও পরিমাপ করা সম্ভব

হইতেছে। ফলে বস্তুজগতের নূতন নূতন রহস্য উদ্ঘাটনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

আচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু আর একটি নাম, যাঁহার বিজ্ঞান-সাধনা, জীবন-দর্শন এই যুগের মানুষের কাছে রূপকথার মত প্রতীয়মান হইবে। পরাধীন ভারতে একজন তরুণ সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশে লালিত ও শিক্ষিত, নিজস্ব বিজ্ঞান বিষয়ে কোন শিক্ষকের বিনা তত্ত্বাবধানে, যে অতুলনীয় আবিষ্কারে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন, তাহাই বোস-সংখ্যায়ন নামে খ্যাত। এই আবিষ্কারের প্রয়োগ যে কত সুদূরপ্রসারী, আজ পঞ্চাশ বৎসরের ব্যবধানে তাহার সম্যক পরিচয় আমরা পাইয়াছি। বোস-সংখ্যায়ন মূলতঃ শক্তিকণার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হইয়াছিল। গত পঞ্চাশ বৎসরে বিজ্ঞানের ত্বরিত অগ্রগতিতে বিচিত্র যে মৌলিক কণা জগতের সন্ধান মিলিয়াছে, তাহাদের কিছু অংশ বোস-সংখ্যায়ন মানিয়া চলে। আচার্য বসুর নামানুসারী উহারা বোসন (Boson) আখ্যায় বিশ্ব-বিজ্ঞানী সমাজে চিহ্নিত হইয়াছে। অন্যান্য যে কণাগুলি ফের্মি সংখ্যায়ন মানিয়া চলে, সেগুলি ফের্মিয়ন (Fermion) নামে অভিহিত হয়। আচার্য বসুর এই আবিষ্কার তাই এই শতাব্দীর কতিপয় মৌলিক আবিষ্কারের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইবে। তাছাড়া ক্ষেত্রতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আচার্য বসুর অনেক অবদান রহিয়াছে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে ডক্টর ভাবার নাম এই যুগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কিত গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, অন্য দিকে নিউক্লীয় বিজ্ঞান-গবেষণায় স্বাধীন ভারতে তিনি যে প্রতিষ্ঠানগুলির জনক, সেগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞান-গবেষণার পীঠস্থান বলা চলে।

উল্লিখিত বিজ্ঞানিগণ ছাড়া আরো বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী বিগত এক শত বৎসর ধরিয়া পদার্থ, রসায়ন, উদ্ভিদ ও জীব-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহু অবদান রাখিয়া গিয়াছেন ও এখনও নিরলস সাধনা করিয়া চলিয়াছেন। তবু একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়—তাহা হইল বর্তমান স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান-সাধনার ধারা কি সঠিক পথে চলিয়াছে? ধারাটি যদি অভ্রান্ত হয়, তবে পরাধীন ভারতে সীমিত সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও এই দেশে বসিয়া আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ ও রামন যখন বিশ্বখ্যাত আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখন স্বাধীন ভারতে সেই দিনের তুলনায় প্রচুর সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও উন্নত বিদেশী গবেষণাগারে শিক্ষা লাভ করিয়া এবং বিদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগ পাইয়াও আমাদের বিজ্ঞানীরা কেন বিশ্বখ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না? সম্প্রতি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অশীতিতম জন্ম-বর্ষ পূর্তি ও বোস-সংখ্যায়নের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আয়োজক সমিতির সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার স্বাগত ভাষণে এই প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার মতে, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা কমিয়াছে। অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের বিজ্ঞান-সাধনার ধারার মূল সূত্রটি খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। সেই যুগে সমাজের সর্বস্তরে দেশাত্মবোধের প্লাবন আসিয়াছিল। বিজ্ঞানীরাও তাহার সামিল ছিলেন, প্রতিভা তাহার আপন পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। স্বাধীন ভারতে নানা দিকে সমাজের অবক্ষয় ঘটিয়াছে। তাহার কারণ অবশ্য সমাজ-তাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের বিষয়। ফলে দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানীদের কর্মজীবন ও অর্থের প্রতি ঝোঁক বাড়িয়াছে—বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা হ্রাস পাইয়াছে। এই দেশে যে কোন বড় কাজ করা যায় বা কোন কাজের সমাদর পাওয়া

পারে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই বিশ্বাসটুকুও হারাইয়া ফেলিয়াছেন। অতি গোঁড়া দেশপ্রেমিকও বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানার প্রতিভা—তিনি এই দেশে থাকিলে উন্মেষলাভ করিত না।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বিদেশকে স্বদেশ করিবার জন্ত ব্যাকুল, যাঁহারা এই দেশে আছেন, তাঁহাদের সাধনার ধারা সরকারী আমলাতন্ত্রের নিগড়ে বাঁধা। বর্তমান ভারতীয় বিজ্ঞান মূলতঃ সরকার নিয়ন্ত্রিত। দেশের কল্যাণে প্রয়োজনমাফিক (Need oriented) বিজ্ঞান-গবেষণার সরকারী কর্তৃত্ব অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রয়োজনে বিজ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমেই মহৎ আবিষ্কার সম্ভব হইয়া থাকে। কোন পরিকল্পনাবিদ্, রাষ্ট্রের কোন কর্ণধার তাঁহাদের নিয়মমাফিক নীতির নিগড়ে সেই শ্রেণীর গবেষণার ফরমায়েস করিবার ক্ষমতা রাখেন না। বিজ্ঞানীর খুশীমাফিক গবেষণা হইতেই মহৎ আবিষ্কার জন্মলাভ করে। সেই গবেষণার স্থল হইল বিশ্ববিদ্যালয়। বস্তুতঃ প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে যখন কোন সরকারী নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞানাগার ছিল না, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই ছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের কর্মস্থল। আজ প্রায় শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—কিন্তু তাহাদের বিজ্ঞান-গবেষণায় সরকারী অর্থানুকূল্য অত্যন্ত সীমিত। ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধনার ধারা অব্যাহত রাখিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিজ্ঞান-গবেষণার মান উন্নত করা প্রয়োজন। গবেষণার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণও শিথিল করিতে হইবে।

বিজ্ঞানীদের জীবনধারণের মান উন্নয়নের প্রসঙ্গ অতীতে বহু ক্ষেত্রেই আলোচিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া আর একটি সমস্যার বিষয় হইল তরুণ বেকার বিজ্ঞানীদের লইয়া। এই দেশে যে তরুণেরা বিজ্ঞানে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য চাকুরীর সুযোগ বর্তমানে সীমিত হইয়া পড়িয়াছে। সরকারকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্ত দেশ যদি কোন সুযোগ দিতে না পারে তবে, সেই দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের আশা বিলুপ্ত হইবে—মৌলিক বিজ্ঞান-গবেষণার গৌরব হইতেও দেশ বঞ্চিত হইবে।

বিজ্ঞান-চর্চার নীতি নির্ধারক কর্তাব্যক্তিরা অধুনা একটি ধুয়া তুলিয়াছেন যে, ফলিত বিজ্ঞানকে বর্তমান ভারতে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। তাঁহাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানই ফলিত বিজ্ঞানের পথিকৃৎ। ফলিত বিজ্ঞানের বহু মৌলিক আবিষ্কারের জনক নিঃসন্দেহে 'রামন-এফেক্ট', যাহা বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানের ফসল। এইরূপ আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ভ্রান্ত-নীতি অনুসরণ করিলে আশানুরূপ ফল কোন ক্ষেত্রেই পাওয়া সম্ভব নহে।

বিজ্ঞান-সাধনার ভাষা সম্পর্কেও সজাগ হইবার সময় আসিয়াছে। উল্লিখিত আলোচনা-চক্রের উদ্বোধনী ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণীয়ম ও ডক্টর সেন উভয়েই মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছেন। শ্রীসুব্রহ্মণীয়ম আরও উল্লেখ করেন যে, প্রধান মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় আচার্য বসুর সম্মাননার জন্ত একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে। উহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের ধ্যানধারণা জনগণের সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া।

এই কমিটি নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন। আমরা শুধু ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, শুধু জনপ্রিয় বিজ্ঞানের জন্ত নহে, পরন্তু সর্বস্তরে মাতৃভাষাই বিজ্ঞানের বাহন হওয়া প্রয়োজন। আচার্য বসুর সমগ্র জীবনের এই উপলব্ধিকে কাজে লাগাইতে না পারিলে ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধনার ধারা যে তাহার স্বাভাবিক পথ হারাইয়া ফেলিবে—এই কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

সুর্যেন্দুবিকাশ কর

নিকোলাস কোপার্নিকাস—বর্তমান যুগের অগ্রদূত

(500তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

(1473-1543)

বৈদ্যনাথ বসু*

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এই অগ্রগতি হয়েছে ধাপে ধাপে, কখনও নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি হয় নি। একথা সাধারণভাবে বিজ্ঞানের সকল শাখা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য বোধ হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। আধুনিক বিজ্ঞানের এই শাখাটি যেমন অতি প্রাচীন, তেমনই আবার এটিকে বিজ্ঞানের নবীনতম শাখারূপেও অভিহিত করা যায়। কারণ, আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও কারিগরিবিদ্যার নবতম জ্ঞানের সকল প্রয়োগ করা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। বাস্তবিকপক্ষে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাচীনতম ধ্যান-ধারণা থেকে এর আধুনিকতম পর্যায়ের ক্রমবিকাশের যে সুদীর্ঘ ইতিহাস, তা নানাদিক থেকে চমকপ্রদ ও বৈচিত্র্যময়। নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolaus Copernicus) সেই ইতিহাসের এক জ্যোতির্ময় পুরুষ, এক শক্তিধর মহানায়ক। যে সূর্য ইহুদী দেবতা যিহোবার নির্দেশে অনাদিকাল থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছিল, কোপার্নিকাসের অমোঘ ইঙ্গিতে সে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল এবং তৎপরিবর্তে পৃথিবীই অনন্তকালের জন্যে সূর্য-পরিক্রমা সুরু করে দিল।

কোপার্নিকাসের আবির্ভাব হয়েছিল ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে। 1453 সালে তুর্কীবিজেতাদের হাতে কনষ্টান্টিনোপলের পতনের পরে গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মধ্যযুগীয় গতানুগতিক চিন্তাধারার পরিবর্তে মৌলিক চিন্তার প্রচার ও প্রসারের সূত্রপাত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে (1492) নতুন জগৎ আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে নতুন কর্মোদ্যম ও চিন্তার দিগন্ত বহু দূর প্রসারিত হয়ে পড়ে। ধর্মজগতে মার্টিন লুথারের সংস্কার আন্দোলন সনাতন যাজকীয় সাম্রাজ্যের ভিতে ফাটল ধরিয়ে দেয়। এই সর্বব্যাপী নতুন চিন্তার ঢেউ তৎকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকেও প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। এই আলোড়নের প্রথম প্রবাহই এসেছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কোপার্নিকাসের প্রতিভার আলোকিত পথ বেয়ে।

পিথাগোরাস (Pythagoras) থেকে কোপার্নিকাসের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত প্রায় দু-হাজার বছর যাবৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন নতুন মৌলিক চিন্তার আবির্ভাব হয় নি। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে অবশ্য অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর অনেক কাজ হয়েছে। প্লেটো (Plato), আরিস্টটল (Aristotle), হিপারকাস (Hipparcus), টলেমী (Ptolemy) প্রমুখ মহামনীষিগণ তাঁদের চিন্তায় এবং কাজে বিজ্ঞানের এই শাখাটিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু এক হিসাবে এঁদের প্রত্যেকের চিন্তাই ছিল গতানুগতিকতায় সীমাবদ্ধ। এঁরা প্রত্যেকেই পৃথিবীকে

* গণিত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-32

বিশ্বের নিশ্চল কেন্দ্ররূপে কল্পনা করেছেন। এঁদেরই সমান্তরালভাবে অপর একদল গ্রীক চিন্তানায়কের অবশ্য আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁদের অনেকে বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী স্থির নয়, নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণায়মান এবং সূর্যের চারদিকে আবর্তনশীল। ফিলোলাউস (Philolaus), হিরাক্লিডিস (Heracleides), আরিষ্টারকাস (Aristarcus) প্রমুখ এঁদের অন্যতম। কিন্তু শেষোক্ত এই মনীষীদের বাস্তব মতবাদ জনসাধারণের মনে কখনও দাগ কাটতে পারে নি, সম্ভবতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ, এই মতবাদ বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বজগৎসম্বন্ধীয় মতবাদের সঙ্গে মেলে না। দ্বিতীয়তঃ, পিথাগোরাস, প্লেটো এবং আরিষ্টোটল ছিলেন তৎকালীন চিন্তাজগতের মহানায়ক। তাঁদের বিরুদ্ধ মতবাদ মানুষের মনে স্থানলাভে সক্ষম হয় নি। দু হাজার বছর যাবৎ একটা ভ্রান্ত তথ্য মানুষের চিন্তাজগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এরকম দ্বিতীয় নজীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যুগান্তসঞ্চিত এই অন্ধকারের মাঝে আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত হলেন আধুনিক চিন্তাধারার অগ্রদূত নিকোলাস কোপার্নিকাস।

খুব সম্ভবতঃ ব্যাবিলোনীয়েরাই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন, এবং পর্যবেক্ষণের সাহায্যে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। কিন্তু গ্রীক চিন্তানায়ক পিথাগোরাসই খৃঃ পূঃ 6ষ্ঠ শতাব্দীতে বোধ হয় সর্বপ্রথম অনুমান করেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং দৃশ্যমান বিশ্বচরাচরও গোলাকার। কিন্তু পৃথিবী যে বিশ্বের স্থির কেন্দ্রবিন্দু, একথা পিথাগোরাস অভ্রান্ত বলে মনে করতেন। সমগ্র বিশ্বগোলকটি (Celestial sphere) জ্যোতিষ্কদের নিয়ে একটি অক্ষরেখার উপর প্রতি 24 ঘণ্টায় একবার করে ঘুরে আসে। এই অক্ষরেখাটির অবস্থান স্থির পৃথিবীর মধ্যে। ফলতঃ, জ্যোতিষ্কদের উদয় এবং অস্তগমন, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে দিনরাত্রির আনাগোনা ইত্যাদি ঘটনাবলী সাধারণ নিয়মেই দেখা দেয়। এই ছিল পিথাগোরাসের বিশ্বতত্ত্বের (Cosmology) মূল ধারণা। সারা বছর ধরে আকাশে সূর্যের গতিবিধি অবশ্য অপেক্ষাকৃত জটিল। কারণ, আপাতঃদৃষ্টিতে সূর্যের আহ্নিক গতি ছাড়াও একটা বার্ষিক গতি আছে। এই জটিল সৌরগতি ব্যাখ্যা করবার জন্যে পিথাগোরাস সূর্যের একই সঙ্গে দুটি অক্ষকেন্দ্রিক গতির অনুমান করেছিলেন। প্রথমটি হচ্ছে, সমগ্র বিশ্বগোলকের সঙ্গে সূর্যের আহ্নিক গতি। এর সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন দ্বিতীয় আর একটি ভিন্ন অক্ষকেন্দ্রিক বার্ষিক গতি। এই দুটি পরস্পর স্বাধীন অক্ষকেন্দ্রিক গতিই সূর্যের জটিল গতিকে রূপায়িত করে বলে পিথাগোরাস বিশ্বাস করতেন। এই একই যুক্তির মাধ্যমে চন্দ্র এবং গ্রহাদির জটিল গতির ব্যাখ্যা খুঁজেছেন তিনি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, পরবর্তী কালে প্লেটো, আরিষ্টোটল এবং টলেমির মত মহাচিন্তানায়কেরাও গ্রহাদির গতি বিষয়ে পিথাগোরাসের অপেক্ষা ভিন্নতর মৌলিক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি এবং কোপার্নিকাসের আগে পর্যন্ত 2000 বছর যাবৎ বিশ্বতত্ত্বীয় এই ভ্রান্ত ধারণা মানবজাতির চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

পিথাগোরাসের প্রায় 200 বছর পরে প্লেটো এবং তাঁর ছাত্রেরা যে বিশ্বতত্ত্বের ধারণা দিয়েছেন, তা মূলতঃ পিথাগোরাসের তত্ত্ব থেকে বিশেষ ভিন্ন ছিল না। কিন্তু তাঁরা গ্রহদের বিপরীত গতি (Retrograde motion) এবং সৌর ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) থেকে তাদের বিভিন্ন দূরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, যা পিথাগোরাসের অতি সরল বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে আমরা দেখি না। প্লেটোনিয়ানদের বিশ্বতত্ত্ব

পৃথিবীকেন্দ্রিক এবং গ্রহাদির জটিল গতিকে তাঁরা একাধিক বৃত্তীয় গতির সমষ্টি হিসাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। এভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্লেটোর শিষ্য ইউডোক্সাস (Eudokxus) বিশ্বের যে জ্যামিতিক চিত্রটি এঁকেছেন, তা অতি অদ্ভুত। তাঁর মতে, প্রতিটি গ্রহ একটি আদর্শ গোলকের (Ideal sphere) বিষুবীয় তলে (Equator) অবস্থিত। এই গোলকগুলি এমনভাবে সাজানো যে, প্রথমটির মেরুদ্বয় দ্বিতীয় গোলকের গায়ে অবস্থিত, দ্বিতীয়টির মেরুদ্বয় তৃতীয় গোলকের গায়ে ইত্যাদি এবং এই সব গোলকের কেন্দ্রবিন্দুই পৃথিবীতে অবস্থিত। এখন যদি সব গোলকই সমভাবে তাদের অক্ষের চারদিকে ঘুরতে থাকে, তাহলে বিভিন্ন গোলকের গতির সমষ্টি নিয়ে এক একটি জ্যোতিষ্কের গতিকে প্রকাশ করা যায়। এইভাবে সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের গতিকে ইউডোক্সাস তিনটি গোলকের গতির সমষ্টিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এভাবে মোট 27টি গোলকের সাহায্যে ইউডোক্সাস সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের জটিল গতির অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর এই ব্যাখ্যা তৎকালীন ও পরবর্তী কালের বহু বিদগ্ধজনের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল।

প্লেটোর শিষ্য আরিস্টোটল ছিলেন বিশ্বের সর্বকালের সেরা মনীষীদের অগ্রগণ্য। স্বভাবতঃই বিশ্বতত্ত্ব এবং বিশ্বের ভৌত প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর একটা সুচিন্তিত মতবাদ থাকবে। তাঁর মতে, পৃথিবী একটি গোলক এবং তা বিশ্বের স্থির কেন্দ্ররূপে অবস্থিত। বিশ্বের অপরাপর যাবতীয় বস্তুনিচয় পৃথিবীর সঙ্গে সমকেন্দ্রিক বিভিন্ন গোলাকার খোলকের (Spherical shell) উপর পর পর সাজানো রয়েছে। পৃথিবীর নিকটতম খোলকের উপর চাঁদের এবং দূরতম খোলকের উপর নক্ষত্ররাজির অবস্থান। পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বিভিন্ন স্তরে পূর্ণ করে রেখেছে যথাক্রমে জল, বায়ু এবং আগুন। চান্দ্রগোলকের পরে ক্রমান্বয়ে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন গ্রহের গোলক। এগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত এবং প্রত্যেক গোলকের গতি তার মধ্যবর্তী নিকটতম গোলকের গতিকে প্রভাবিত করে। আরিস্টোটলের বিশ্বপ্রকৃতিতে চান্দ্রগোলকটির অবস্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, চান্দ্রগোলকের মধ্যবর্তী সকল স্থান মাটি, জল, বায়ু এবং আগুন—এই চারটি বস্তুতে পরিপূর্ণ; উপরন্তু এই বস্তুচতুষ্টয়ের যে কোন একটি অপর একটিতে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু চান্দ্রগোলকের বাইরের সমস্ত স্থান পূর্ণ করে রয়েছে একটি পঞ্চম বস্তু। এই বস্তুটির নাম দিয়েছেন তিনি ঈথার (Ether)। ঈথার স্থান পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু এর রূপান্তর সম্ভব নয়। আরিস্টোটল ছিলেন মহা দার্শনিক। বিশ্বপ্রকৃতির ব্যাখ্যার মধ্যে তিনি দার্শনিক তত্ত্বের একটি চমৎকার ছবি উপস্থাপিত করেছেন। হিন্দু দর্শনোক্ত দেহ ও আত্মার পার্থক্যের অনুরূপ একটি কল্পনা আমরা আরিস্টোটলের উপরিউক্ত বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যার মধ্যে খুঁজে পাই। এখন আমরা জানি যে, আরিস্টোটলের বিশ্বপ্রকৃতির কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, তাঁর কল্পিত অপরিবর্তনীয় ঈথার জগতের বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রায় 2000 বছর যাবৎ মানুষের মনে কোন প্রশ্ন জাগে নি। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা যখন ধূমকেতুকে গাগনিক (Celestial) বস্তু হিসাবে চিনতে পারেন এবং মহোজ্জ্বল নতুন নক্ষত্র (Supernova) আবিষ্কার করেন, তখনই কেবল আরিস্টোটলের অপরিবর্তনীয় ঈথার-জগতের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে অবহিত হলো।

পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল টলেমীর হাতে। টলেমীর আবির্ভাব

হয়েছিল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া মহানগরীতে। তাঁর রচিত মহাগ্রন্থ আল্‌মাগেষ্ট (Almagest) পরবর্তী 1400 বছর যাবৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে বাইবেলস্বরূপ ছিল। টলেমীর প্রদত্ত বিশ্বতত্ত্বে গ্রহের গতি ও অবস্থানবিষয়ক দৃশ্যমান ঘটনাবলীর এমন সুষ্ঠু এবং সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, পরবর্তী 1400 বছর যাবৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে তা অভ্রান্ত মনে হয়েছে। গ্রহের গতি ও অবস্থান সম্বন্ধে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দুটি ব্যাপার স্পষ্টতঃ ধরা পড়ে। প্রথমতঃ, পৃথিবীর সাপেক্ষে গ্রহগুলির অবস্থান সারা বছর ক্রমশঃ বদ্‌লায় এবং একই সঙ্গে তাদের উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে ; অর্থাৎ পৃথিবী থেকে কোন একটি গ্রহের দূরত্ব সমান থাকে না, কক্ষপথে তার চলবার সঙ্গে সঙ্গে এই দূরত্ব বদ্‌লায়। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর সাপেক্ষে গ্রহদের গতি কখনও ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (সম্মুখ গতি বা Direct motion), আবার কখনও এই গতি ঘড়ির কাঁটার দিকে (বিপরীত গতি বা Retrograde motion)। দৃশ্যমান এই গতির প্রকৃতি সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্যে টলেমি প্রত্যেক গ্রহের গতিকে দুটি বৃত্তীয় গতির যুগ্মফল হিসাবে কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক গ্রহের একটি বৃত্তাভ্র (Epicycle) বরাবর নিজস্ব গতি আছে, আর সেই বৃত্তাভ্রর কেন্দ্রটি আবার একই সঙ্গে একটি বৃত্তপথে (Deferent) পৃথিবী পরিক্রমা করে। এখন যদি বৃত্তাভ্রতে গ্রহের গতি এবং বৃত্তাভ্রর কেন্দ্রটির প্রদক্ষিণ গতি—উভয়ই সম্মুখ গতি হয়, তাহলে এই উভয় গতির যুগ্ম ফল পৃথিবীর সাপেক্ষে কখনও সম্মুখ গতি এবং কখনও বিপরীত গতি-রূপে প্রতিভাত হবে এবং পৃথিবী থেকে গ্রহটির দূরত্বেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে। 1 (ক) নং চিত্র থেকে এই সমগ্র ব্যাপারটি সুন্দরভাবে বোঝা যেতে পারে। ধরা যাক, একটি প্রধান গ্রহ (Superior planet) P, C-কেন্দ্রিক বৃত্তাভ্রতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে গতিশীল। বৃত্তাভ্রর কেন্দ্র C আবার বৃত্তপথে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত বরাবর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। তাহলে এই গ্রহটির পৃথিবী প্রদক্ষিণ পথে এর গতি পৃথিবীর সাপেক্ষে কখনও সম্মুখ গতি এবং কখনও বিপরীত গতি হবে। আবার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বছরের কোন সময়েই সূর্য থেকে বুধ এবং শুক্র গ্রহের দূরত্ব যথাক্রমে 23 এবং 48 ডিগ্রির বেশী হয় না। এই দৃশ্যমান ঘটনার টলেমীয় ব্যাখ্যা এই যে, বুধ বা শুক্রের বৃত্তাভ্রর কেন্দ্র C′ সর্বদা পৃথিবী ও সূর্যের সংযোজক সরলরেখার উপর থাকে। কাজেই ওই গ্রহদ্বয়কে সূর্য থেকে খুব বেশী দূরে কখনই দেখা যাবে না।

অতএব আমরা দেখতে পাই যে, টলেমির ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বে সূর্য চন্দ্র-গ্রহমণ্ডলীর গতি ও অবস্থানাদির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সন্তোষজনক এবং সুষ্ঠু ব্যাখ্যা রয়েছে। এই ব্যাখ্যা এত পরিষ্কার এবং সন্তোষজনক যে, পরবর্তী 1400 বছর যাবৎ এর সত্যতা সম্পর্কে কারও মনে কোন প্রশ্ন জাগে নি। পিথাগোরাস এবং প্লেটোর গ্রহজগতের ব্যাখ্যা ছিল অত্যন্ত সরল এবং অসম্পূর্ণ [1 (খ) নং চিত্র]। তাতে গ্রহাদি সম্পর্কে দৃশ্যমান ঘটনাবলীর অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা ছিল না। তাঁদের মতে, প্রতিটি গ্রহ একটি নিখুঁৎ বৃত্তে অথবা কয়েকটি বৃত্তাকার গতির সমষ্টিরূপে পৃথিবী পরিক্রমা করে। পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধির বা বিপরীত গতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তাতে নেই। অ্যারিষ্টোটলের তত্ত্ব এই তত্ত্ব থেকে মূলতঃ ভিন্ন নয়। তবে ভৌত জগতের প্রকৃতি (Nature of physical universe) সম্বন্ধে তাঁর যে মতবাদ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, তা ছিল সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব পরবর্তী প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ

গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের বিশ্বতত্ত্বে গ্রহদের দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তাদের গতির বিভিন্ন হার প্রভৃতি ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হিপারকাস এই জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের আপাতঃ বার্ষিক গতিকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন।
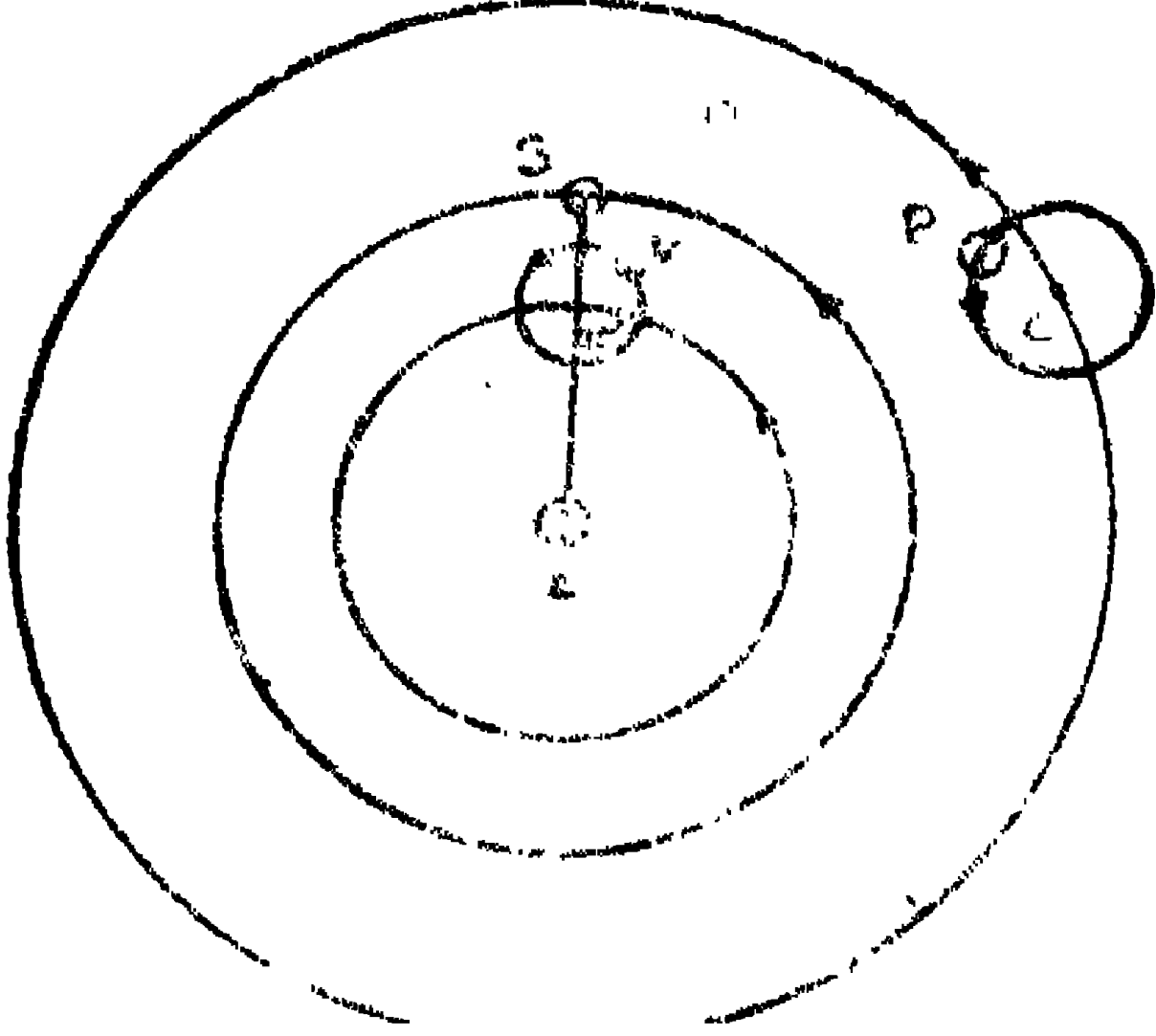
1 (ক) নং চিত্র : টলেমীর ভূকেন্দ্রিক বিশ্বজগৎ।

1 (খ) নং চিত্র : পিথাগোরাস এবং প্লেটোর অতি সরল ভূকেন্দ্রিক বিশ্ব।

করেছিলেন। এঁদের মধ্যে এপোলোনিয়াস (Apollonius) এবং হিপারকাসের (Hipparcus) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রহদের দূরত্বের এই হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বিপরীত গতি এই সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানী দুটি বিভিন্ন জ্যামিতিক উপায়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন। 1 (গ) নং চিত্রে, P গ্রহ একটি চলমান বিন্দু C-কে কেন্দ্র করে একটি বৃত্তাকার পথ পরিক্রমা করে এবং C চলমান বিন্দুটি স্থির পৃথিবী E কে অপর একটি বৃত্তপথে পরিক্রমা করে। এই চিত্রটি কোন প্রধান গ্রহের (Superior planet) গতির মোটামুটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যার জন্যে বিশেষ উপযোগী। আবার দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধির অন্ত আর একভাবেও ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে 1 (ঘ) নং চিত্র থেকে। এই চিত্রে P গ্রহটি একটি স্থির বিন্দু C-কে বৃত্তাকার পথে পরিক্রমা করে। এই স্থির C বিন্দুটি স্থির পৃথিবী E থেকে খানিকটা দূরে অবস্থিত এবং EC রেখা স্থির নক্ষত্রদের সাপেক্ষ একটি নির্দিষ্ট দিক চিহ্নিত করে। এখানে P গ্রহটির কক্ষপথ একটি উৎকেন্দ্রিক বৃত্ত (Eccentric circle)। বিভিন্ন ঋতুর দৈর্ঘ্য থেকে হিপারকাস বৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ CE : CA এই অনুপাতটির মানও নির্ণয় করেছিলেন। পরবর্তী কালে টলেমিও সূর্যের বার্ষিক গতি ব্যাখ্যা করবার জন্যে হিপারকাসের এই জ্যামিতিই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু গ্রহদের গতির সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্যে 1 (ক) নং চিত্রে বর্ণিত টলেমীর জ্যামিতি ছিল অনেক উন্নত এবং নানাদিক থেকে প্রায় নিখুঁৎ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বের স্থির কেন্দ্র পৃথিবী, এই ভ্রান্ত ধারণাই ছিল সমগ্র টলেমীর তত্ত্বের মূল ভিত্তি।
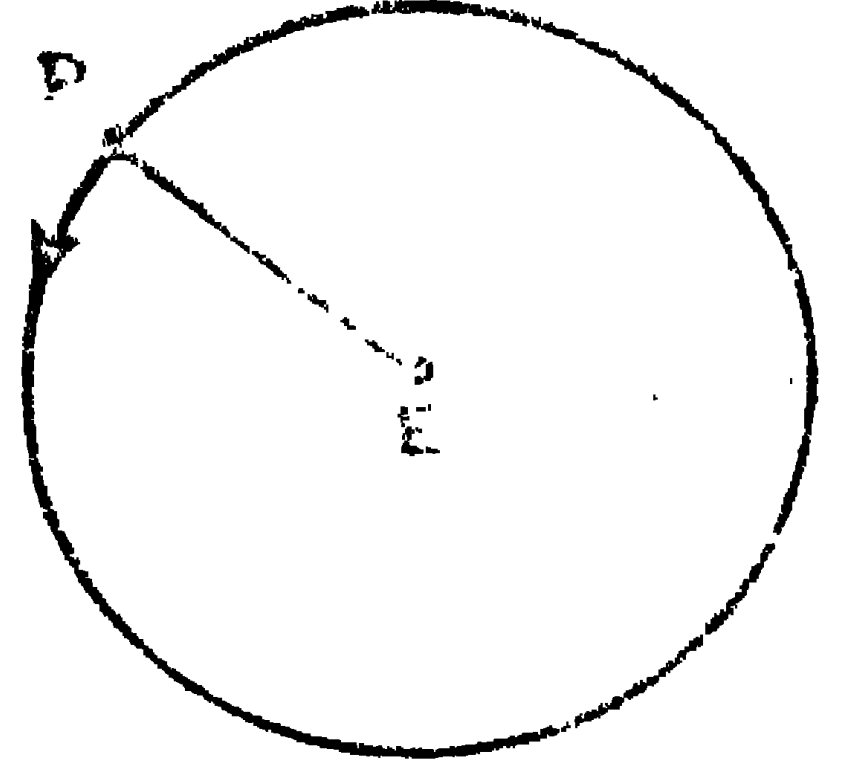
আগেই আমরা বলেছি যে, স্থির পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের পাল্টা আর এক ধরণের বিশ্বতত্ত্বের ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানীর আলোচনায় স্থান লাভ করেছিল। এই তত্ত্বে পৃথিবীকে বিশেষ কোন মর্যাদার আসন দেওয়া হয় নি। এই মতানুযায়ী পৃথিবী-

স্থির নয়, ঘূর্ণায়মান ও আবর্তনশীল এবং সে বিশ্বের কেন্দ্রেও অবস্থিত নয়। এরূপ তত্ত্বের প্রাচীনতম প্রবক্তা সম্ভবতঃ গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফিলোলাউস। তাঁর আবির্ভাবকাল লাউসের এই তত্ত্বে পৃথিবীর গতি অনেকটা চাঁদের গতির মত। আমরা জানি, চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে প্রতি চান্দ্রমাসে একবার করে এমনভাবে ঘোরে যে, তার একই গোলার্ধ চিরকাল
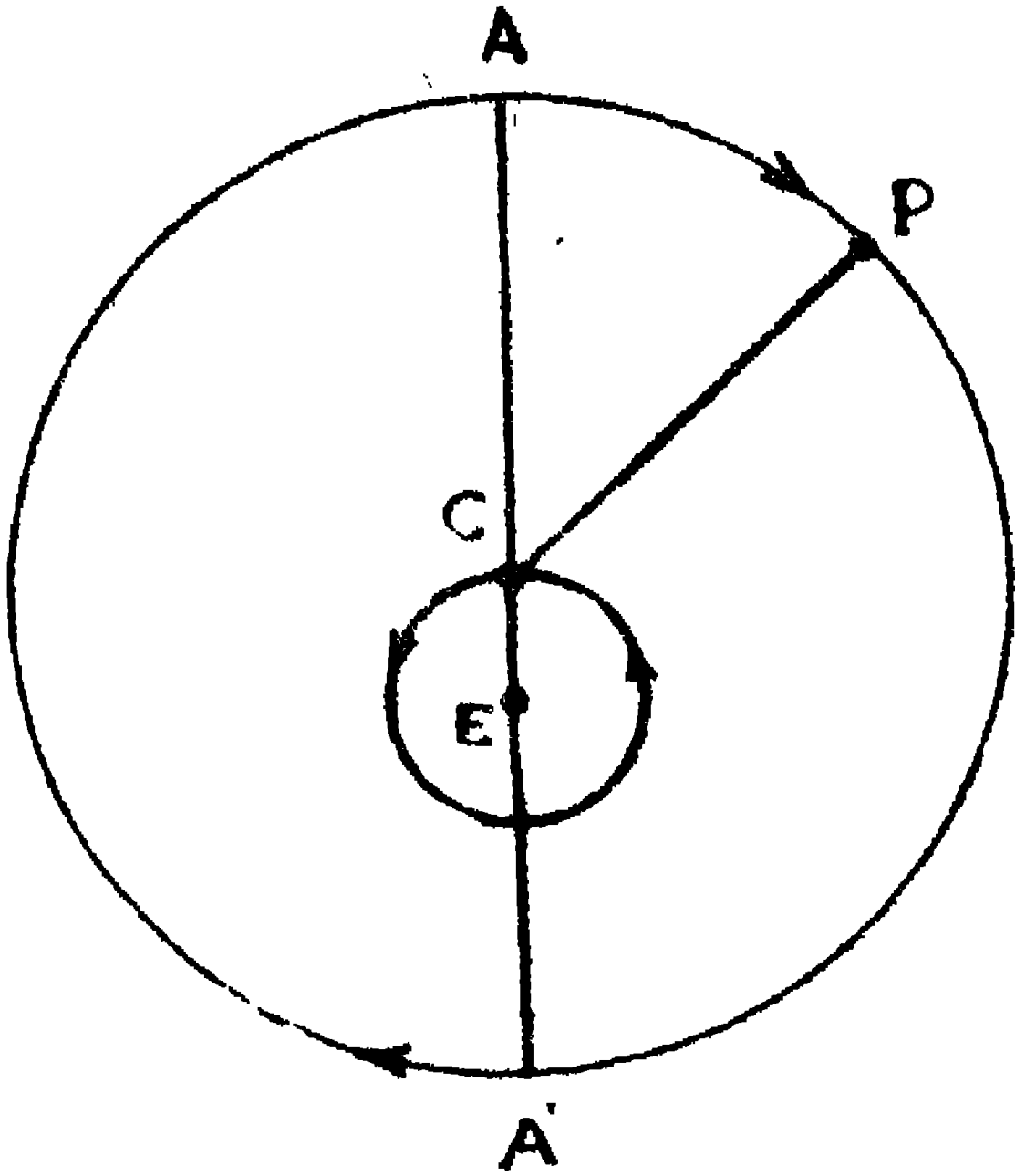
1 (গ) নং চিত্র : হিপারকাস-বর্ণিত ভূকেন্দ্রিক বিশ্ব ; C বিন্দুটি চলমান।
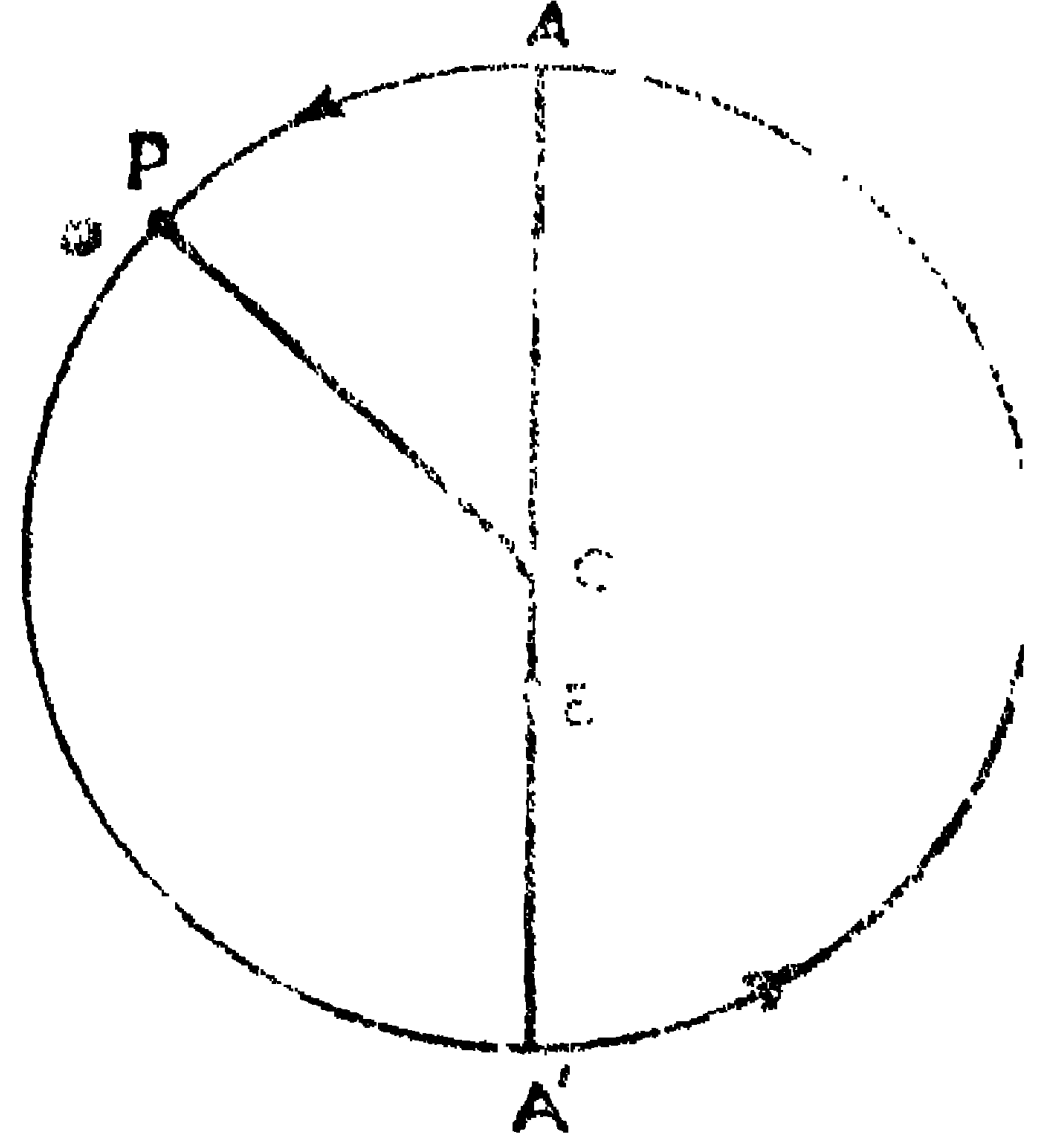
1 (ঘ) নং চিত্র : হিপারকাস-বর্ণিত বিশ্বের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ; এখানে C বিন্দুটি স্থির এবং EC সরলরেখার একটি নির্দিষ্ট দিক সূচিত করে।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বতত্ত্বে যদিও পৃথিবী গতিশীল, কিন্তু এর বাকী সবটুকুই অতি অবাস্তব কল্পনার উপর গড়ে উঠেছে। ফিলোলাউসের ধারণায় পৃথিবী প্রতি 24 ঘন্টায় একবার করে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একটা কেন্দ্রীয় অগ্নিগোলকের (Central fire) চারদিকে এমনভাবে ঘুরে আসে যে, এর জনবসতিপূর্ণ গোলার্ধ সর্বদাই এই অগ্নিগোলকের বিপরীত দিকে থাকে। ফলে মানুষ কখনও এই অগ্নিগোলকের সাক্ষাৎ পায় না। উপরন্তু ফিলোলাউস পৃথিবীর ঠিক নীচেই পৃথিবীর সঙ্গে সমগতিশীল একটি প্রতি-পৃথিবীর (Counter earth) অবস্থান কল্পনা করেছিলেন, যার ফলে প্রতিপাদ বিন্দু (Antepodes) থেকেও কেন্দ্রীয় অগ্নিগোলকটিকে দেখা সম্ভব নয়। ফিলোলাউসের মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে যে সব ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়, পৃথিবীর প্রতি 24 ঘন্টায় কেন্দ্রীয় অগ্নিগোলকটিকে পরিক্রমার ফলেও অনুরূপ ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা যাবে অর্থাৎ দিনরাত্রি হবে এবং বিশ্বগোলকটিকে প্রতি 24 ঘন্টায় একবার করে ঘুরতে দেখা যাবে। উপরন্তু, পৃথিবীর এই কক্ষপথটির ব্যাস যদি চাঁদ, সূর্য এবং গ্রহনক্ষত্রাদির দূরত্বের তুলনায় খুবই ছোট হয়, তবে এই সব জ্যোতিষ্কের আকারের কোন তারতম্য বা দূরবর্তী নক্ষত্রদের কোন লম্বন (Parallax) বোঝা যাবে না। ফিলোলাউসের তত্ত্বানুযায়ী কেন্দ্রীয় অগ্নিগোলকের চারধারে পৃথিবীর কক্ষপথের পরে ক্রমান্বয়ে সাজানো রয়েছে চাঁদ, সূর্য এবং গ্রহদের কক্ষপথ এবং বিশ্বের শেষ

সীমানায় রয়েছে স্থির নক্ষত্রদের বুকে নিয়ে বিশ্বগোলকটি।

পরবর্তী কালে সিরাকিউজের হিকেটাস (Hiketas of Syracuse) এবং পন্টাসের হিরাক্লিডস (Heracleides of Pontus) প্রমুখ গতিশীল পৃথিবী তত্ত্বের প্রবক্তাগণ ফিলোলাউসের তত্ত্বকে আরও নানাদিক থেকে উন্নততররূপে ভাববার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় অগ্নিগোলকের চারদিকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষপথে 24 ঘণ্টায় পৃথিবীর আবর্তনের পরিবর্তে তাঁরা কল্পনা করেছেন যে, অগ্নিগোলকটি পৃথিবীর মধ্যেই অবস্থিত এবং পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপরই প্রতি 24 ঘণ্টায় একবার করে ঘোরে। নিজ অক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণনের তাঁদের এই প্রভৃতি দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা রয়েছে, অপরদিকে নিকটবর্তী জ্যোতিষ্কদের আয়তন এবং দূরবর্তী নক্ষত্রদের অবস্থানের তারতম্য বিষয়ে যে সন্দেহগুলি ফিলোলাউসের ব্যাখ্যার মধ্যে নিহিত ছিল, সেগুলি দূরীভূত হয়েছে। হিরাক্লিডিসের ব্যাখ্যার অপর এক উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বুধ এবং শুক্র গ্রহদ্বয়কে তিনি সূর্যের চারদিকে আবর্তনশীল বলে বুঝতে পেরেছিলেন। কাজেই এই তত্ত্ব সনাতন পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব [2 (ক) নং চিত্র] থেকে অনেক ভিন্ন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহজগতের কল্পনা এই তত্ত্বে ছিল না। এই তত্ত্বানুযায়ী পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণায়মান এবং বুধ ও শুক্র গ্রহদ্বয় সূর্যকেন্দ্রিক কক্ষপথে আবর্তনশীল।
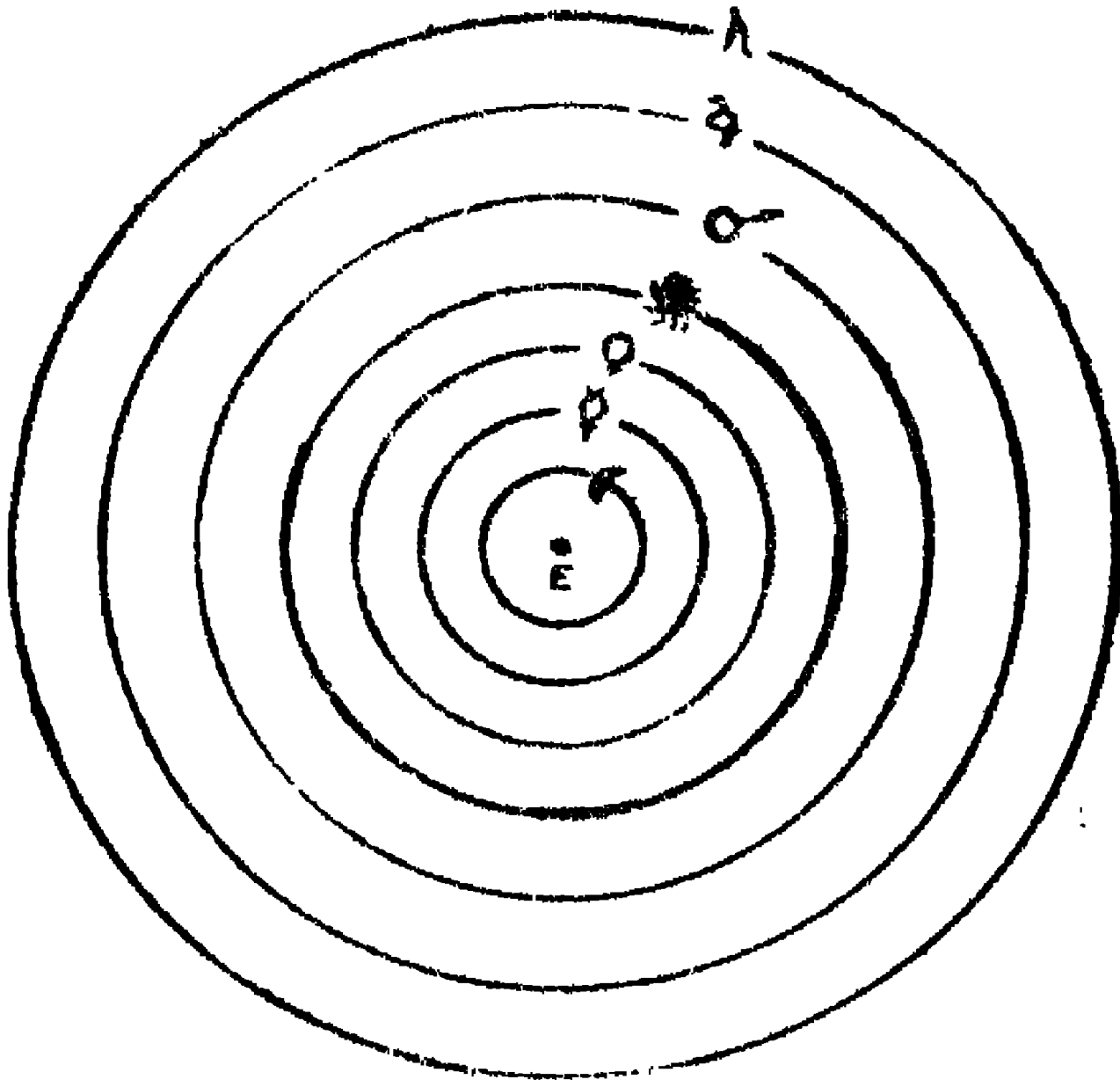
2 (ক) নং চিত্র: গতানুগতিকভূকেন্দ্রিক বিশ্বজগৎ।
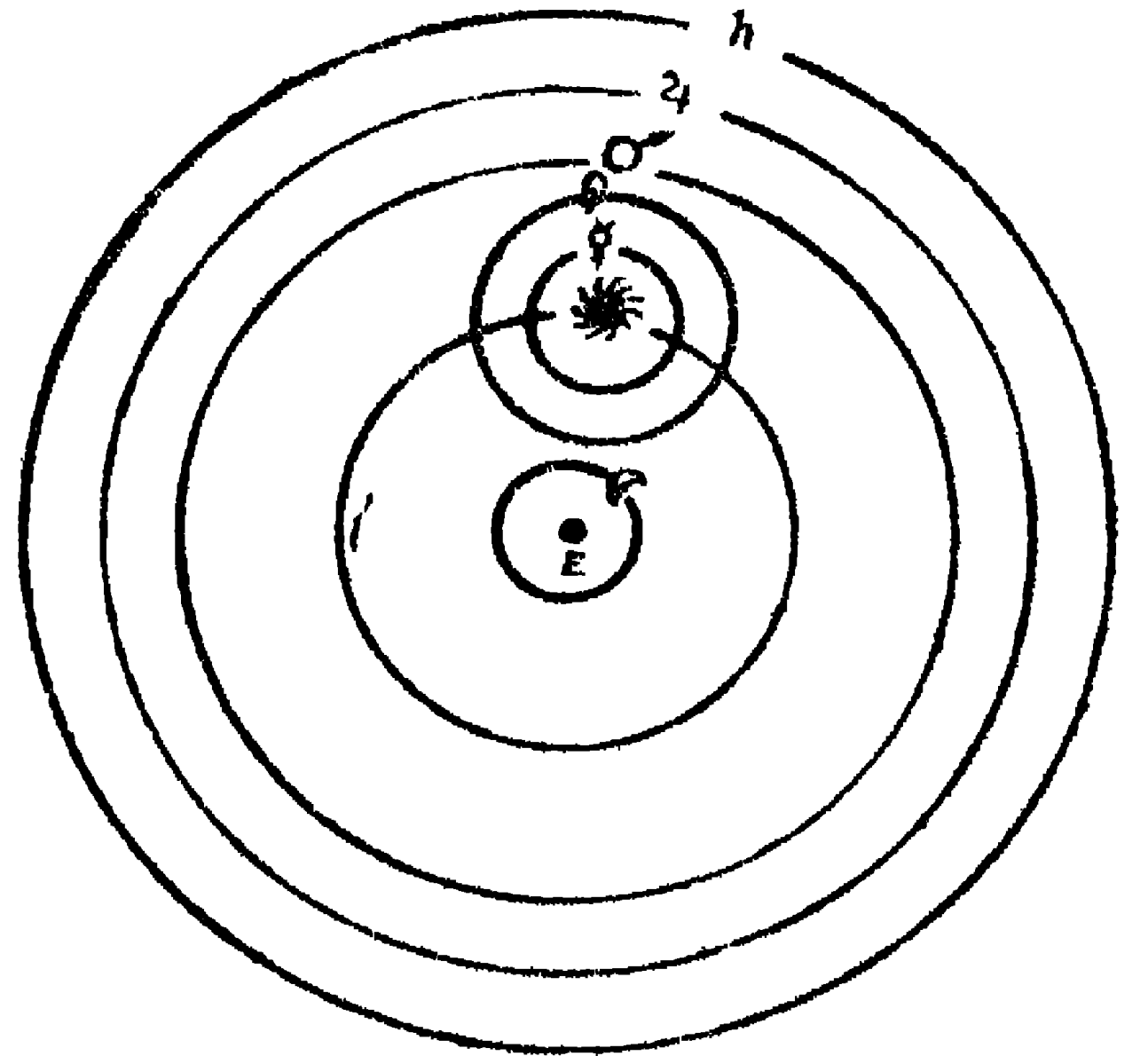
2 (খ) নং চিত্র: হিরাক্লিডিস-বর্ণিত ভূকেন্দ্রিক বিশ্বজগৎ।

কল্পনা সেদিন এনে দিয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে এক বিশাল পদক্ষেপ। এতে ফিলোলাউসের তত্ত্বের গুণাবলী বজায় রেখে তার ত্রুটিগুলি বর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কারণ এতে একদিকে যেমন দিনরাত্রি, উদয়-অস্ত কিন্তু আবার সূর্য, চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহগুলি বৃত্তীয় পথে পৃথিবী পরিক্রমাশীল [2 (খ) নং চিত্র]। কাজেই এই গ্রহজগৎ প্রায় 2000 বছর পরবর্তী টাইকো ব্রাহীর (Tycho Brahe) গ্রহজগতের সঙ্গে তুলনীয়। টাইকোর গ্রহজগৎ মূলতঃ

সূর্যকেন্দ্রিক। পৃথিবী ছাড়া অপর সকল গ্রহগুলিকেই তিনি সূর্যের চারদিকে আবর্তনশীল মনে করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে, চাঁদ এবং সূর্য স্বতীয় পথে পৃথিবী পরিক্রমাশীল [2 (গ) নং চিত্র]। জগতের সবটুকুই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। কোন ধার করা তত্ত্বকে কিছুটা উন্নত রূপ দিয়ে তাঁর বিশ্বতত্ত্ব জন্মলাভ করে নি। প্রায় 1600 বছর যাবৎ এই তত্ত্বের প্রথম এবং শেষ প্রবক্তা
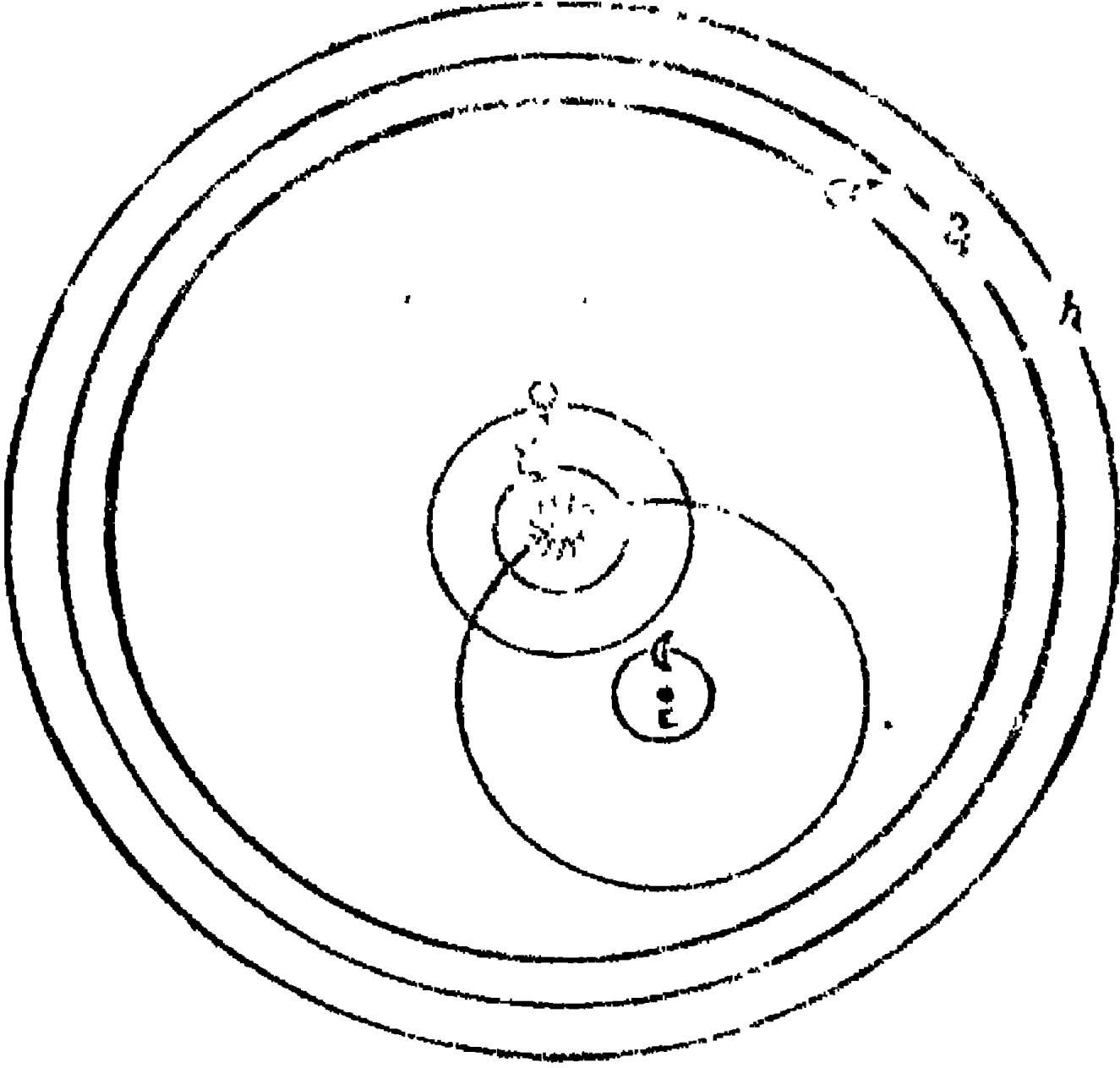
2 (গ) নং চিত্র : টাইকো ব্রাহীর বিশ্বজগৎ।
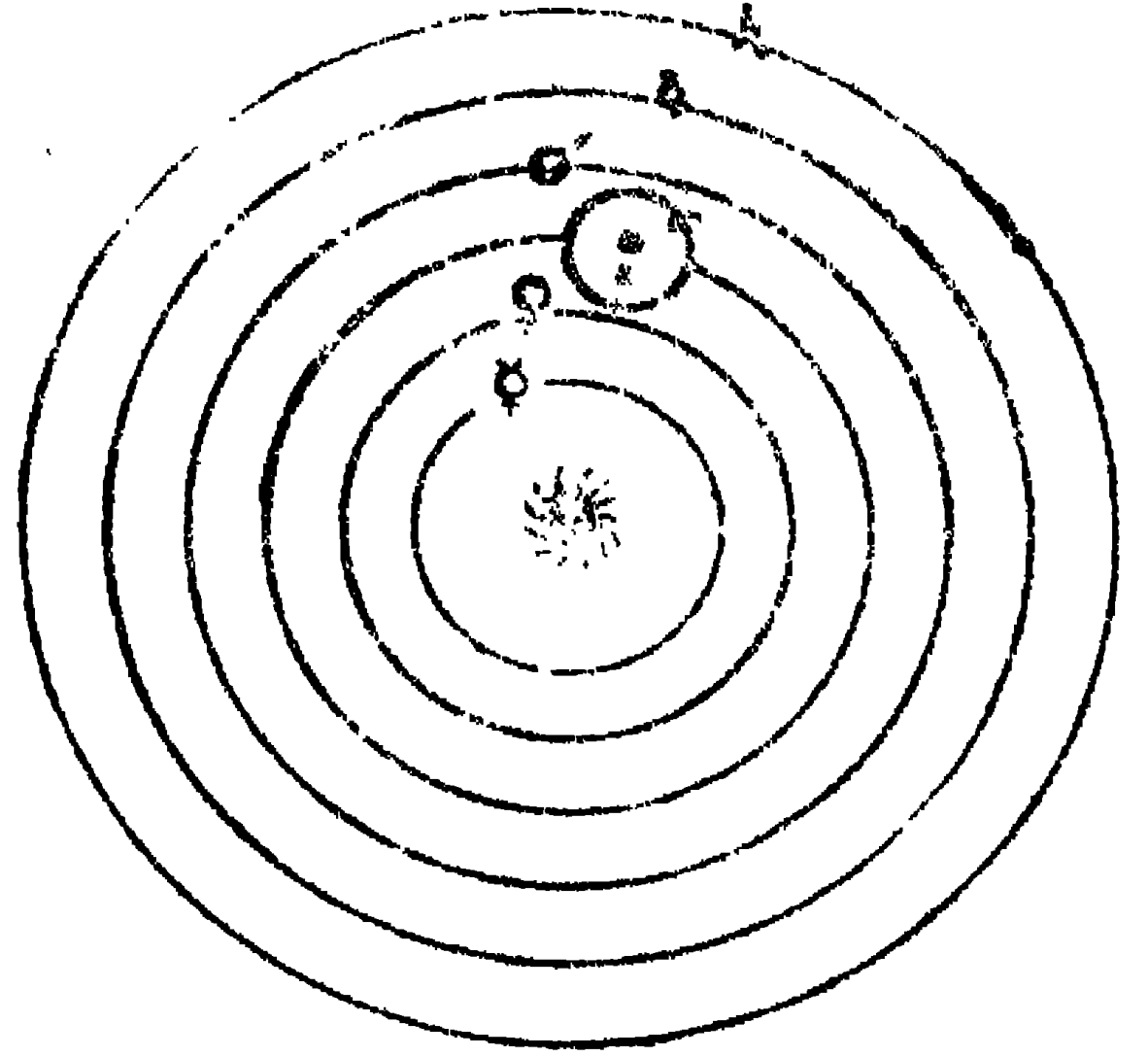
2 (ঘ) নং চিত্র : আরিষ্টারকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বজগৎ।

সূর্য, ☾ চন্দ্র, E পৃথিবী, ☿ বুধ, ♀ শুক্র, ♂ মঙ্গল ♃ বৃহস্পতি, h শনি

কিন্তু গ্রীক যুগেই সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহজগতের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছিল মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানী আরিষ্টারকাসের (Aristarchus of Samos) বিশ্বতত্ত্বের ধারণায় [2 (ঘ) নং চিত্র]। আরিষ্টারকাসের আবির্ভাব হয়েছিল খৃঃ পূঃ তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে। তিনি ছিলেন মহাবিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের (Archimedes) সমসাময়িক। সে যুগে সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহজগতের নিখুঁৎ ধারণা আরিষ্টারকাস কিভাবে পেয়েছিলেন, তা এক পরমাশ্চর্যের বিষয়। প্রতিভার স্বচ্ছ আলোয় উদ্ভাসিত সত্যের সঙ্গে তিনি মুখামুখি পরিচয় লাভ করেন। এই ব্যাপারে তাঁর কোন পূর্বসূরী ছিলেন না। তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহ- ছিলেন তিনি নিজে। 1600 বছর পরে কোপার্নিকাস আবার তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে এই তত্ত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। আরিষ্টারকাসের সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহজগতের ধারণা গতানুগতিক ধারণা থেকে মূলতঃ এত আকাশ-পাতাল তফাৎ যে, তৎকালীন এবং পরবর্তী চিন্তানায়ক এবং বিজ্ঞানীরা তাঁর তত্ত্বের তাৎপর্য কিছুমাত্র বোঝেন নি এবং কোন মন্তব্য পর্যন্ত করেন নি। কিছু লোক অবশ্য তাঁকে বিধর্মী এবং অপরের সুস্থ চিন্তায় অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপকারীরূপে আখ্যাত করেছেন। কাজেই সুদীর্ঘ 1600 বছর যাবৎ আরিষ্টারকাস ছিলেন সম্পূর্ণ উপেক্ষিত এবং অবহেলিত—বিজ্ঞানজগতের এক মহানায়ক।

আমরা আগেই দেখেছি, হিরাক্লিডিসের বিশ্বতত্ত্বে বুধ এবং শুক্র গ্রহ দুটি সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করে, কিন্তু এই গ্রহদ্বয়সমেত সূর্য আবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। কাজেই এই তত্ত্ব যদিও আরিষ্টারকাসের পূর্ববর্তী, কিন্তু তিনি এই তত্ত্ব থেকে কোনরূপ সাহায্য পেয়েছেন বলে মনে হয় না; তাঁর গ্রহজগৎ এর চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। তাঁর তত্ত্ব মূলতঃ তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবী থেকে চাঁদ এবং সূর্যের দূরত্ব নির্ণয় ছিল তাঁর গবেষণার একটি প্রধান বিষয়। 3নং চিত্রে আরিষ্টারকাসের এই দূরত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। সূর্যালোকে চান্দ্রগোলক যখন ঠিক অর্ধেক উদ্ভাসিত, অর্থাৎ ENS কোণটি সমকোণ, তখন NES কোণটির তিনি পরিমাপ করেন এবং ESN কোণটির মান পান 3° (বাস্তবিকপক্ষে, এই কোণটি মাত্র 10′)। এথেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব চাঁদের দূরত্বের অন্ততঃ 18 গুণ এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সূর্য পৃথিবী থেকে অন্ততঃ 300 গুণ বড় (সূর্যের প্রকৃত দূরত্ব এবং আয়তন আরও অনেক বেশী, আমরা এখন জানি)। এই পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য থেকে আরিষ্টারকাস অবিলম্বে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সূর্যের মত বিশাল একটি জ্যোতিষ্ক কখনও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে পারে না; বরং সূর্যই হচ্ছে বিশ্বজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহগুলি বৃত্তীয় পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তিনি আরও সিদ্ধান্তে আসেন যে, সূর্য নক্ষত্রদের মতই বিশাল, অতএব তাদের মত স্থির। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির নূতনত্বে এবং তার বিশ্লেষণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আরিষ্টারকাস এক মহা বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর তত্ত্বের নূতনত্ব সে যুগের তুলনায় এত বিস্ময়কর যে, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবার ক্ষমতাও কারোর ছিল না। 2নং চিত্রগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে—বিশ্বতত্ত্বের ক্রমবিবর্তনে আরিষ্টারকাস কি বিশাল এবং দুঃসাহসিক পদক্ষেপ করেছিলেন।

3নং চিত্র : আরিষ্টারকাস কর্তৃক চাঁদ এবং সূর্যের দূরত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি

বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করবার সময় কোপার্নিকাস নিশ্চয়ই পৃথিবীকেন্দ্রিক এবং সূর্যকেন্দ্রিক—এই উভয় তত্ত্বের গুণাগুণ বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেছেন। পরবর্তী কালে যে তত্ত্ব তিনি তাঁর যুগান্তকারী 'ডি রিভোলিউশনিবুস' (De Revolutionibus) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, তা প্রায় আরিষ্টারকাসের তত্ত্বের অনুরূপ। আবার দেখা যায় যে, তিনি তাঁর গ্রন্থের অনেক জায়গায় টলেমীর আলমাগেষ্ট (Almagest) থেকে জ্যামিতিক এবং অন্যান্য সাহায্য নিয়েছেন। কাজেই প্রশ্ন হতে পারে, কোপার্নিকাসের মৌলিকত্ব কতখানি? তাঁর

প্রদত্ত সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের ধারণা কি পূর্বসূরীদের কাছ থেকে ধারকরা? ড রিভোলিউসনিবুস আলোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কোপার্নিকাসের প্রদত্ত বিশ্বতত্ত্ব তাঁর মৌলিক চিন্তার অবদান। এই নতুন তত্ত্বকে দার্শনিক এবং গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তিনি পূর্বসূরীদের চিন্তা এবং কাজের সাহায্য নিয়েছেন মাত্র। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদির অবস্থান ও গতিবিধি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, ভূকেন্দ্রিক টলেমীয় তত্ত্বে পর্যবেক্ষণযোগ্য যে সব ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়, পৃথিবীকে নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণায়মান এবং সূর্যের চারদিকে আবর্তনশীল বলে ভাবতে পারলেও সেই সব ঘটনার প্রতিটিরই সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কোপার্নিকাস আরও দেখলেন যে, শেষোক্ত প্রণালীতে ব্যাখ্যা অনেক বেশী সরল এবং সহজবোধ্য হয়। এই সহজবোধ্যতাই সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের দিকে কোপার্নিকাসকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি ভাবলেন যে, দৃশ্যমান কোন ঘটনাকে যদি পরস্পর নিরপেক্ষ দুটি তত্ত্বের সাহায্যে সমানভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে ঐ তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটিই অধিকতর মনোযোগের দাবী রাখে। কোপার্নিকাস যখন তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন, তখন গ্রহজগতের দৃশ্যমান এমন কোন ঘটনা ছিল না, যা সমানভাবেই টলেমীয় তত্ত্বেও ব্যাখ্যা করা যেত না। কিন্তু টলেমীয় তত্ত্বে পৃথিবীকে স্থির রাখবার ফলে বহু জ্যামিতিক জটিলতার আমদানী করতে হয়েছিল, যা ঘূর্ণায়মান এবং আবর্তনশীল পৃথিবীর কল্পনায় বাতিল করা সম্ভব হয়। এই চিন্তার সহজতা এবং জ্যামিতিক সরলতাই সম্ভবতঃ সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বে কোপার্নিকাসের দৃঢ় বিশ্বাস এনে দিয়েছিল।

নতুন তত্ত্বে স্থির বিশ্বাস নিয়ে এরপর তা প্রতিষ্ঠার জন্যে কোপার্নিকাস যত্নবান হলেন। ফিলোলাউস, হিকেটাস, হিরাক্লিডিস প্রমুখ মনীষীদের রচনাবলীর মধ্যে তিনি তাঁর চিন্তার সমর্থনে নজীর খুঁজে পেলেন। এঁরা প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে পৃথিবীর গতির অস্তিত্ব স্বীকার ক'রেছেন। আরিস্টারকাসের কাজের মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের হুবহু প্রতিফলন। এই সব গ্রীক্ মনীষীর রচনাবলীর মধ্যে স্বীয় চিন্তাধারার সমর্থন পেয়ে কোপার্নিকাস নিশ্চয়ই অনেকটা সাহস ও নির্ভরতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর তত্ত্বকে বিদগ্ধমহলে গ্রহণযোগ্য করবার জন্যে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিজাল এবং গাণিতিক ভিত্তি রচনার প্রয়োজন ছিল, তা তিনি করেছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মৌলিকত্বে। তাঁর যুক্তিজাল এত নিখুঁৎ, এত স্বচ্ছ যে, অবিশ্বাসীদের তা খণ্ডন করবার মত সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তি একেবারেই ছিল না, যদিও অনেকেই তাঁকে বিধর্মী আখ্যা দিয়ে অভিসম্পাত করেছেন।

নতুন তত্ত্বের যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যার জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন পৃথিবী স্থির এই বহুলপ্রচারিত ভ্রান্ত মতবাদের মূলে কঠিন আঘাত হানা। এই ভ্রান্ত মতবাদের সমর্থনে এর প্রবক্তারা যতগুলি যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন, নিজস্ব পাল্টা যুক্তির সাহায্যে তার প্রতিটি খণ্ডনের জন্যে কোপার্নিকাস অতঃপর যত্নবান হন। যেমন—পৃথিবীর গতিহীনতা প্রমাণ করবার জন্যে আরিস্টোটল, টলেমী প্রমুখের বক্তব্য ছিল এই যে, পৃথিবী যদি গতিশীল হতো, তাহলে মেঘ এবং বাতাসে ভাসমান অন্যান্য পদার্থসমূহকে পৃথিবীর গতির বিপরীত দিকে চলমান দেখা যেত। আবার পৃথিবী যদি তার অক্ষের উপর প্রতি 24 ঘন্টায় একবার করে ঘোরে, তাহলে সেই ঘূর্ণনের বেগ হবে এত প্রচণ্ড যে, এর দেহের বিভিন্ন অংশ ভেঙেচুরে বিভিন্ন দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু কার্যতঃ আমরা এর বিপরীত ঘটনাই দেখতে পাই; অর্থাৎ পৃথিবীই বস্তুং

বাইরের বস্তুনিচয়কে নিজদেহে আকর্ষণ করে নেয়। অতএব এই প্রাচীন মতানুযায়ী, পৃথিবীর কোনরূপ গতির অস্তিত্বই একটি অবাস্তব কল্পনা। এই ক্ষেত্রে কোপার্নিকাসের পাল্টা যুক্তি এই যে, চলার পথে পৃথিবী তার আবহমণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে চলে; কাজেই মেঘ বা বাতাসে ভাসমান অন্যান্য পদার্থসকল পৃথিবীর সঙ্গে সমগতিতে চলে। ফলতঃ এসকল পদার্থকে পৃথিবীর বিপরীত দিকে চলমান দেখা যেতে পারে না। আবার, ঘূর্ণনের ফলে যদি পৃথিবী খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়, তাহলে যেহেতু বিশ্বগোলকের আয়তন পৃথিবীর তুলনায় অতি বিশাল, অতএব ঘূর্ণনের ফলে তার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। কোপার্নিকাসের মতে, বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আহ্নিক ঘূর্ণনের চেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথিবীর আহ্নিক ঘূর্ণনের কল্পনা করা অনেক সহজ। তাই এক্ষেত্রেও তিনি এই সহজতর ব্যাখ্যাকেই অধিক বাস্তবসম্মত বলে গ্রহণ করেছেন। এই নতুন তথ্যের ভিত্তিতে পরে তিনি গ্রহজগতের দৃশ্যমান ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে দেখালেন যে, দিনরাত্রির ঘটনা বোঝাবার জন্যে স্থির পৃথিবীর চারদিকে সমগ্র বিশ্বগোলকের 24 ঘণ্টায় একবার ঘোরবার মত কষ্টকর কল্পনা করবার দরকার নেই। পৃথিবী যদি তার নিজ অক্ষের উপর 24 ঘণ্টায় একবার করে ঘোরে, তাহলেও উক্ত ঘটনা হুবহু একই রূপে অনুষ্ঠিত হবে এবং এই ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর কল্পনা অনেকগুণে সহজ।

আমরা আগেই দেখেছি, গ্রহগুলির সম্মুখ এবং বিপরীত গতি এবং বিভিন্ন সময়ে তাদের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ইত্যাদি দৃশ্যমান ঘটনাবলীর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেবার জন্যে টলেমীকে কি জটিল জ্যামিতিক ভাবনার আমদানী করতে হয়েছিল। কোপার্নিকাস হিসাব করে দেখালেন যে, পৃথিবীকে যদি অন্যান্য গ্রহগুলির মতই একটি গ্রহ হিসাবে কল্পনা করা যায় এবং মনে করা যায় যে, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সূর্য থেকে বিভিন্ন দূরত্বে থেকে তার চারদিকে বিভিন্ন আবর্তনকাল নিয়ে ঘুরছে, তাহলে উপরিউক্ত দৃশ্যমান ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা আরও সহজ এবং সুষ্ঠুভাবে দেওয়া সম্ভব। সূর্য থেকে বিভিন্ন দূরত্বে বিভিন্ন গতিবেগ নিয়ে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে যদি ঘুরতে থাকে, তবে আপেক্ষিক গতির স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ীই ওই সব ঘটনা পরিলক্ষিত হবে। আবার কক্ষপথে গ্রহগুলির আপাতঃ অসম (Non-uniform) গতির ব্যাখ্যার জন্যে টলেমীকে প্রতিটি গ্রহের জন্যে একটি বা একাধিক বৃত্তান্তর কল্পনা করতে হয়েছিল। কিন্তু কোপার্নিকাসের তত্ত্বানুযায়ী কক্ষপথে পৃথিবীর গতির সাহায্যেই অনেক সহজ ও সুষ্ঠুভাবে গ্রহগুলির অসম গতির ব্যাখ্যা করা যায়। একইভাবে তিনি সৌর ক্রান্তিবৃত্তের (Ecliptic) ব্যাখ্যাও কল্পনা করেছেন। টলেমীর যুক্তিতে স্থির পৃথিবীর চতুর্দিকে সূর্যের বার্ষিক পরিক্রমার ফলেই এই বৃত্তটির উৎপত্তি, সূর্যই এখানে সক্রিয়। পক্ষান্তরে কোপার্নিকাসের মতে স্থির সূর্যের চতুর্দিকে বছরে একবার পৃথিবীর আবর্তনের ফলেও ওই একই বৃত্ত বিশ্বগোলকের উপর অঙ্কিত হবে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সূর্যপরিক্রমার সময় যদি তার অক্ষ সারা বছর ধরে সৌর ক্রান্তিবৃত্তের তলের সঙ্গে সমানভাবেই হেলে থাকে, তাহলে স্বাভাবিক নিয়মেই পরিলক্ষিত (Observed ঋতুপরিবর্তনের ঘটনা অনুষ্ঠিত হবে। আবার অয়নচলনের (Precession of the equinoxes) ঘটনাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন পৃথিবীর অক্ষের ক্রমশঃ দিক-পরিবর্তনের প্রকাশ হিসাবে। এখন আমরা জানি যে, উপরিউক্ত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় কোপার্নিকাসের যুক্তি ছিল নির্ভুল।

আবহমানকাল থেকে ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের প্রবক্তাদের পৃথিবীর আবর্তনগতির কল্পনার বিপক্ষে

এক জোরালো যুক্তি ছিল এই যে, এই গতির অস্তিত্ব বাস্তব হলে নক্ষত্রদের অবস্থানের লম্বন-জনিত পরিবর্তন (Parallactic displacement) অবশ্যই পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু বহু যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও এই পরিবর্তনের অস্তিত্ব কেউ কোন দিন খুঁজে পায় নি। অতএব পৃথিবীর আবর্তন গতির অস্তিত্ব অবাস্তব। কিন্তু কোপার্নিকাসের যুক্তি এই যে, পৃথিবীর কক্ষবৃত্তের ব্যাস নক্ষত্রের দূরত্বের তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে, উদ্ভূত লম্বনের পরিমাপ করা কখনও সম্ভব হয় নি। পরবর্তী কালে উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিমাপ প্রণালীর উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও যখন নক্ষত্রের লম্বন মাপা যায় নি, তখন সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের বিরোধীরা পৃথিবীর বার্ষিক গতির কল্পনাকে আজগুবি প্রমাণের জন্যে ক্রমেই জোরালো যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে টাইকো ব্রাহীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টাইকোর যন্ত্রপাতি ছিল তখনকার দিনে সর্বাপেক্ষা নিখুঁৎ এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থানের পরিমাপ বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। কোপার্নিকাসের তত্ত্বের সম্ভাব্যতা পরীক্ষার জন্যে তিনি তাঁর উন্নত যন্ত্রপাতি নিয়ে নক্ষত্রের লম্বন পরিমাপের বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। তাই তিনি সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনের ব্যাপারটা অবাস্তব বলে মনে করেন। তাঁর প্রদত্ত বিশ্বতত্ত্বে আমরা দেখতে পাই [2 (গ) নং চিত্র] যে, তিনি বুধ, শুক্র এবং অন্যান্য গ্রহদের সূর্যের চারদিকে আবর্তনশীল ধরেছেন, কিন্তু এই গোটা পরিবারসমেত সূর্য আবার পৃথিবী প্রদক্ষিণরত। এখন আমরা জানি যে, এই বিষয়ে কোপার্নিকাসের ধারণা ছিল অভ্রান্ত। নক্ষত্রদের দূরত্ব বাস্তবিকই অতি বিপুল এবং এই দূরত্বের তুলনায় পৃথিবীর কক্ষবৃত্তের ব্যাস অতি নগণ্য। ফলে লম্বনের পরিমাপ এত ক্ষুদ্র যে, আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি এবং পরিমাপ-প্রণালী আবিষ্কারের আগে এই লম্বন মাপা সম্ভব হয় নি। মাত্র 1838 সালে মহাগণিতজ্ঞ বেসেল্ (Bessel) এবং হেণ্ডারসন (Henderson) দুটি নক্ষত্রের লম্বন সর্বপ্রথম পরিমাপ করতে সক্ষম হন। তারপরে অবশ্য হাজার হাজার নক্ষত্রের লম্বন মাপা হয়েছে, কিন্তু তার কোনটিরই কৌণিক পরিমাপ 0″8-এর বেশী নয়। এই পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র, যে জন্যে যুগে যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহু যত্ন সত্ত্বেও পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীর সহজ দৃষ্টিকোণ থেকে কোপার্নিকাস এই সত্যটির প্রতি সুস্পষ্টভাবে অংগুলি নির্দেশ করেছিলেন।

অতএব যে গ্রহ এবং নক্ষত্রজগতের রূপ কোপার্নিকাস মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার সহজতম প্রকাশ দেখা যায় 4নং চিত্রে। সূর্যই এই জগতের অধীশ্বর, এই জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত থেকে অপর সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। পৃথিবীর কোন বিশেষ ভূমিকা নেই এই সৌরপরিবারে। অপর যে কোন গ্রহের মতই সে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে এবং একই সঙ্গে প্রতি 24 ঘণ্টায় একবার করে নিজ অক্ষের উপর পাক খাচ্ছে। ফলে দিন-রাত্রি, ঋতু পরিবর্তন, কক্ষপথে বিভিন্ন সময়ে গ্রহদের সম্মুখ ও বিপরীত গতি, তাদের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য প্রভৃতি দৃশ্যমান ঘটনাবলী সাধারণ নিয়মেই সংঘটিত হচ্ছে। পরবর্তী কালে তিনি নিজস্ব পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে 4নং চিত্রে বর্ণিত অতি সরল সৌরজগতের ধারণাকে ক্রমে ক্রমে আরও উন্নত করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌দের মতই উৎকেন্দ্রিক বৃত্ত (Eccentric) এবং বৃত্তাভাসও (Epicycles) ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর তত্ত্বে পৃথিবীকে কোন বিশেষ মর্যাদার স্থান দেন নি, সেহেতু তাঁর ব্যবহৃত বৃত্তাভাস সংখ্যা

টলেমীর ব্যবহৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও কোপার্নিকাসের তত্ত্বের সরলতা উল্লেখযোগ্য।

সুদৃঢ় গাণিতিক ভিত্তির উপর তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্যে কোপার্নিকাসের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তাঁর গ্রন্থ 'ড রিভোলিউসনিবুস'-এর বহুলাংশ বেশ জটিল গাণিতিক ও জ্যামিতিক হিসাব-কারণ, কোপার্নিকাসের সময় উপবৃত্ত (Ellipse) সম্বন্ধে কিছু জানা ছিল না। গ্রহদের কক্ষপথকে নিখুঁৎ বৃত্ত কল্পনা করেই তিনি সব কিছুর হিসাব করেছেন। উপবৃত্তে গ্রহের গতিকে বৃত্তপথে গতির ধারণার সঙ্গে মেলাবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবের জটিলতা। কাজেই কোপার্নিকাসকে যে বহুবিধ গাণিতিক ও জ্যামিতিক জটিলতার
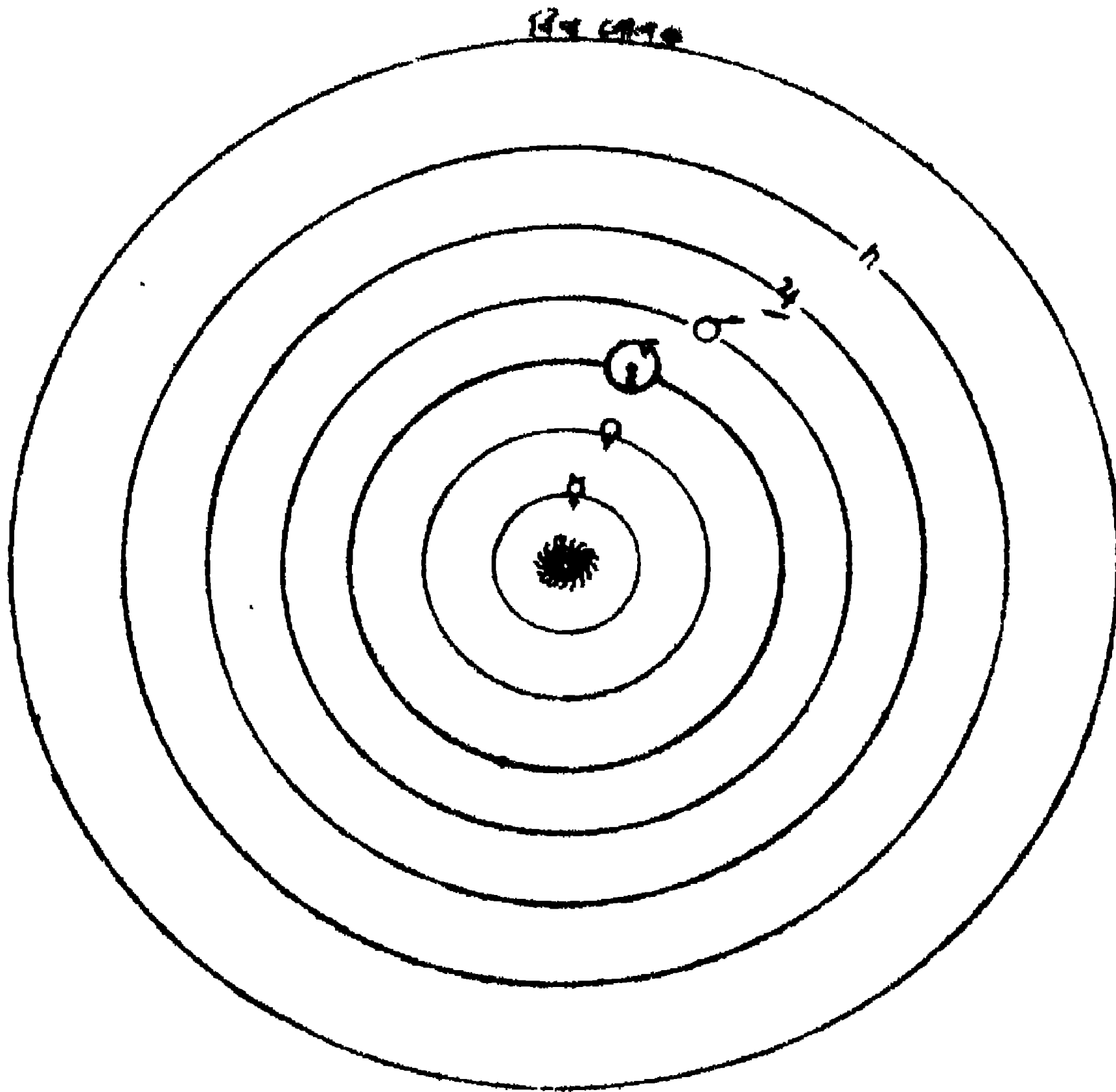
4নং চিত্র : কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্ব।

নিকাশে পূর্ণ। এই জটিলতার আশ্রয় নিতে হয়েছে প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ, কোপার্নিকাস তাঁর কাজের জন্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিদ্‌দের সংগৃহীত অনেক তথ্য ব্যবহার করেছেন। এই সব তথ্য যদিও ছিল ভুলে ভরা, কিন্তু কোপার্নিকাস এগুলিকে নির্ভুল বলে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে এগুলিকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। ফলে বহু জটিলতার উদ্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রায় দুঃসাধ্য কাজ কি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তিনি সমাধান করেছেন, তা ভাবতে অবাক লাগে। প্রদত্ত 1নং সারণী (Table) আলোচনা করলেই আমরা তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাই। এই সারণীতে কোপার্নিকাসের নির্ণীত গ্রহগুলির দূরত্বের সঙ্গে বর্তমানে স্বীকৃত দূরত্বের একটি তুলনামূলক চিত্র রয়েছে। সারণীতে আমরা দেখতে পাই যে,

1নং সারণী

(সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে একক ধরে)

গ্রহ	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (কোপার্নিকাস)	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (বর্তমানে স্বীকৃত)
বুধ	0·376	0·387
শুক্র	0·719	0·723
পৃথিবী	1·000	1·000
মঙ্গল	1·520	1·524
বৃহস্পতি	5·219	5·203
শনি	9·174	9·539

কেবলমাত্র দূরতম গ্রহ শনি ছাড়া (ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো তখনও আবিষ্কৃত হয় নি) অন্য সবগুলি গ্রহের দূরত্বই কোপার্নিকাস দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ভুল হিসাব করেছিলেন। যে যুগে উপবৃত্তাকার পথে গতির ধর্ম কিছুই জানা ছিল না, গ্রহগুলির দূরত্ব সম্বন্ধীয় কেপ্‌লারের সূত্র ছিল অজ্ঞাত, আধুনিক কোন উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী ছিল বহু দূর ভবিষ্যতের অন্ধকার জঠরে সুপ্ত—এমন কি, পৃথিবীর আবর্তনের কথা চিন্তা করাও ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সে যুগে শুধুমাত্র জ্যামিতিক কল্পনা এবং গাণিতিক হিসাবের সাহায্যে কোপার্নিকাস কি করে গ্রহদের দূরত্বের এরূপ প্রায় নির্ভুল হিসাব করতে পারলেন, তা ভাবতেও অপরিসীম বিস্ময়-বোধ হয়। এই ঘটনা কোপার্নিকাসের মহান প্রতিভার মৌলিকত্বের একটি নিদর্শন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, কোপার্নিকাস প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিকের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে গ্রহজগতের বাস্তব চিত্রটি মোটামুটি নির্ভুলভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর এই দর্শনের মূল প্রেরণা ছিল দৃঢ় আত্মবিশ্বাস এবং কোন ঘটনাকে সহজ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার ক্ষমতা। তখনকার দিনে গ্রহজগতের এমন কোন পর্যবেক্ষিত ঘটনা ছিল না, যা কোপার্নিকাস এবং টলেমী উভয়ের তত্ত্বের সাহায্যেই সমভাবে ব্যাখ্যা করা যেত না। কিন্তু কোপার্নিকাসের ব্যাখ্যা ছিল অনেক সহজ। কোপার্নিকাসের তত্ত্বের উৎকর্ষ এখানেই। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে, এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতাও কিছু কিছু ছিল। প্রথমতঃ, দৃশ্যমান ঘটনাবলীর সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্যে কোপার্নিকাস যদিও পৃথিবীর দুটি গতির অস্তিত্ব কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজে পৃথিবীর এই গতি দুটির কোনটিরই অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। আমরা জানি, সে প্রমাণ এসেছিল আরও অনেক পরে ব্রাড্‌লীর (Bradley) অপেরণ (Aberration), বেসেলের লম্বন এবং ফোকর (Foucault) পৃথিবীর ঘূর্ণন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে (যথাক্রমে 1725, 1838 এবং 1351 সালে)। দ্বিতীয়তঃ, কোপার্নিকাসের তত্ত্বে সূর্যকে নিশ্চল কল্পনা করা হয়েছে। আমরা জানি এই কল্পনা ভুল। সূর্য তার নিজস্ব পরিবার নিয়ে আমাদের নক্ষত্রজগতের (Galaxy) কেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 250 কিলোমিটার বেগে ধাবমান। তৃতীয়তঃ, কোপার্নিকাস গ্রহদের উপবৃত্তীয় পথে গতির কথা জানতেন না। গ্রহদের কক্ষপথকে তিনি বৃত্তাকার কল্পনা করেছেন, ফলে হিসাবে নানা ভুলত্রুটি অনিবার্যভাবেই রয়ে গেছে। তাঁর মৃত্যুর প্রায় 50 বছর পরে কেপ্‌লার আবিষ্কার করেন যে, গ্রহদের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। প্রায় একই সময়ে গ্যালিলিও নিজের তৈরী দূরবীক্ষণের সাহায্যে শুক্রগ্রহের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেন। ফলে সর্বপ্রথম কোন একটি গ্রহের সূর্য পরিক্রমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মানুষের চোখে ধরা পড়ে। আরও পরে নিউটন প্রমাণ করেন যে, উপবৃত্তাকার পথে গ্রহদের সূর্য পরিক্রমা সূর্য ও গ্রহদের মধ্যে মহাকর্ষীয় আকর্ষণের অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ। নিউটনের কাজের মধ্য

দিয়ে কোপার্নিকাসের তত্ত্বের ভৌত-প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হলো।

উপসংহারে বলা যায়, কোপার্নিকাস তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের দ্বারা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সৌধ গড়েছেন, তার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করেছেন কেপ্লার, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি মহাবিজ্ঞানিগণ। এখন আমরা বিশ্বজগতের বাস্তব চিত্রকে কোপার্নিকাসের বিশ্ব বলে অভিহিত করি। তাঁর কারণ, বর্তমান বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের সুষ্ঠু ধারণা কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে মূল ভিত্তি করেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই হিসাবে কোপার্নিকাস নিশ্চয়ই আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সার্থক পথিকৃৎরূপে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাবার উপযুক্ত।

গঠন-বিশ্লেষণে ফটোইলাষ্টিক পদ্ধতি

শ্রীফাল্গুনী কর*

1816 খৃষ্টাব্দে ব্রিউষ্টার (Brewster) পিষ্ট (Stressed) স্বচ্ছ পদার্থের প্রায়-কেলাসিত (Quasi-Crystalline) ধর্ম প্রথম লক্ষ্য করিলেও উহার বাস্তব ও সহজ ব্যবহার এই শতাব্দীর প্রথম দিকেই সুরু হয়। ব্রিউষ্টার জানিতেন, স্বচ্ছ পদার্থের এই ধর্ম বস্তুর পীড়ন (Stress) মাপিবার কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তিনি বলিয়াছিলেন যে, আলোক পদ্ধতিতে (Optical Method) আর্চ-এর (Arch, Structure) পীড়ন অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর আরও বহু বিজ্ঞানী ও কৃত্রিম দ্বি-প্রতিসরণ (Artificial Double Refraction) সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করেন, কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যবহারের ব্যাপারে কেহই বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। পরে সেলুলয়েডের (Celluloid) নমুনা (Model) ব্যবহার করিয়া ককার (Coker), ফিলন (Filon) ও তাঁহাদের সহকর্মীরা ফটোইলাষ্টিক বিশ্লেষণে এক নূতন যুগের সূচনা করেন। তাঁহারা নূতন রকমের যন্ত্র ও নূতন পরীক্ষা পদ্ধতির দ্বারা বহু প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক প্রশ্নেরও অনুসন্ধান করেন। এই শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে আমেরিকান বিজ্ঞানীরাও এই বিষয়ে আরও উন্নততর গবেষণা করিয়া বহুভাবে ইহার উন্নতিসাধন করেন।

ফটোইলাষ্টিক বিশ্লেষণ একটি বিশেষ ধরণের পরীক্ষা পদ্ধতি, যাহার সাহায্যে কোন গঠনের কোন বিশেষ অংশে (Section) বিভিন্ন প্রকার পীড়ন (Stress) সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। গঠন বিশ্লেষণ (Structural analysis) অর্থে এখানে কোন গঠনের (Structure) পীড়ন বিশ্লেষণ (Stress analysis) বুঝান হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ফটোইলাষ্টিক পরীক্ষা হইতে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তাহাদের এক করিয়া কি ভাবে একটি গঠন বা গঠনাংশের বিশ্লেষণ করা যায়, ব্যাপক অঙ্কের ভিতর না গিয়া তাহা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইল। সাধারণতঃ প্রকৃত গঠন বা গঠনাংশটির মত ফটোইলাষ্টিক বস্তু (Photoelastic material)—কাচ অথবা প্লাষ্টিক—দ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্রাকার একটি নমুনার (Model) উপর এই পরীক্ষা হয় এবং প্রকৃত গঠনের উপর আনুমানিক চাপের (Load) পরিমাণ নমুনার আকৃতি (Scale) অনুযায়ী হ্রাস

* Ferrocrete Construction Ltd., Gauhati-3, Assam.

করিয়া উহার উপর প্রয়োগ করা হয়। এইভাবে নমুনাটিতে উৎপন্ন পীড়ন অনুযায়ী প্রকৃত গঠনটিতে পীড়ন নির্ণয় করা হয়। আরও বহু ভাবে এই পরীক্ষা করা যায়, কিন্তু উক্ত নমুনার উপর এই পরীক্ষা বিশেষ প্রচলিত।

কাচ, প্লাষ্টিক প্রভৃতি পদার্থ সাধারণতঃ আইসোট্রপিক (Isotropic), কিন্তু পীড়ন প্রয়োগ করিলে উহারা অ্যানাইসোট্রপিক পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া যায়। অ্যানাইসোট্রপিক পদার্থ হইতেছে, যে স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিসরিত আলোক রশ্মির বেগ (Speed) রশ্মির প্রসারের (Propagation) দিকের উপর নির্ভর করে। সমস্ত কেলাস (Crystal) অ্যানাইসোট্রপিক পদার্থ। একটি কেলাস খণ্ডের মধ্য দিয়া আলোক রশ্মিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি বিভিন্ন তরঙ্গ-ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রতিসরিত হইতে দেখা যায়। এই প্রক্রিয়াকে দ্বি-প্রতিসরণ (Double refraction) বলে। ঐ প্রতিসরিত (Refracted) রশ্মি, তথা উহাদের তরঙ্গ-ক্ষেত্র (Wave front) দুইটির একটির গতি কেলাস খণ্ডটির মধ্যে অন্যটি হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে। এই দুইটি ভিন্ন তরঙ্গ-ক্ষেত্রের একটিকে সাধারণ তরঙ্গ-ক্ষেত্র ও অন্যটিকে অসাধারণ তরঙ্গ-ক্ষেত্র বলে ও তরঙ্গ-ক্ষেত্র অনুযায়ী রশ্মিদ্বয়কে যথাক্রমে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মি ও তরঙ্গদ্বয়কে সাধারণ ও অসাধারণ তরঙ্গ বলে।

কেলাস খণ্ডের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া এই তরঙ্গ ক্ষেত্রদ্বয় একই গতিবেগে প্রসারিত হয় অর্থাৎ উহাদের মধ্যে কেলাসখণ্ডে সৃষ্ট দূরত্ব বাহিরে আসিয়া একই থাকিয়া যায়। এই দূরত্বকে আপেক্ষিক মন্দন দূরত্ব (Relative path retardation) বা আপেক্ষিক মন্দন (Relative retardation) বলা হয়। আপেক্ষিক মন্দন, রশ্মির গতিবেগ ও কেলাস-খণ্ডের বেধের উপর নির্ভর করে। সুতরাং

আপেক্ষিক মন্দন, $R=(\mu_o-\mu_e)\,d$

μ_o ও μ_e = সাধারণ (Ordinary) ও অসাধারণ (Extraordinary) তরঙ্গের প্রতিসরাঙ্ক, যাহা তরঙ্গের গতিবেগের উপর নির্ভর করে ও d = কেলাসখণ্ডের বেধ।

[দ্বি-প্রতিসরণ প্রক্রিয়ার জটিলতার ভিতর না গিয়া এই প্রবন্ধে যতটুকু প্রয়োজন তাহাই শুধু বলা হইল।]

এখন এই আপেক্ষিক মন্দনের জন্য সাধারণ ও অসাধারণ তরঙ্গের মধ্যে ব্যতিচার (Interference) সম্ভব, যদি শুধু সেই তরঙ্গ দুইটিকেই কোন একটি বিশেষ তলে সমবর্তিত (Polarise) করা যায়। অতএব কেলাস-খণ্ডে আপতিত রশ্মিটিকেও (Incident ray) তাহা হইলে সমবর্তিত করিতে হইবে। কারণ অসমবর্তিত রশ্মির গতি বিভিন্ন তলে ও বিভিন্ন দিকে, সুতরাং এক তলের সাধারণ রশ্মি অন্য এক তলের অসাধারণ রশ্মির সহিত মিলিয়া যায় ও কোন একটি বিশেষ তলের আপতিত রশ্মি হইতে উদ্ভূত সাধারণ ও অসাধারণ তরঙ্গদ্বয়কে খুঁজিয়া লওয়া সম্ভব হয় না এবং সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মিগুচ্ছের মধ্যে আপেক্ষিক মন্দন থাকা সত্ত্বেও একের সহিত অপরের ব্যতিচার সম্ভব নয়। অতএব সমবর্তিত রশ্মি পাইতে হইলে সমবর্তী যন্ত্রের (Polariscope) প্রয়োজন। এই যন্ত্রের বিশদ আলোচনায় না গিয়া উক্ত প্রবন্ধে যন্ত্রটির ব্যবহারই শুধু আলোচনা করা হইল। এই যন্ত্রে দুইটি সমবর্তন-ছাঁকনী (Polarising filter) থাকে। একটি ছাঁকনী রশ্মিগুচ্ছকে কোন একটি বিশেষ তলে সমবর্তিত করে ও অন্যটি ছাঁকনীদ্বয়ের মধ্যবর্তী কেলাস-খণ্ড হইতে নির্গত সাধারণ ও অসাধারণ তরঙ্গ দুইটিকে অন্য একটি বিশেষ তলে দ্বিতীয়বার সমবর্তিত করে। এই দ্বিতীয় সমবর্তন তল সাধারণতঃ প্রথম সমবর্তন তলের (Plane of

polarization) সহিত পরস্পর লম্ব হইয়া থাকে। এখন তরঙ্গ দুইটিকে একই তলে সমবর্তিত করিলে উহাদের মধ্যে সহজেই ব্যতিচার সম্ভব। এই ব্যতিচারের ফলে দুইটি একই তলে সমবর্তিত তরঙ্গের প্রাখর্য (Intensity) ঐ তরঙ্গ দুইটির আপেক্ষিক মন্দনের উপর নির্ভর করে। ইহা ছাড়াও আর একটি বিশেষ ধরণের সমবর্তী-যন্ত্রের ব্যবহার এই সঙ্গে ফটোইলাষ্টিক বিশ্লেষণে হইয়া থাকে, তাহাকে বৃত্তীয় সমবর্তী-যন্ত্র (Circular polariscope) বলে। এই যন্ত্র সাধারণ সমবর্তী-যন্ত্রেরই মত, শুধু ইহাতে আরও দুইটি কেলাস পাত (Crystal plate) থাকে। একটি প্রথম সমবর্তক-ছাঁকনীর পরে ও অন্যটি দ্বিতীয় সমবর্তক-ছাঁকনী বা বিশ্লেষণের আগে। ইহাদের সিকি তরঙ্গ পাত (Quartar wave plate) বলে। ইহাদের কাজ হইল যে কোন সমবর্তিত তরঙ্গকে উহাদের দশা (Phase) অনুযায়ী বৃত্তাকারে ঘূর্ণিত করা। ইহাতে বিভিন্ন তলের সাধারণ ও অসাধারণ তরঙ্গের ব্যতিচার একই সময় লক্ষ্য করা যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কাচ অথবা প্লাষ্টিক জাতীয় আইসোট্রপিক পদার্থ যখন পিষ্ট হয়, তখন ইহারা একটি কেলাস খণ্ডের (Anisotropic crystal) মত ব্যবহার করে। এখন কেলাসের পরিবর্তে যদি উপরিলিখিত কোন একটি বস্তু ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে পীড়নের পরিমাণ অনুযায়ী সমবর্তী-যন্ত্রের পর্দা উজ্জ্বল বা অন্ধকার দেখা যাইবে। [যখন আপেক্ষিক মন্দন দূরত্ব পূর্ণসংখ্যক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান হয় অথবা যখন আপতিত রশ্মির সমবর্তন দিক পিষ্ট পদার্থের সমবর্তন অক্ষের সহিত মিলিয়া যায়, তখন ব্যতিচারের ফলে যুক্ত কম্পনের বিস্তার শূন্য হয়। অঙ্ক করিয়া এই যুক্তি সহজেই প্রমাণ করা যায়।] কারণ, কোন একবর্ণী সমবর্তিত রশ্মি যখন কোন পিষ্ট প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থ কাচের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন প্রবেশবিন্দু হইতে ঐ রশ্মি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই মুল পীড়নের (Principal stress) তলে সমবর্তিত হয়। সুতরাং সাধারণ কেলাসের মত সাধারণ ও অসাধারণ তরঙ্গদ্বয় কাচ বা প্লাষ্টিকখণ্ডের মধ্যে ভিন্ন গতিবেগে প্রসারিত হয় ও পিষ্ট নমুনা হইতে নির্গত হইবার পর উহাদের মধ্যে আপেক্ষিক মন্দনজনিত দূরত্বের পরিমাণ সাধারণতঃ দুই মুল পীড়নের বিয়োগ ফলের সমানুপাতিক হয়। আবার আপেক্ষিক মন্দন প্লাষ্টিকখণ্ডের বা কাচখণ্ডের বেধের (Thickness) সমানুপাতিক।

অতএব, আপেক্ষিক মন্দন, $R = C(\sigma_p - \sigma_q)d$

σ_p ও σ_q দুই মুল পীড়নের পরিমাণ ও d, পরীক্ষিত বস্তুর বেধ। C একটি ধ্রুবক (Constant) এবং ইহাকে আলোক পীড়ন গুণাঙ্ক (Stress optical coefficient) বলে। ইহার একক ব্রিউষ্টার (Brewster) $= \frac{1}{\text{পীড়ন}} = 10^{-13}$ $\frac{\text{সেমি}^2}{\text{ডাইন}}$ যখন, আপেক্ষিক মন্দনের একক $= 1$ অ্যাংষ্ট্রম (Å) $\sigma_p - \sigma_q$ এর একক $= \frac{\text{কেজি}}{\text{সেমি}^2}$ এবং d-এর একক $= 1$ মিমি. ফুট পাউণ্ড এককে উপরের সমীকরণটি হইবে,

$$R = 1{\cdot}752\ C(\sigma_p - \sigma_q)d$$

$\sigma_q - \sigma_q$ এর একক পরিবর্তিত হইয়া $1\ \frac{\text{পাউণ্ড}}{\text{ইঞ্চি}^2}$ 3d-এর একক পরিবর্তিত হইয়া 1 ইঞ্চি হইবে।

আমরা জানি, আপেক্ষিক মন্দন, এক বা একাধিক পূর্ণ সংখ্যক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান হইলে সাধারণ ও অসাধারণ তরঙ্গের ব্যতিচারের ফলে যুক্ত কম্পনের বিস্তার (Amplitude) শূন্য হইয়া যায়, অর্থাৎ সমবর্তী-যন্ত্রের পর্দা অন্ধকার হইয়া যায়। সুতরাং কোন একটি স্বচ্ছ প্লাষ্টিকখণ্ডকে যদি সমবর্তী-যন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া উহার উপর

টান-পীড়ন (Tensile stress) বাড়াইতে থাকা যায় এবং তাহার উপর সমবর্তিত একবর্ণী রশ্মি নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে টানের পরিমাণের সহিত উপরিউক্ত নিয়ম অনুযায়ী সমবর্তী-যন্ত্রের পর্দা একবার অন্ধকার ও একবার আলোকিত হইতে থাকিবে; অর্থাৎ যখন প্লাষ্টিকখণ্ডটির উপর কোন টান নাই, বস্তুটি তখন আইসোট্রপিক, অতএব সমবর্তী-যন্ত্রের পর্দা তখন অন্ধকার। এখন আস্তে আস্তে যদি টান বাড়াইতে থাকা যায়, তবে পর্দাও আলোকিত হইতে থাকে এবং ঔজ্জ্বল্য সর্বাপেক্ষা বেশী হয় যখন আপেক্ষিক মন্দন এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান হয়। ইহার পরে টান বাড়াইতে থাকিলে টানের সহিত পর্দায় আলোকের ঔজ্জ্বল্য কমিতে থাকে ও আপেক্ষিক মন্দন এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান হইলে পর্দা আবার অন্ধকার হইয়া যায়।

উপরে আলোচিত পীড়ন অতি সাধারণ ও সহজেই ইহার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু কোন জটিল গঠনাংশের নমুনায় অসম (Non uniform) পীড়ন প্রয়োগ করিলে নমুনাটির বিভিন্ন স্থানে সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মির মধ্যে আপেক্ষিক মন্দন বিভিন্ন হইবে। সুতরাং এই-রূপ পিষ্ট কোন নমুনাকে একবর্ণী রশ্মির ঘূর্ণি সমবর্তী-যন্ত্রের সাহায্যে নিরীক্ষণ করিলে পর্দায় কতকগুলি উজ্জল ও অন্ধকার রেখার স্তর দৃষ্ট হয়। এই স্তরীভূত রেখাগুলির এক একটির প্রত্যেক বিন্দুতে পীড়ন $(\sigma_p - \sigma_q)$ সমান এবং অন্ধকার রেখাগুলির পীড়ন মান (Stress value) আপেক্ষিক মন্দন অনুযায়ী (আপেক্ষিক মন্দন, পূর্ণসংখ্যক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান) পূর্বোক্ত সমীকরণ হইতে পাওয়া যাইবে।

একটি দণ্ডের (Beam) শুদ্ধ নমনের (Pure bending) নির্দিষ্ট উৎপন্ন স্তরের একটি আনু-মানিক (1নং চিত্র) দেওয়া হইল। আমরা জানি ইহার বিভিন্ন স্তরে পীড়ন সমান $\frac{My}{I}$

M = নমনাঙ্ক (Bending moment)

y = প্রশমতা অক্ষ হইতে স্তরের দূরত্ব (Distance of the layer from neutral axis)

I = নিষ্ক্রিয়তার ভ্রামক (Moment of i ertia)

প্রশমতা অক্ষে পীড়ন শূন্য অর্থাৎ এই স্তরটি পর্দায় অন্ধকার বা কালো রেখার মত দৃষ্ট হইবে। ইহার ঠিক পরের, উপরের ও নীচের অন্ধকার রেখা দুইটি, ঐ দুই স্তরে এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দূরত্ব বিশিষ্ট আপেক্ষিক মন্দন এর ফলেই দৃষ্ট প্রমাণিত হয়। এই রেখা দুইটিকে প্রথম স্তরক্রম (First order fringe) বলে। এইরূপ উপরে ও নীচে দুই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিক মন্দনবিশিষ্ট অন্ধকার রেখাদ্বয়কে দ্বিতীয় স্তররেখাক্রম (Second order fringe) বলে ও এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম প্রভৃতি স্তররেখার নামকরণ করা হয়।

কোন নমুনার রেখান্তরে কোন্‌টি কোন স্তররেখা তাহা নির্ণয় করিতে হইলে শূন্য স্তররেখাটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, অথবা চাপ (Load) প্রয়োগ করিবার শুরু হইতে স্তররেখাগুলির পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে হইবে।

নমুনার কোন বিন্দুতে যদি $(\sigma_p - \sigma_q) = O$ হয়, তবে সেই বিন্দুতে আপেক্ষিক মন্দনও শূন্য হইবে এবং এই বিন্দুটি বিশ্লেষকের মধ্য দিয়া একটি অন্ধকার বিন্দু হিসাবে দৃষ্ট হয়। এই বিন্দুকে আইসোট্রপিক বিন্দু (Isotropic point) বলে। কোনও রেখান্তরে (Fringe pattern) এইরূপ বিন্দু দৃষ্ট হইলে উহার দুই পাশের রেখা-দ্বয়কে সহজেই প্রথম স্তররেখাক্রম হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। আবার $\sigma_p - \sigma_q = O$ হইলে সেই বিন্দুটিও বিশ্লেষকের মধ্য দিয়া অন্ধকার দেখায়। ইহাকে নিস্তুল্য বিন্দু (Singular point) বলে। চাপের বা পীড়নের সহিত বিন্দুটির কোন পরিবর্তন হয় না।

আমরা জানি, চরম কৃন্তন পীড়ন (Maximum shearing stress) সমান $\frac{\sigma_p - \sigma_q}{2}$। আবার

নমুনার বিভিন্ন স্তররেখার প্রত্যেকটি $(\sigma_p - \sigma_q)$-এর একটি স্থির মান নির্দেশ করে। সুতরাং $(\sigma_p - \sigma_q)$-এর মান নির্দেশক সমরেখাগুলি (Contours) নমুনার প্রতি বিন্দুতে চরম কৃন্তন পীড়নও করে, সেই রেখাকে আইসোক্লিনিক রেখা বলে। সুতরাং সাধারণ সমবর্তী-যন্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত অন্ধকার রেখার প্রতিটি বিন্দুতে মুখ্য পীড়ন দিক কোন একটি অক্ষের একই কোণে নত থাকে
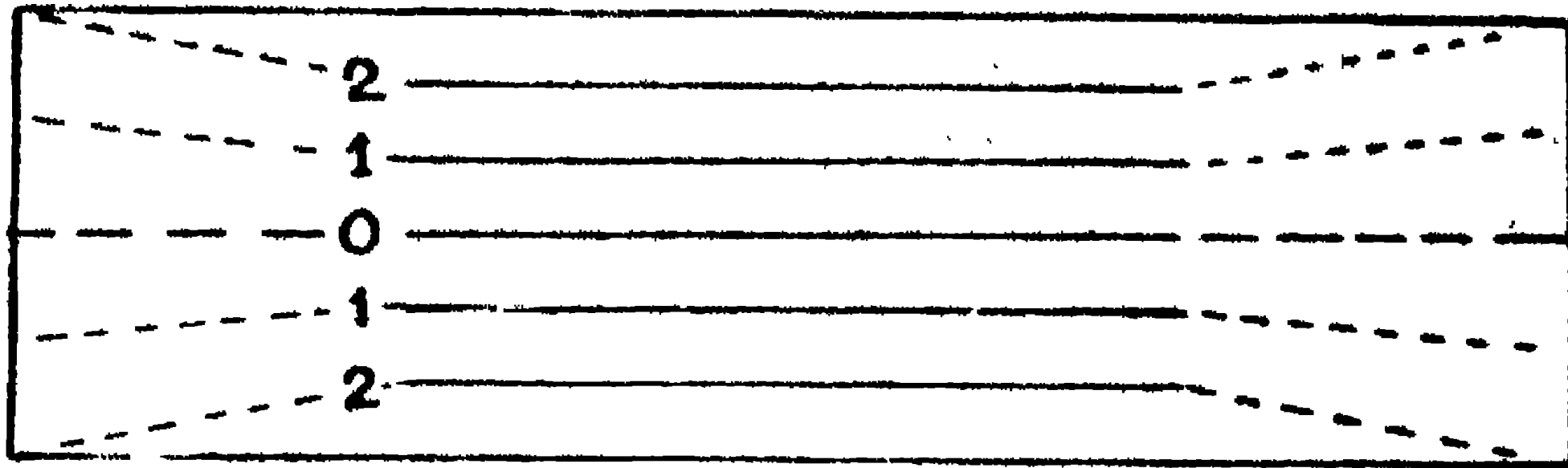
1নং চিত্র

নির্ণয় করে। একবর্ণী রশ্মির পরিবর্তে শুভ্র আলোক রশ্মি সমবর্তিত করিয়া ব্যবহার করিলেও বিশ্লেষকের মধ্য দিয়া বিভিন্ন স্তররেখা দৃষ্ট হইবে, কিন্তু ইহারা হইবে বিভিন্ন রঙের। ঐ রেখাগুলির পীড়নমান উহাদের রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করিবে।

এতক্ষণ বৃত্তীয় সমবর্তী-যন্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত রেখান্তর হইতে কিভাবে পীড়ন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়, তাহা আলোচনা করা হইল। এখন একই নমুনাকে যদি একটি সাধারণ সমবর্তী-যন্ত্রের সাহায্যে নিরীক্ষণ করা যায় এবং যদি নমুনাটির কোন একটি বিন্দুতে উহার একটি মুখ্য পীড়নের দিক (Dircction of principal stress $\sigma_p - \sigma_q$) সমবর্তিত আপতিত রশ্মির দিকের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিন্দুটি বিশ্লেষকের মধ্য দিয়া অন্ধকার দেখা যায় এবং এই বিন্দুটির সঞ্চার পথ (Locus of the point) বিশ্লেষকের মধ্য দিয়া একটি অন্ধকার রেখারূপে দৃষ্ট হয়। এই রেখাকে আইসোক্লিনিক (Isoclinic line) বলে। আবার ইহাও জানা আছে যে, যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে মুখ্য পীড়ন দিক কোন স্থির অক্ষের সহিত সমান কোণ সৃষ্টি

এবং সেই কোণকে আইসোক্লিনিকের প্যারামিটার (Parameter) বলে। বিভিন্ন আইসোক্লিনিকের প্যারামিটার হইতে সহজেই মুখ্য পীড়ন রেখা অঙ্কন করা যায়। বিভিন্ন প্যারামিটারের এর আইসো-ক্লিনিক রেখা পাইতে হইলে সমবর্তিত আপতিত তরঙ্গ তলের দিক পরিবর্তন করিয়া অর্থাৎ সমবর্তী-যন্ত্রের সমবর্তক-ছাকনীদ্বয়কে বিভিন্ন কোণে (প্রতি 10° অন্তর) স্থির রাখিয়া আইসোক্লিনিক রেখা-গুলির আলোকচিত্র অথবা লেখচিত্র লইতে হইবে এবং কোন একটি বিশেষ অক্ষের সহিত প্রথম সমবর্তক-ছাকনী যে কোণ সৃষ্টি করে, তাহাই ঐ পর্যায়ে সৃষ্ট আইসোক্লিনিকগুলির প্যারামিটার।

এতক্ষণ সমবর্তক-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার দ্বারা কি কি তথ্য কেমন করিয়া পাওয়া যায়—তাহা বর্ণনা করা হইল। এখন পরীক্ষা হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্তররেখা ও অন্যান্য রেখার আলোক চিত্র লইয়া এবং উহাদিগকে বিভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া নমুনার বিভিন্ন বিন্দুতে পীড়নের আনুমানিক পরিমাণ ও দিক সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে হইলে নিম্নোক্ত উপায়ে অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রথমতঃ আইসোক্লিনিক রেখা হইতে মুখ্য

ও চরম কৃন্তন রেখা অঙ্কন করিতে হইবে। পরে বৃত্তীয় সমবর্তী-যন্ত্র হইতে প্রাপ্ত একবর্ণী ও বহুবর্ণী স্তররেখাগুলির মান নির্ণয় করিতে হইবে এবং ইহা হইতে সীমান্ত পীড়ন রেখাগুলিও অঙ্কন করিতে হইবে। ইহার পর ভিন্ন ভিন্ন মূল পীড়ন দুইটিকে অঙ্ক কষিয়া অথবা অন্য কতকগুলি পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা হইলে ভিন্ন মূল পীড়নের সমরেখাগুলি অঙ্কন করা যাইবে এবং এই সকল তথ্য হইতে সঙ্কট অংশের (Critical section) পীড়ন ব্যাপ্তি (Stress distribution) নির্ণয় করা যাইবে ও প্রাপ্ত মূল পীড়নের মান ও দিক হইতে অভিলম্ব পীড়ন, স্পর্শক পীড়ন ও কৃন্তন পীড়ন (Respectively normal stress, tangential stress and shearing stress) সহজেই পাওয়া যাইবে।

আইসোক্লিনিক রেখা হইতে মূল পীড়ন রেখা অঙ্কন করিতে হইলে উপরের 2নং চিত্র দ্রষ্টব্য। I_1, I_2, I_3 আইসোক্লিনিকগুলির প্যারামিটার যথাক্রমে θ_1, θ_2, θ_3। এখন θ_1, θ_2 কোণে স্থির অক্ষের সহিত আনত রেখা দুইটিকে এমনভাবে অঙ্কন করিতে হইবে যে, উহারা যেন I_1 ও I_2 আইসোক্লিনিকদ্বয়ের মাঝামাঝি ছেদ করে এবং θ_3 কোণে আনত রেখাটিকেও একইভাবে I_2 ও I_3 মাঝামাঝি θ_2 কোণে আনত রেখার সহিত ছেদ করাইয়া অঙ্কন করিতে হইবে। এখন θ_1, θ_2, ও θ_3 কোণে আনত রেখাগুলির সহিত I_1, I_2, ও I_3 রেখাগুলির ছেদবিন্দুতে স্পর্শ করাইয়া মূল পীড়ন রেখা অঙ্কন করা যাইবে। স্তর রেখাগুলির মান নির্ণয় সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখন ভিন্ন মূল পীড়ন দুইটিকে আলাদাভাবে নির্ণয় করিতে পারিলেই মোটামুটি কোন অংশের পীড়ন সম্বন্ধে ধারণা করা যাইবে। σ_p ও σ_q নির্ণয় করিবার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে সহজ এবং নির্ভরযোগ্য একটি পরীক্ষা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

2নং চিত্র

সমবর্তী-যন্ত্রে অবস্থিত নমুনাটিকে σ_p পীড়নের সমান্তরাল কোন অক্ষের সহিত θ কোণে নত

করিলে নমুনার কার্যকর বেধের পরিবর্তন হয় এবং তাহার ফলে রেখা স্তরও পরিবর্তিত হইয়া যায়। এখন পরিবর্তিত রেখাক্রম ও পূর্বে প্রাপ্ত রেখাক্রম হইতে σ_p ও σ_q নিম্নলিখিত

$$n = \frac{(p_p - \sigma_q)\,d}{t} = \frac{\sigma_p d}{f} - \frac{\sigma_q d}{f}$$

$\frac{\sigma_p . d}{t} = n_1$ ও $\frac{\sigma_q . d}{f} = n_2$ ধরিলে $n =$
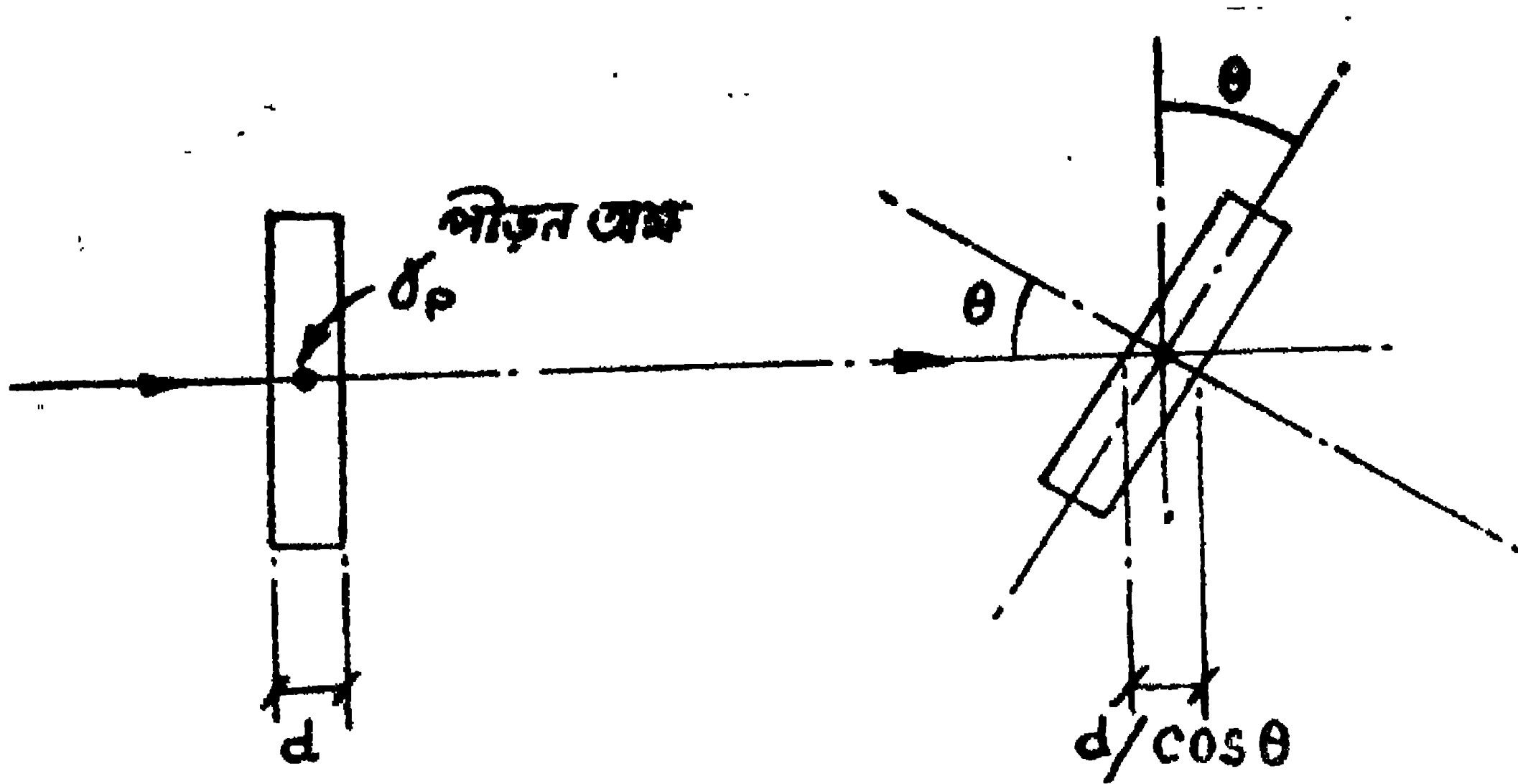
3নং চিত্র

উপায়ে নির্ণয় করিতে হয়। পূর্বোক্ত সমীকরণ অনুযায়ী আপেক্ষিক মন্দন,

$r = c(\sigma_p - \sigma_q)\,d$

এখন কোন স্তর রেখাক্রম n এবং এক ইঞ্চি বেধের নমুনার প্রথম স্তররেখা (First order fringe) সৃষ্টিকারী পীড়ন f হইলে ;

$n_1 - n_2$। এইবার σ_p পীড়নের সমান্তরাল অক্ষের সহিত নমুনাটিতে θ কোণে নত করিলে কার্যকর বেধের পরিমাণ $\frac{d}{\cos\theta}$ ও আপতিত রশ্মির লম্বতলে পীড়নদ্বয়ের পরিমাণ σ_p এবং $\sigma_q \cos^2\theta$ হইবে (3নং চিত্র)।

অতএব, এই পীড়ন ও কার্যকর বেধ অনুযায়ী স্তর রেখাক্রম

$$n\theta = \frac{\sigma_p - \sigma_q \cos^2\theta}{f} \cdot \frac{d}{\cos\theta}$$

σ_p ও σ_q-র মান উপরের সমীকরণে বসাইয়া পাওয়া যায়

$$n\theta = \frac{n_1 - n_2 \cos^2\theta}{\cos\theta} \quad \left[\sigma_p = \frac{n_1 f}{d}, \; \sigma_q = \frac{n_2 f}{d} \right]$$

আবার $n = n_1 - n_2$ বা $n_1 = n + n_2$

অতএব $n\theta = \frac{n + n_2 - n_2 \cos^2\theta}{\cos\theta}$

$n\theta \cos\theta - n = n_2(1 - \cos^2\theta)$

বা, $n_2 = \frac{n\theta \cos\theta - n}{1 - \cos^2\theta} = \frac{n\theta \cos\theta - n}{\sin^2\theta}$

$n_1 = n + \frac{n\theta \cos\theta + n}{\sin^2\theta}$

এখন n_1 ও n_2-এর মান বসাইয়া $\sigma_p = \frac{n_1 f}{d}$ ও $\sigma_q = \frac{n_2 f}{d}$ সমীকরণদ্বয় হইতে σ_p ও σ_q-এর মান সহজেই পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিটি ডি, সি, ড্রুকারের (D. C. Drucker) কৌণিক আপতন পদ্ধতি (Oblique incidence method) নামে পরিচিত। এখন প্রতি বিন্দুতে σ_p ও σ_q-এর মান অনুযায়ী উহাদের সমরেখা অঙ্কন করা যায় অথবা কোন সঙ্কট অংশের বিভিন্ন স্তর বিন্দুতে মুখ্য পীড়ন ও চরম কৃন্তন পীড়ন সহজেই নির্ণয় করা যায়।

এতক্ষণ সাধারণ ভাবে ফটোইলাষ্টিক বিশ্লেষণ বর্ণনা করা হইল। এই পরীক্ষা পদ্ধতি বিদেশে প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছে—বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানে ইহার দ্রুততার জন্য। ইহা এমন অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে, যাহার সমাধানের কোন সূত্র পূর্বে পাওয়া যায় নাই। আমেরিকার বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদেরা ইউরোপের দ্বাদশ/ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত বৃহৎ উচ্চতা-বিশিষ্ট গীর্জার বিভিন্ন অংশের উপর এই পরীক্ষা চালাইয়া বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যন্ত্রবিদ্যায়ও ইহার অবদান অপরিমিত। ভবিষ্যতে এই পরীক্ষা পদ্ধতি আরও উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যাবিষয়ক গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হইবে সন্দেহ নাই।

সঞ্চয়ন

বুধ ও শুক্রগ্রহের সন্ধানে

রাতের আকাশে মিট্ মিট্ করে জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র। সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহাদি সম্পর্কে নানা গবেষণার কাজে এই নক্ষত্র ও তারকারাজি এখন বিজ্ঞানীদের প্রভূত সাহায্য করছে। কয়েক বছর আগে পর্যন্তও পৃথিবীর বিবর্তন, পৃথিবীর সম্পদ ও সমস্যা, ভূমিকম্প, আবহাওয়া প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণার জন্যে সমুদ্র-বিজ্ঞানী, আবহবিদ ও ভূতাত্ত্বিকদের সরাসরি পৃথিবীর উপরই নির্ভর করতে হতো।

কিন্তু সম্প্রতি পৃথিবী সম্পর্কে গবেষণা এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এখন পৃথিবী সম্পর্কে গবেষণার কাজে পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে তুলনার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এমনিভাবে জন্ম নিয়েছে এক নতুন বিজ্ঞান। এর নাম তুলনামূলক গ্রহ-বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীদের গবেষণার সহায়তার জন্যে এদের সঙ্গে সম্প্রতি আরও দুটি গ্রহ যুক্ত হচ্ছে। এই দুটি হলো শুক্রগ্রহ ও বুধগ্রহ। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা 3রা নভেম্বর (1973) এই দুটি গ্রহ অভিমুখে একটি মেরিনার মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করছেন।

এই মেরিনার-10 মহাকাশযানটি এই সর্বপ্রথম একটি গ্রহের অভিকর্ষ শক্তির সাহায্য নিয়ে অপর একটি গ্রহাভিমুখে চালিত হবার পথ প্রস্তুত করে নেবে। শুক্রগ্রহের অভিকর্ষ মহাকাশ-যানটির গতিবেগ হ্রাস করবে এবং এর গতিপথ বুধের দিকে ঘুরিয়ে দেবে। মেরিনার-10 1974 সালের 5ই ফেব্রুয়ারী 5,000 কিলোমিটার (3,000 মাইল) উঁচু দিয়ে শুক্রগ্রহকে অতিক্রম করবে এবং সব দিক অনুকূল থাকলে 29শে মার্চ বুধের 1000 কিলোমিটার (600 মাইল) দূরত্বের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যাবে।

মেরিনার-10 মহাকাশযানের মধ্যে থাকছে দুটি টেলিভিশন ক্যামেরাসমেত 7টি বৈজ্ঞানিক

যন্ত্র। এগুলি গ্রহ দুটির 8 হাজার বা তারও বেশী আলোকচিত্র গ্রহণ করবে। টেলিভিশন ক্যামেরাগুলি দূরবীক্ষণ-যন্ত্র সমন্বিত। এর ফলে ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীরা বুধের পৃষ্ঠদেশের বৈশিষ্ট্য দেখতে পারবেন। এইভাবে বুধের পৃষ্ঠদেশের মানচিত্রও প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

অন্যান্য যে সকল যন্ত্রপাতি মেরিনারে রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গ্রহাদির নিকটবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্র ও প্লাজ্মা ক্ষেত্র পরিমাপক যন্ত্রগুলি। একটি ইনফ্রারেড রেডিওমিটার তাপমাত্রা পরিমাপ করবে এবং দুটি আলট্রাভায়োলেট যন্ত্র গ্রহ দুটির আবহমণ্ডলের খোঁজখবর নেবে। গ্রহ দুটির ভর, অভিকর্ষ, আভ্যন্তরীণ উপাদান এবং ঘনত্ব নির্ধারণের জন্যে বেতার ব্যবহার করা হবে।

শুক্র হলো পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। এর আয়তনও পৃথিবীর প্রায় সমান। শুক্র সম্পর্কে গ্রহ-বিজ্ঞানীদের তাই বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

শুক্রগ্রহ—শুক্র মেঘের ঘন আবরণে ঢাকা। ফলে এর পৃষ্ঠদেশ অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। এই মেঘের স্তরগুলি শুক্রপৃষ্ঠের 60 কিলোমিটার বা 36 মাইল ঊর্ধ্বে বিস্তৃত রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মেঘস্তরগুলি কিন্তু মাত্র 10 কিলোমিটার বা 6 মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। শুক্রের মেঘের উপাদান ও গতিবেগ রহস্যাবৃত। মেরিনার-10-এর যন্ত্রপাতিগুলি এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবে। ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে, শুক্রের মেঘের উপরের স্তরটি সর্বদাই এক কিলোমিটার পর্যন্ত উপরে ও নীচে চলাচল করে। শুক্রের মেঘের সর্বোচ্চ স্তর পৃথিবীর মেঘের সর্বোচ্চ স্তরের মতই ঠাণ্ডা। প্রায় শূন্য ডিগ্রীর নীচে 35 ডিগ্রী ফারেনহাইট এর তাপমাত্রা। কিন্তু শুক্রগ্রহে মেঘস্তর থেকে গ্রহের পৃষ্ঠদেশে তাপমাত্রা ক্রমেই বেড়ে গেছে। শুক্রপৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা হবে 800 ডিগ্রী ফারেনহাইট। এই প্রচণ্ড তাপে অধিকাংশ খনিজ পদার্থই গলে যায়। শুক্রপৃষ্ঠের আবহমণ্ডলের চাপ পৃথিবী অপেক্ষা শতাধিক গুণ বেশী।

শুক্র তার মেরুরেখার উপর প্রতি 243 দিনে একবার আবর্তিত হয় এবং প্রতি 225 দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু পৃথিবী যে দিকে ঘোরে—শুক্রের গতি তার বিপরীত দিকে। তাই শুক্রের একটি দিন পৃথিবীর 115 দিনের সমান।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলের সঙ্গে শুক্রের আবহমণ্ডলের কোন মিল নেই। শুক্রের আবহমণ্ডল শতকরা 90 ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড দিয়ে গঠিত। এতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের ভাগ খুবই কম। কিন্তু এই শেষোক্ত দুটিই পৃথিবীর আবহমণ্ডলের প্রধান উপাদান। শুক্রগ্রহে কিছু জলীয় বাষ্প আছে। জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার আর. আই. রসুল হিসাব করে দেখেছেন যে, শুক্রের আবহমণ্ডলে যত জলীয় বাষ্প আছে, তা একত্রিত করে জলে পরিণত করা হলে এবং সেই জল সমস্ত শুক্রপৃষ্ঠব্যাপী সমানভাবে প্রসারিত হলে যে সমুদ্র সৃষ্ট হবে, তার গভীরতা হবে মাত্র 10 সেন্টিমিটার। কিন্তু পৃথিবীর সমুদ্রগুলির জল যদি পৃথিবীপৃষ্ঠব্যাপী সমানভাবে প্রসারিত করা হয়, তাহলে তার গভীরতা হবে 3 কিলোমিটার। শুক্রের ঘন আবহমণ্ডল উত্তাপকে ধরে রাখে। ফলে শুক্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা শুক্রের মেঘের মধ্যে ছিদ্র পাবেন বলে আশা করছেন, যাতে এই সকল ছিদ্রপথের মধ্যে দিয়ে তাঁরা মেরিনার-10-এর ক্যামেরার সাহায্যে শুক্রপৃষ্ঠের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে পারবেন। তবে এর সম্ভাবনা যে খুব বেশী, তা নয়। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির ডক্টর ব্রুস মারে বলেন—শুক্রপৃষ্ঠ দেখতে পাওয়া গেলে তা একটা অলৌকিক ব্যাপার হবে।

পৃথিবী ও শুক্র—এই দুটি গ্রহের আয়তন ও ওজন প্রায় সমান। আদি সৌর নীহারিকায় প্রায় একই সময়ে অনুরূপ উপাদান থেকেই উভয়ের জন্ম। সূর্য থেকে দুয়েরই দূরত্ব প্রায় সমান। তবু এই দুটি কেমন করে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক গ্রহে পরিণত হলো? এসম্পর্কে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে, মেরিনার-10 অভিযানের ফলে হয় সেগুলি সমর্থিত হবে, নতুবা সেগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

বুধগ্রহ—বুধ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও অল্প। অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী রবার্ট জি. ষ্ট্রম বলেন—সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ প্লুটোর কথা বাদ দিলে সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম তথ্য জানা গেছে বুধ সম্পর্কে। মেরিনার-10 হলো প্রথম মহাকাশ যান, যা বুধে যাচ্ছে। আর এক কথা, ক্ষুদ্র আয়তন এবং সূর্যের অতি নিকটে অবস্থানের জন্যে বুধ সম্পর্কে পৃথিবী থেকে পর্যালোচনা চালানো কঠিন। বুধ হলো সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ। অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর যেখানে সবচেয়ে প্রশস্ত, সেখানে তার দৈর্ঘ্য যতখানি, বুধের ব্যাস তার চেয়ে বেশী নয়। ঘড়িতে একটা বাজলে তার কাঁটা দুটির মধ্যবর্তী কোণটি যত ডিগ্রীর হয়, বুধ ও সূর্যের মধ্যে অনুরূপ রেখাদ্বয় কল্পনা করে নিলে যে কোণ সৃষ্টি হবে, তা তার চেয়েও ছোট হবে। তীব্র সূর্যালোক সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা বুধগ্রহকে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরা খুব বেশী সফল হন নি। বুধের পৃষ্ঠদেশে ফোটা, কালো দাগ মাত্র দেখা গেছে।

তবুও বুধকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হলে সৌরজগতের অনেক রহস্যের কিনারা করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। বুধ ক্ষুদ্রতম গ্রহ হলেও এর ঘনত্ব সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী।

বুধ সম্পর্কে খুব কমই জানা আছে, সেটুকু জানা গেছে, তাও অতি সম্প্রতি। 1965 সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল সূর্যের কক্ষপথে বুধ যে বেগে ঘোরে—নিজের অক্ষরেখার চারদিকে সে সেই একই গতিবেগে ঘোরে, অর্থাৎ প্রতি 88 দিনে একবার। এথেকে মনে হয় চাঁদের মুখ পৃথিবীর দিকে যেভাবে রয়েছে—বুধের একটি দিকও সর্বদাই সূর্যের দিকে রয়েছে সেভাবেই। অবশেষে 1965 সালে মার্কিন বিজ্ঞানীরা রেডারের সাহায্যে এই তথ্য নির্ধারণে সক্ষম হলেন যে, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে বুধ প্রতি 58 দিনে একবার আবর্তিত হয়; অর্থাৎ সূর্যকে দু-বার প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করবার মধ্যে বুধ নিজের অক্ষরেখায় তিনবার আবর্তিত হয়।

এই ঘূর্ণাবর্তনের জন্যে বুধে দিনের তাপমাত্রা প্রায় 625 ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে এবং রাত্রে তাপমাত্রা নেমে আসে শূন্য ডিগ্রীর নীচে 250 ডিগ্রী ফারেনহাইটে।

বুধগ্রহের আবহমণ্ডল বা চৌম্বক ক্ষেত্র নেই এছাড়া সূর্যের সন্নিকটবর্তী এই বিস্ময়কর গ্রহটি সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই জানা নেই। আশা করা যাচ্ছে—মেরিনার-10-এর অভিযানে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটবে। মঙ্গল যেমন পৃথিবীর অনেক পরিচিত ও আপন হয়ে উঠেছে—মেরিনার অভিযানের দৌলতে বুধও অচিরেই সেই রকম পরিচিত হয়ে উঠবে বলে মনে হয়।

প্রাচীন গ্রীসের নগর-বিন্যাস

অবনীকুমার দে*

হিপোডেমাস্ (Hippodamus)

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে প্রাচীন গ্রীসের মাইলেটাস (Miletus) শহরে হিপোডেমাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন স্থপতি। ঐ শতকের পরবর্তীভাগে তিনি নগর-বিন্যাস প্রণালীর নতুন রীতি প্রচলন করেন। grid-iron বা chess-board বা দাবার ছক প্রণালীতে শহরের রাস্তাঘাটের বিন্যাস-রীতি তিনি সর্বত্রই উৎসাহের সঙ্গে কাজে লাগান। এই কথা ঠিক নয় যে, তিনিই সর্বপ্রথম এই ধরণের নগর-বিন্যাস প্রণালীর প্রচলন করেন। কারণ আরও প্রাচীনকালে মিশর, মেসোপোটামিয়া ও সিন্ধু উপত্যকায় নির্মিত নগরগুলি এই প্রণালীতে বিন্যস্ত ছিল। বিখ্যাত জ্যামিতিজ্ঞ পাইথাগোরাস-এর সুযোগ্য শিষ্য হিপোডেমাসকে প্রকৃতপক্ষে নগর-পরিকল্পনা বিদ্যার জনক বলা যায়। তাঁর পরিকল্পিত নগর এমনভাবে বিন্যস্ত ছিল, যাতে সব শ্রেণীর লোকই ভালভাবে তা ব্যবহার করতে পারতো। লোকজন এবং যানবাহন সব কিছুই ভালভাবে শহরের রাস্তাঘাট ব্যবহার করতে পারতো। চারপাশে রাস্তাঘেরা বাড়ীগুলি এমন ভাবে বিন্যস্ত ছিল, যাতে প্রচুর আলো-বাতাস বাড়ীতে প্রবেশ করে। উঁচু-নীচু পাহাড়ী জায়গায় অবস্থিত নগরগুলি সুকঠোরভাবে এই প্রণালীতে বিন্যস্ত হওয়ায় তাঁর পরিকল্পিত নগর-গুলিতে অনেকগুলি খুব খাড়াই রাস্তা থাকতো। সিঁড়ি বেয়ে এই সব রাস্তায় উঠতে হতো। তখন প্রায় সকলেই পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতেন বলে এর জন্যে কোন রকম অসুবিধা হতো না। নগরের মধ্যে যে কয়টি অল্পসংখ্যক ঘোড়ায় টানা শকট প্রবেশ করতো, তাদের ব্যবহারের জন্যে কয়েকটি প্রধান রাস্তা থাকতো।

শহরের আয়তন

হিপোডেমাসের মতে, নগরের লোকসংখ্যা দশহাজারের বেশী হবে না। হেলেনিক যুগের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধির সময় কেবলমাত্র তিনটি শহরের লোকসংখ্যা দশহাজারের বেশী ছিল। বেশীর ভাগ গ্রীক শহরই ছিল আয়তনে ছোট। এথেন্স শহর কিন্তু ছিল এর ব্যতিক্রম। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে এথেন্সবাসীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার আর ক্রীতদাস ও বিদেশীদের নিয়ে এই শহরের মোট জনসংখ্যা ছিল এক লাখ থেকে দেড় লাখ।

জনসাধারণের সমবেত হবার স্থান (Agora)

নগরের ব্যবসা-বাণিজ্যের রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল ছিল অ্যাগোরা (Agora) বা বাজার। এর চারদিকে ছিল ভাল ভাল দোকান ও বাজারের অস্থায়ী দোকানের সারি। প্রধান চত্বরের একেবারে লাগোয়াভাবে নয়, কিন্তু কাছেই ছিল সমবেত হবার হলঘর, মন্ত্রণা-সভার হলঘর ও কক্ষগুলি। নগরের মোটামুটি কেন্দ্রস্থলে থাকতো অ্যাগোরা। উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমমুখী প্রধান রাস্তা দুইটি অ্যাগোরার দিকে এসে এইখানে শেষ হয়ে যেত। অ্যাগোরা বর্গাকার বা আয়তাকার হতো। অ্যাগোরার মধ্যস্থিত খোলা চত্বরটি সমগ্র শহরের আয়তনের প্রায় শতকরা পাঁচ ভাগ জায়গা নিয়ে থাকতো। এইখানে দোকান বাজার

---

* স্থাপত্য এবং নগর ও অঞ্চল-পরিকল্পনা বিভাগ। বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর।

করতে বা এই সব বাড়ীতে সাধারণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যে সমস্ত নাগরিক এখানে আসতেন, তাঁদের সকলেরই জায়গা এইখানে হয়ে যেত। চত্বরের চারধারে থাকতো থামওয়ালা বারান্দা। এই বারান্দা থাকবার জন্যে চারপাশের বাড়ীগুলি রৌদ্রতাপ থেকে রক্ষা পেত।

প্রাচীন গ্রীক শহর আয়তনে ছোট হবার ফলে শহরবাসীরা পল্লী অঞ্চলের খুব কাছেই বাস করতেন। সেই জন্যে সহরে খুব বেশী সংখ্যক সাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট খোলা জায়গার দরকার হতো না। সাধারণের ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট বাড়ীগুলির চারপাশের চত্বরই ছিল সকলের ব্যবহারের জন্যে উন্মুক্ত স্থান। শহর প্রাচীরের বাইরে থাকতো অলিভ-কুঞ্জ, যেখানে ছিল দার্শনিকদের বিদ্যালয় (Academy)। এইখানেই তাঁরা ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। এই রকম এক বিদ্যালয় থেকেই পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়—আলেকজান্দ্রিয়ার Museum গড়ে উঠেছিল।

মাইলেটাস, অলিন্থাস, সেলিনাস, এথেন্স প্রভৃতি ছিল প্রাচীন গ্রীসের হেলেনিক যুগের কয়েকটি প্রধান নগর।

মাইলেটাস (Miletus)

হেলেনিক যুগের নগর মাইলেটাস ছিল আইওনীয় জাতি-সংঘের সর্বপ্রধান শহর। খৃষ্টপূর্ব দশম ও ষষ্ঠ শতকের মধ্যে এর সমকক্ষ আর কোন শহর ছিল না। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে শহরটি আড়ম্বর ও শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে উঠেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, কৃষ্টি সবকিছুতেই সকলের অগ্রণী ছিল এই শহরটি। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে আইওনীয়া পারস্যের ক্ষমতাধীন হলো। মাইলেটাস প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে শহরটিকে আবার তৈরী করা হলো। Hippodamus-এর রীতিতে বিন্যস্ত এই শহরটি বোধ হয় সর্বপ্রথম শহর যেখানে তাঁর দাবার ছকের অনুযায়ী বিন্যস্ত রাস্তাঘাট দেখা যায়।

প্রাচীরের ভিতর শহরটি আয়তন ছিল 220 একর (Acre)। অ্যাগোরা অঞ্চল শহরের দুইটি প্রধান অংশকে ভাগ করে রেখেছিল। অ্যাগোরার কাছাকাছি ছিল ষ্টোয়া (Stoa), থিয়েটার, স্টেডিয়াম ইত্যাদি। এই অঞ্চলের কাছেই ও উত্তর-পূর্বদিকে ছিল বন্দর।

অলিন্থাস (Olynthus)

প্রাচীন গ্রীসের থ্রেস অঞ্চলে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষের দিকের ও চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকের নগর-বিন্যাসের নিদর্শন হলো অলিন্থাস শহর। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য থেকে এখানে দুইটি নগরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পুরাতন নগরের কিছু অংশ খুঁড়ে বের করে দেখা গেছে যে, নগরের রাস্তাঘাট অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত ছিল। এখানে ছিল অ্যাগোরা ও সাধারণের সমবেত হবার স্থান। পুরাতন বাসগৃহগুলি ছিল আকারে ছোট ও অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষ চতুর্থাংশে গ্রীক 'polis' হিসাবে শহরটি যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করে। খুব সম্ভব পরবর্তীকালে হিপোডেমীয় রীতিতে নতুন করে নগর-বিন্যাস করা হয়। নতুন অ্যাগোরা তৈরী হয়। উত্তর-দক্ষিণমুখী প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিকে 300 ফুট ব্যবধানে বিন্যস্ত করা হয়। এই প্রধান রাস্তাগুলির আলম্ব ও পরস্পর সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তাগুলি ছিল পূব-পশ্চিমমুখী এবং 129 ফুট অন্তর অন্তর অবস্থিত। 348 খৃষ্ট-পূর্বাব্দে ম্যাসিডনের ফিলিপ শহরটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। এরপর শহরটি আর প্রাধান্য লাভ করে নি।

শহরের প্রধান দোকান বাজার ছিল অ্যাগোরাতে। কোন কোন বাড়ীতে রাস্তার ধারে ছোট দোকানঘর থাকতো। হয়তো এগুলি ছিল ছোট ছোট নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের

দোকান এবং কারিগরদের কাজ করবার জায়গা।

প্রধান প্রধান চারটি রাস্তা যেমন এক একটি অংশে থাকতো দশটি করে বাড়ী। পূর্ব-পশ্চিম-মুখী প্রায় ষোল ফুট চওড়া ছুটি রাস্তার ধারে থাকতো পর পর অবস্থিত পাঁচটি করে একটির পিছনে আর একটি করে অবস্থিত দশটি বাড়ী। এই ছোট রাস্তাগুলি পূর্ব ও পশ্চিমদিকে গিয়ে পড়েছিল উত্তর-দক্ষিণমুখী অপেক্ষাকৃত চওড়া ছুটি প্রধান রাস্তায়। এই ছুই সারি বাড়ীর মধ্যেও পিছনদিক বরাবর ছিল সরু, ময়লা-নিষ্কাশনের জন্যে গলি। শহরের রাস্তাঘাট ও বাড়ীগুলি এই একই রকম ভাবে বিন্যস্ত ছিল। শহরের বাড়ীগুলিও প্রায় একই রকমভাবে পরিকল্পিত ছিল। ষাট ফুট × ষাট ফুট আয়তনের বাড়ীগুলি ছিল দোতলা। কোন কোন বাড়ীতে স্নানঘর ছিল। বাড়ীর দেয়াল ইঁটের ও ছাদ টালীর তৈরী ছিল। থাম ও অন্যান্য ঠেকান কাঠ দিয়ে তৈরী হতো।

সেলিনাস (Selinus)

সিসিলি দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ও সমুদ্র-তীরে অবস্থিত এবং খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের প্রায় গোড়ার দিকে নির্মিত সেলিনাস ছিল একটি গ্রীক ঔপনিবেশিক শহর। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষের দিকে কার্থেজের নিকট শহরটি বিনষ্ট হয়। এই শতকেরই শহরটি আবার তৈরী করা হয়। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি কার্থেজ কর্তৃক শহরটি আবার বিনষ্ট হয় ও সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই শহরের প্রাচীন অংশটি ছিল সমুদ্রের ধারেই। পরে বসবাসের জন্যে এই প্রাচীন অংশের উত্তর-দিকে শহরটিকে সম্প্রসারিত করা হয়। সমুদ্রের দিকের অংশটির নাম ছিল অ্যাক্রোপোলিস (Acropolis)। প্রায় 23 ফুট চওড়া ও শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রাস্তা এবং তার আড়াআড়ি-ভাবে বিন্যস্ত ছুটি প্রধান রাস্তার সংযোগস্থলে ছিল অ্যাগোরা ও মন্দির। এই শহরের রাস্তাঘাট দাবার-ছক আকৃতিতে বিন্যস্ত ছিল না বরং ছিল ঋজুরৈখিক। শহরের লোকসংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার এবং নগর-বিন্যাস ও গৃহাদির স্থাপত্য ছিল খুব উন্নত মানের।

এথেন্স

গোড়ার দিকে এথেন্স শহরের রাস্তাঘাট ছিল সরু ও আঁকা-বাঁকা। রাস্তাঘাট বাঁধানো ছিল না এবং রাত্রে রাস্তায় আলো দেবার বন্দোবস্ত ছিল না। শহরে জলসরবরাহ ও ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হতো না। বাড়ীর ময়লা আবর্জনা রাস্তার উপর ফেলে রাখা হতো। পরে পেরিক্লিস-এর স্বর্ণযুগে অতি সুন্দর অ্যাক্রোপোলিশ, অ্যাগোরা, মন্দির, জিমনাসিয়াম ইত্যাদি তৈরী করা হয়। কিন্তু সাধারণ বাসগৃহ নির্মাণের কোন উন্নতি হয় না।

অ্যাক্রোপোলিশ পাহাড়ের দৈর্ঘ্য ছিল পূর্ব-পশ্চিম বরাবর। পাহাড়ের দক্ষিণদিকে নীচে ছিল পবিত্র স্থানগুলি। থামওয়ালা লম্বা বারান্দার শেষে পূর্বদিকে ছিল Bacchus-এর থিয়েটার এবং পশ্চিমদিকে ছিল Odeon বা কনসার্ট হল। উত্তর দিকে ছিল অ্যাগোরা, বাজার ও পৌর সৌধ-গুলি। অ্যাগোরার চারদিকে ছিল জনসাধারণের ব্যবহারের সৌধগুলি। পশ্চিম দিকে ছিল পৌর-মন্ত্রণা পরিষদের গৃহগুলি, একটি মন্দির ও Zeus-এর স্টোয়া, যেখানে সক্রেটিস ও তাঁর শিষ্য ও অনুচরবর্গ প্রায়ই মিলিত হতেন। পূর্ব আর দক্ষিণ দিকে ছিল থামওয়ালা সুদীর্ঘ স্টোয়া। এটাই ছিল আসল বাজার। এই স্থানটি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ছিল Ares-এর মন্দির। পাহাড়ের উপর ছিল বিখ্যাত পার্থিনন—447 থেকে 434 খৃষ্ট-পূর্বাব্দে নির্মিত দেবী এথেনার মন্দির।

বেশীরভাগ প্রাচীন গ্রীক শহর আয়তনে ছোট

হলেও এথেন্স ছিল এর ব্যতিক্রম। এক সময় এথেন্সের লোকসংখ্যা নাকি তিন লক্ষতে পৌঁচেছিল।

ডিলস

ডিলস (Délos) শহরটি সরল জ্যামিতিক আকারে বিন্যস্ত ছিল। এই দ্বীপটির অ্যাগোরাগুলির কিছু অংশ খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে এবং কিছু অংশ 417 থেকে 314 খৃষ্ট-পূর্বাব্দে তৈরী হয়েছিল। অবশিষ্ট অংশ আরও পরবর্তী কালের তৈরী। উপসাগরের মুখে অবস্থিত শহরের কেন্দ্রস্থলে ছিল অ্যাগোরা ও মন্দিরগুলি। মন্দির ও অন্যান্য ইমারতগুলি ছিল সমুদ্রের দিকে এবং সেগুলির নিজ নিজ সংলগ্ন ও উন্মুক্ত চত্বরগুলি ছিল ভিতরের দিকে। এই অঞ্চল থেকে একটি প্রধান রাস্তা সাধারণের বসতি অঞ্চল ছাড়িয়ে শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে অবস্থিত পাহাড়ের গায়ে নির্মিত থিয়েটার পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। এখান থেকে রাস্তাটি আরও অগ্রসর হয়ে উঁচুতে উঠে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়েছিল। দ্বীপের অপর দিকে ছিল স্টেডিয়াম এবং যথারীতি জ্যামিতিক আকারে বিন্যস্ত খেলাধূলা করবার জায়গা।

হেলেনিস্টিক শহর

650 থেকে 323 খৃষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত হেলেনিক যুগ ধরা হয় আর 323 থেকে 30 খৃষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত হলো হেলেনিস্টিক যুগ। এই পরবর্তী সময়কে ম্যাসিডোনীয় যুগও বলা হয়। এই সময়ের নির্মিত শহর হলো প্রিয়েন ও আলেকজান্দ্রিয়া।

খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীসবাসীরা শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব বিষয়ে ক্রমশঃই বেশী উদাসীন হয়ে উঠতে থাকে। তারা মনে করতে লাগলো যে, নিজেদের খুশীমত কাজ তারা করতে পারে। ধনীরা অধিকাংশ সময় তাঁদের পল্লীগৃহে কাটাতে লাগলেন। সাধারণ লোককে জীবিকার্জন করতে খুবই কষ্ট করতে হতো। সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় লোপ পেয়ে যেতে লাগলো। ধনী ও গরীব লোকের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বাড়তে থাকে।

Peloponnesian যুদ্ধের ফলে এথেন্সের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়লো। সহজেই আক্রমণকারীর কাছে পরাস্ত হলো এথেন্স। আলেকজান্দার দি গ্রেট-এর ম্যাসিডোনীয় সৈন্যদল জয় করলো এথেন্স। কিন্তু পরাজিত হওয়া সত্বেও তারা নিজেদের কৃষ্টি বজায় রেখে চললো। বিজেতাদের তুলনায় তাদের নিজস্ব কৃষ্টি বরং বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভূমধ্যসাগরের সমস্ত তীরবর্তী অঞ্চলে গ্রীক প্রভাব বিস্তার করলো। হেলেনিস্টিক যুগে নতুন ধরণের নগর-বিন্যাস রীতিমত প্রচলিত হলো।

পারগামন, আলেকজান্দ্রিয়া সাইরাকিউস, কান্দাহার প্রভৃতি শহরগুলি আয়তনে আরও বড় ও বেশী জনবহুল হয়ে উঠলো। শহরগুলি বিলাসের ক্ষেত্র হয়ে উঠলো। Odeion, কোষাগার, লাইব্রেরী, কয়েদখানা ও অন্যান্য জাঁকজমকপূর্ণ জনসাধারণের সৌধগুলি অ্যাগোরার সঙ্গে যুক্ত হলো। আমোদ-প্রমোদ ও উৎসবাদির জন্যে স্নানাগার, স্টেডিয়াম, Paloestrac ইত্যাদি তৈরী হলো। প্রাচ্য দেশগুলির অনুকরণে বাগান ও পার্ক তৈরী করা হলো। রাজারা সুন্দর সুন্দর সৌধ তৈরী করলেন। রাজা ও ধনীরা তাঁদের উপহার ও দান হিসাবে শহরে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী করে দিলেন। ক্রমে ক্রমে বর্ণ-বিভাগ গড়ে উঠলো। ক্রমে খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতকে বিশুদ্ধ হেলেনিস্টিক প্রথায় শহর-বিন্যাস রীতির ক্রমশঃ অধোগতি হলো।

প্রিয়েন

খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রথম তৈরী এই প্রিয়েন

(Priene) শহর আইয়োনিয়ার সমুদ্রোপকূলে পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকের সন্ধিকালে শহরটিকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। দুর্গসমেত সারা শহটির চারদিকে মজবুত ভাবে তৈরী প্রাচীরঘেরা ছিল। প্রাচীরের মধ্যে ছিল তিনটি প্রধান প্রবেশদ্বার। প্রাচীরের মধ্যে মাঝে মাঝে ছিল বুরুজ।

হেলেনিক যুগের শেষের দিকে হিপোডেমীয় রীতি অনুসারে শহর-বিন্যাস করা হয়েছিল। শহরের রাস্তাঘাট আয়তাকারভাবে বিন্যস্ত ছিল। রাস্তাগুলি 11 ফুট থেকে 22 ফুট পর্যন্ত চওড়া ছিল। রাস্তার মাঝে মাঝে দেয়ালে গাঁথা জলের ফোয়ারা ছিল। পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন উচ্চতার ধাপে ধাপে শহর গড়া হয়েছিল। এর ফলে কিছু রাস্তা ছিল খুব খাড়াই। এই রাস্তা-গুলির অনেক স্থানেই সিঁড়ি ছিল, তা না হলে এত খাড়াই রাস্তায় ওঠা-নামা করা কষ্টকর হতো। শহরের প্রধান রাস্তাগুলি শহরের প্রধান প্রবেশদ্বার-গুলিকে অ্যাগোরার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। এই রাস্তাগুলি বেশী খাড়াই ছিল না বরং এমন ঢালে বিন্যস্ত ছিল, যাতে ভারবাহী পশু ও শকটাদি সহজেই চলাচল করতে পারতো।

শহরের সবচেয়ে উঁচু জায়গা ও ভৌগোলিক কেন্দ্রে ছিল অ্যাগোরা। আগোরার চত্বর ছিল দৈর্ঘ্যে 230 ফুট ও প্রস্থে 120 ফুট। সুসমঞ্জসভাবে বিন্যস্ত অ্যাগোরার চারধারে ছিল জনসাধারণের জন্যে বাড়ীগুলি, মন্দির, দোকান ও বাজার। জিমনাসিয়াম, স্টেডিয়াম, থিয়েটার, পৌর মন্ত্রণা পরিষদের সভাকক্ষ, পরিষদ সদস্যদের নিজস্ব কক্ষগুলি, ছাদবিহীন সাধারণের জমায়েত হবার হলঘর ইত্যাদি জনসাধারণের ব্যবহারের বাড়ী-গুলি অ্যাগোরার চারদিকে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিন্যস্ত ছিল। অ্যাগোরা থেকে সহজেই এই বাড়ীগুলিতে প্রবেশ করা যেত। এগুলি কিন্তু বাজারের একবারে গায়ে লাগানো ছিল না। বাজারে কেবলমাত্র পথচারীরাই চলাফেরা করতে পারতেন। বাজারের বাইরের দিকে চারপাশে আলাদা রাস্তা ছিল। এই রাস্তা থেকে দোকানে মালপত্র আনা-নেওয়া করা হতো।

প্রিয়েন শহরের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। পাহাড় থেকে পানীয় জল শহরে বয়ে নিয়ে আসবার সুবন্দোবস্ত ছিল। শহরের ময়লা জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাও বেশ ভাল ছিল। বাড়ী-গুলি সাধারণতঃ ছিল দোতলা।

শহরের দক্ষিণদিকে সমুদ্রের ধারে অপেক্ষাকৃত বড় আর একটি ব্যায়ামাগার ও স্টেডিয়াম ছিল। শহর থেকে কিছু দূরে আরও উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছিল অ্যাক্রোপোলিশ। উঁচুতে অবস্থিত হওয়ায় এটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো এবং এখান থেকে চারদিক বেশ ভালভাবে দেখতে পাওয়া যেত।

আলেকজান্দ্রিয়া

নীলনদের ব-দ্বীপের কাছে নিজের নামানু-সারে আলেকজান্দার এই শহরের পত্তন করেন। এই শহরটি ছিল সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র। ডিনোক্রেটিস নামে একজন স্থপতি ও নগর-বিন্যাসকার এই শহরের পরিকল্পনা করেন এবং এর নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধানের জন্যে নিযুক্ত হন।

প্রাচীরঘেরা শহরটি দাবার ছকের আকৃতিতে সুসমঞ্জসভাবে বিন্যস্ত ছিল। নদীর ধারে ছিল ফোরাম, যেখানে ছিল রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি রাজকীয় সৌধ, মন্দির, নাট্যশালা, ব্যায়ামাগার, পাঠাগার ইত্যাদি। শহরের কেন্দ্রস্থল দিয়ে চলে গিয়েছিল পূর্ব-পশ্চিমমুখী প্রধান রাস্তা। শহর প্রাচীরের বাইরে ছিল স্টেডিয়াম। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেও নদীর বাঁকের কাছে ছিল বিরাট পাঠাগার। সেই সময়ে এই পাঠাগার ছিল পাণ্ডুলিপির সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা। নদীর

ধারে ছিল একটি মাত্র পাথর থেকে খোদাই করা সরু থামের মত Obelisk—নাম 'ক্লিওপাট্রার ছুঁচ' (Needle)। দ্বীপের পূর্ব প্রান্তে ছিল 400 ফুট উঁচু বুরুজাকৃতি ফ্যারাওয়ের লাইটহাউস। শহরটির আয়তন ছিল প্রায় 2200 একর এবং লোকসংখ্যা ছিল তিন লক্ষ বা তারও বেশী।

আলেকজান্দ্রিয়া ছিল একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। খৃষ্টাব্দের চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে শহরটির প্রাধান্য কমে যায় এবং খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতকে কায়রো শহর প্রধান হয়ে উঠে এর স্থান অধিকার করে।

আলেকজাণ্ডারের শক্তিশালী রাজতন্ত্রের অধীনে হেলেনিস্টিক যুগের শহরগুলি খুবই ঐশ্বর্যশালী ও জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সম্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিরা শহরের উন্নতির জন্যে যথেষ্ট অর্থ দান করতেন। এই রাজত্বের ফলে সাধারণের নিজেদের থেকে কাজ করবার ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল এবং সমাজের শক্তিও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর রাজত্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ভাঙন ধরলো। 323 খৃষ্ট-পূর্বাব্দে ব্যাবিলনে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয় এবং এর পর তাঁর সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

কৃষি-সংবাদ

পুষ্টিকর খাদ্য সয়াবীন

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের শঙ্কর শরণ সাকসেনা ও গুরুপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এই বিষয়ে লিখেছেন—সয়াবীনের চাষ চীন, জাপান ও আমেরিকায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আমেরিকাতে এটি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রধান উৎস। ভারতবর্ষে এতদিন কাশ্মীর ও নাগাল্যাণ্ডের উত্তর ভাগের পাহাড়ী অঞ্চলে সয়াবীনের চাষ করা হতো। পুষ্টিগুণের জন্যে গত কয়েক বছর ধরে বিস্তৃত সমতল ভূমিতে সয়াবীনের চাষ করবার চেষ্টা হচ্ছে। 1958 সালের একটি হিসাব থেকে দেখা গেছে, ভারতে প্রায় 43,000 একর জমিতে এই ফসলের চাষ হয় এবং তাথেকে প্রায় 6,000 টন ফসল পাওয়া যায়।

ভারতের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র ও নিরামিষাশী এবং খাদ্যে প্রোটিনের জন্যে তারা প্রধানতঃ ডালের উপর নির্ভর করেন। অড়হর, ছোলা, মুগ, কলাই এবং মসুর—প্রধানতঃ এই কয়েকটি ডাল খাদ্যে ব্যবহার করা হয়। সয়াবীনও এগুলির মত একটি ডাল—কিন্তু এগুলির তুলনায় আরও বেশী পুষ্টিকর। বিভিন্ন ডালের পুষ্টিগুণ 2 নং তালিকায় দেওয়া হলো।

এই তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সয়াবীনে প্রোটিনের মাত্রা অন্যান্য ডালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেশী। তাছাড়া এতে প্রায় শতকরা 20 ভাগের মত স্নেহজাতীয় উপাদান আছে, যা অন্যান্য ডালে প্রায় নেই বললেই চলে। সয়াবীনই একমাত্র ডাল, যাতে প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় উপাদান দুটি পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। ফলন হিসাবে প্রতি হেক্টরে প্রায় 15 কুইন্টালের মত সয়াবীন পাওয়া যায় আর তাথেকে প্রায় 645 কিলোগ্রাম প্রোটিন ও 285 কিলোগ্রাম স্নেহজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। খনিজ লবণ ও খাদ্যপ্রাণের পরিমাণও এতে অন্য ডালগুলির তুলনায় বেশী। অন্যান্য ডালের ক্যালোরি মাত্রা যেখানে 350, সয়াবীনের ক্যালোরি মাত্রা সেখানে প্রায় 450। কাজেই সব দিক দিয়ে সয়াবীনকে অন্য সব ডালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে এটি স্থান পায় নি। তার প্রথম কারণ এর পুষ্টিগুণের কথা অনেকেই জানেন না। দ্বিতীয়তঃ এটির চাষ খুব বেশী পরিমাণে করা হয় না এবং তৃতীয় কারণটি হলো সয়াবীনের দানার অপ্রীতিকর গন্ধ। এখন অবশ্য পুষ্টিগুণের জন্যে এর চাষের পরিমাণ ক্রমে বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। রান্নার বিভিন্ন কৌশলে সয়াবীনের দানার বুনো গন্ধও দূর করা যেতে পারে।

সয়াবীনের পুষ্টিকর দানা থেকে বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্য তৈরী করা যেতে পারে। রান্নার প্রক্রিয়ায় এর অপ্রিয় গন্ধও আর থাকে না। সয়াবীন থেকে ডাল ও ঘুগ্‌নি ছাড়া পকোড়া, দইবড়া, কচুরী এবং দুধ, দই, ছানা, মিষ্টি সবই তৈরী করা যেতে পারে। সয়াবীন থেকে বিশেষ কৌশলে আটা ও দুধ তৈরী করা হয়। তারপর সেই আটা ও দুধ থেকে সাধারণ আটা ও দুধের মতই নানা ধরণের খাবার করা যায়।

সয়াবীনের আটা—আটা তৈরী করতে হলে প্রথমে সয়াবীনের দানা 5 ঘন্টা পর্যন্ত জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর ফুলে ওঠা দানাগুলি থেকে রগড়ে খোসা তুলে ফেলতে হয়। এরপর দানাগুলি কিছুক্ষণ জলে ফুটিয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। এই শুক্‌নো দানা গমের মতই পিষে আটা তৈরী করা হয়।

সয়াবীনের দুধ—দুধ তৈরীর জন্যেও সয়াবীনের দানা প্রথমে 5-6 ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর দানা থেকে খোসা আলাদা করে মিহি করে পিষে নেওয়া হয়। এরপর সেই পেষা সয়াবীনে কিছুটা ফুটন্ত জল মিশিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয় এবং তাতে আবার পরিমাণমত জল দিয়ে ফোটানো হয়। ফোটাবার সময় সামান্য এলাচগুঁড়া দেওয়া হয়। এই সয়াবীনের দুধ খুবই পুষ্টিকর। গরুর দুধের পুষ্টিগুণের সঙ্গে এর অল্পই তারতম্য আছে। সয়াবীনের দুধ ও গরুর দুধের রাসায়নিক গঠন 1 নং তালিকায় দেওয়া হলো।

1নং তালিকা

সয়াবীন ও গরম দুধের রাসায়নিক গঠন প্রতি 100 গ্র্যামে

	সয়াবীনের দুধ	গরম দুধ
প্রোটিন (গ্র্যাম)	2.4	3.2
স্নেহজাতীয় পদার্থ (গ্র্যাম)	2.5	4.9
কার্বোহাইড্রেট (গ্র্যাম)	3.2	4.6
চুন (গ্র্যাম)	0.08	0.11
ফস্‌ফরাস (গ্র্যাম)	0.104	0.07
লোহা (মিলিগ্র্যাম)	1.2	0.2
থায়ামিন (মিলিগ্র্যাম)	0.042	0.015
রিবোফ্লেবিন (মিলিগ্র্যাম)	0.04	0.17
নিকোটিনিক অ্যাসিড	0.024	0.1

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সয়াবীনের দুধও প্রায় গরুর দুধের মতই পুষ্টিকর। আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় দুধের উৎপাদন খুবই কম। ফলে দেশের লোকেরা, বিশেষ করে শিশুরা পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পায় না। সয়াবীনের দুধ গরুর দুধের বিকল্প হিসাবে অনায়াসেই খাওয়ানো চলতে পারে। কাজেই এই পুষ্টিকর ফসলটির চাষ আরও অনেক বিস্তৃত ভাবে করা ও দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে এর প্রচলন করা সব দিক থেকেই বিশেষ লাভজনক।

2 নং তালিকা

বিভিন্ন ডালের পুষ্টিকর উপাদানের শতকরা ভাগ

পুষ্টিকর উপাদান ডালের নাম	প্রোটিন	স্নেহ পদার্থ	খনিজ পদার্থ	ফাইবার বা আঁশ	কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা	চুন	ফসফরাস	লোহা	খাদ্যপ্রাণ 'এ' (আই ইউ প্রতি 100 গ্রাম)	খাদ্যপ্রাণ 'বি'2 (মিলিগ্রাম প্রতি 100 গ্রাম)	রিবোফ্লেবিন (মিলিগ্রাম 100 গ্রাম)	ক্যালোরি মূল্য (প্রতি 100 গ্রাম)
অড়হর	22·3	1·7	3·6	—	60·2	0·14	0·26	8·8	220	0·45	0·22	345
মুগ	14·0	1·3	3·6	—	60·7	0·14	0·28	8·4	158	0·46	0·26	350
কলাই	24·0	1·4	3·4	—	60·3	0·20	0·37	6·8	64	0·45	0·22	350
লোবিয়া	24·6	0·7	3·2	3·8	55·7	0·07	0·49	3·8	60	0·50	0·21	327
ছোলা	17·1	5·3	2·7	3·9	61·2	0·19	0·24	9·8	120	0·45	0·21	361
মটর	23·8	1·4	—	4·5	60·2	—	—	—	—	—	—	348
মসুর	25·0	1·0	—	—	59·5	—	—	—	—	—	—	347
সয়াবীন	43·2	19·5	4·6	3·7	20·9	0·24	0·69	11·3	310	0·73	0·32	432

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, কৃষি ভবন, নতুন দিল্লী।]

নাগপুরে বিজ্ঞান কংগ্রেসের 61তম অধিবেশন

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

প্রতি বছরের মত এই বছর (1974) জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 61তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো নাগপুরে। এর আগে 1945 সালে নাগপুরে আর একবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। সেদিন নাগপুর ছিল মধ্যপ্রদেশের রাজধানী, আর এখন নাগপুর মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের আসর বসেছিল নাগপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ নগরে। 3রা জানুয়ারী সকালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি দেশের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের পরস্পর সহযোগী হয়ে জাতীয় উদ্যোগসমূহের সকল ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কোন আলাদা আলাদা ক্ষেত্র হতে পারে না। উভয়ের সহযোগিতাই প্রগতির উপকরণস্বরূপ। স্বয়ম্ভরতার জন্যে যে সব মৌলিক বিষয়কে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, তা হলো কৃষি, ভারী শিল্প, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। এই সব কাজের দ্বারা আমাদের জনসাধারণের খাদ্য, জল, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। আমাদের দেশের শতকরা 80 ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। জাতীয় আয়ের শতকরা 70 ভাগ অর্জিত হয় কৃষি থেকে। অথচ নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা কৃষির কিছু অংশ ছাড়া সমগ্র ক্ষেত্রটি লাভবান হতে পারে নি। এখন সর্বস্তরে এই কাজটি সুরু করতে হবে।

তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহরের চেয়ে সরল জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে বলে গ্রামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কাজ নীচু পর্যায়ে করাই যথেষ্ট—এই কথা ঠিক নয়। গ্রামেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কাজ সমানভাবে করতে হবে।

এবারের অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রতনশঙ্কর মিশ্র। তিনি তাঁর ভাষণে বিশ্লেষণ ও যুক্তির সাহায্যে গণিতশাস্ত্রের বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকার কথা আলোচনা করেন। তিনি বলেন, অনেকেই বলে থাকেন বিশুদ্ধ গণিত পড়ে কি হবে? কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিতের মধ্যে সত্যই কোন ব্যবধান নেই। পাশ্চাত্ত্য যে কোন দেশের গণিতের পাঠক্রমের সঙ্গে আমাদের গণিতের পাঠক্রমের পার্থক্য তেমন একটা কিছু নেই। যেটা দরকার—সেটা হলো সুষ্ঠু গঠন ব্যবস্থা। এই ব্যাপারে আমরা ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছি। সমাজ-বিজ্ঞান থেকে সুরু করে পরিবেশ দূষিতকরণ সংক্রান্ত গবেষণা, সর্বত্রই গণিতের সাহায্য আমাদের চাই। এর জন্যে সামগ্রিক গঠন ব্যবস্থার প্রয়োজন।

ট্রেন ও আন্তর্দেশীয় বিমান চলাচল ব্যবস্থার বিপর্যয়ের দরুন এবার প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল বেশ কম, প্রায় এক হাজার। বিদেশ থেকেও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা অন্যান্য বারের তুলনায় কম এসেছিলেন। ইরাক, ইরান, জাপান, বাংলাদেশ, হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মেনী, যুক্তরাজ্য, যুগোস্লাভিয়া ও সোভিয়েট রাশিয়া থেকে সতেরো আঠারো জন

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, কলিকাতা-29

বিজ্ঞানী এবারের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের তেরটি শাখার সভাপতিরূপে গণিত শাখায় অধ্যাপক আর. এস. কুশওহা 'নক্ষত্রের বিবর্তন', রসায়ন শাখায় অধ্যাপক বরুণচন্দ্র হালদার 'তেজস্ক্রিয় সংশ্লেষণ ও তার প্রয়োগ', পদার্থবিদ্যা শাখায় অধ্যাপক এস. এস. কোঠারী 'কঠিন পদার্থের সঙ্গে মৃদুগতি নিউট্রনের ক্রিয়া', পরিসংখ্যান শাখায় অধ্যাপক টি. ভি. আবদানী 'স্টোচাস্টিক প্রক্রিয়া', উদ্ভিদবিদ্যা শাখায় অধ্যাপক আর. এস. সিং 'অ্যালজির জীবনধারা', প্রাণীবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখায় ডক্টর এইচ. এম. চৌধুরী 'কীট ও অন্যান্য প্রাণীর নির্বীজন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ', ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখায় শ্রীমুক্তিনাথ 'ফসফরাইট', নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখায় অধ্যাপক এস. আর. কে. চোপরা 'শিবালিক সম্পর্কে সাম্প্রতিক অনুসন্ধান', ভেষজ ও পশুচিকিৎসা শাখায় ডাঃ বি. আর. সেনগুপ্ত 'বহুমূত্র রোগে গ্লুকোজ বিপাক', কৃষি-বিজ্ঞান শাখায় ডক্টর বি. চৌধুরী 'ভারতে শাকশব্জি সংক্রান্ত সমস্যা', মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখায় এইচ. এম. আস্থানা 'ঘটনাবলী পরম্পরা পন্থার স্বপক্ষে', যন্ত্র-বিজ্ঞান ও ধাতুবিদ্যা শাখায় শ্রীজীবন দত্ত 'জাতীয় উন্নয়নে যন্ত্রবিদ্‌দের ভূমিকা' এবং শারীরবিদ্যা শাখায় ডক্টর অজিতকুমার মাইতি 'মুর্গীরোগ সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণা' বিষয়ে আলোচনা করেন।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এবারের অধিবেশনেও বিভিন্ন শাখায় বিশেষ বক্তৃতা, আলোচনা-চক্র এবং লোকরঞ্জক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অশীতিতম জন্মবার্ষিকী ও বোস সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে পদার্থ-বিজ্ঞান শাখায় 'সংখ্যায়নিক পদার্থবিদ্যায় সাম্প্রতিক প্রগতি' সম্পর্কে যে আলোচনা-চক্র হয়, সেটি বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। এই আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদলের নেতা অধ্যাপক আব্দুল মোতিন চৌধুরী এবং অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক ডি. এস. কোঠারী, অধ্যাপক এফ. সি. আউলাক, ডক্টর এ. সি. বিশ্বাস, ডক্টর নন্দী ও ডক্টর পত্রিয়া। এছাড়া অন্যান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচনা ও বক্তৃতা হয়েছিল অধ্যাপক টি. এস সদাশিবমের 'উদ্ভিদের অসমাহিত রোগসমস্যা', ডক্টর এম. এস. স্বামীনাথনের 'যুগসন্ধিক্ষণে ভারতীয় কৃষি-বিজ্ঞান', অধ্যাপক ভেঙ্কোয়া রাও-এর 'স্বপ্ন ও নিদ্রা', ডক্টর শ্রীমতী পার্বতীদেবীর 'মানুষের বিপাকীয় যন্ত্রসমূহ', ডক্টর নীলরতন ধর পরিচালিত 'সবুজবিপ্লব' সম্পর্কিত আলোচনা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দুকুমার বসুর 'শিক্ষা ও ভারতে কর্মসংস্থান' এবং ডক্টর এ. আর. ভর্মার 'কেলাস গঠন' বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি এবং বিজ্ঞান বিষয়ের পুস্তকাদি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শনী ও ভারতীয় কয়লা গবেষণাকেন্দ্রের প্রদর্শনী বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। প্রদর্শনীতে দুটি বিশেষ মণ্ডপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রামন মণ্ডপে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তৈরী বৈজ্ঞানিক মডেল, যন্ত্রপাতি, চার্ট ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়েছিল। আর রবীন্দ্রনাথের নামে টেগোর মণ্ডপে ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবি, হস্তশিল্প, নক্সা ইত্যাদি স্থান পেয়েছিল। এই দুটি মণ্ডপে প্রতি দিন বহু শত দর্শকের সমাগম হতো।

প্রতিনিধিদের জন্যে স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি নাগপুরের আশপাশের দর্শনীয় স্থানগুলি, রামটেক, ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর আশ্রম এবং অজন্তা-ইলোরা দর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। নানা কারণে নাগপুরের এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন প্রতিনিধিদের মনে তেমন সাড়া ও আশা জাগাতে পারে নি, বরং হতাশাই সঞ্চার করেছিল

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

জয়ন্ত বসু

বর্তমান যুগকে যথার্থই বিজ্ঞানের যুগ বলা যায়। বিজ্ঞান আজ আর কেবল গবেষণাগারে আবদ্ধ নয়, সাধারণ মানুষের জীবনও নানাভাবে বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে। আমাদের চারধারে যে উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগৎ, আমাদের নিজেদের দেহ এবং মন—এই সবই এখন বিজ্ঞানের আওতায়। একদিকে বিজ্ঞান যেমন আমাদের বুদ্ধির প্রসার ঘটিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কলা-কৌশলের অভাবনীয় উন্নতির ফলে মহাকাশ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে, পৃথিবীর বাইরে বিরাট বিশ্বের দূর-দূরান্তের খবরও বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করছেন। বিজ্ঞানের নানান টুকিটাকি জিনিষ নিয়ে সাধারণ মানুষও আজকাল হামেশাই নাড়া-চাড়া করছেন। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অশীতিতম জন্মবার্ষিকী ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে সম্প্রতি কলকাতায় ছয়দিন ব্যাপী যে বিজ্ঞান প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বসাধারণের কাছে আধুনিক বিজ্ঞানের সামগ্রিক রূপের একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া।

সমস্ত প্রদর্শনীটি পরিচালিত হয়েছিল আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হলে কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব।

এই প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত আটটি বিভাগ ছিল :—

(1) জনজীবনে বিজ্ঞান : প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞানের কয়েকটি অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, তথ্য ও ব্যাপকতর প্রয়োগকে অনুসন্ধিৎসু মনের সামনে সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরাই ছিল এই বিভাগের উদ্দেশ্য। এখানে দেখানো হয়েছিল খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধের ভেজাল পরীক্ষা, অঙ্গরাগ ও তার প্রস্তুতির ক্রিয়াকৌশল, গাছগাছড়া থেকে ওষুধ তৈরী ইত্যাদি।

(2) জীবজগৎ : এই বিভাগে প্রাণের উৎপত্তি ও ক্রম-বিবর্তন, জীবজগতের পারস্পরিক সাম্য ও নির্ভরতা, আমাদের উপকারী ও অপকারী কীট-পতঙ্গ, জীবাণুবিদ্যা, সবুজ বিপ্লবের জন্যে কৃষি গবেষণার ফলাফল ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভিদবিষয়ক দুটি পরীক্ষা তাঁর উদ্ভাবিত মূল যন্ত্রেই এখানে দেখানো হয়েছিল।

(3) মানুষের দেহ : মানবদেহের গঠনে বিস্ময়কর তথ্য ও বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রাথমিক তত্ত্বের কয়েকটি এই বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছে। মানুষ ও জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্যগুলির কিছু কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিবেশ থেকে মানুষের বিভিন্ন অনুভূতির সৃষ্টি ও প্রকাশ, বিভিন্ন তন্ত্রের কার্যকলাপ, দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কার্যক্ষমতা পরিমাপের ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের উপায় ইত্যাদিও এখানে দেখানো হয়েছিল।

(4) মানুষের মন : বিচিত্র মানব মনের কয়েকটি খবর এখানে জানানো হয়েছে। সহজ সাধারণ কাজেও আমাদের কিছুটা দেরী হয়, বলামাত্র কাজ আরম্ভ করা যায় না ; আসলে যে বস্তু অচল, তাকে মন গতিশীল করে দেখে ; বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় ; নিবিষ্ট মনোযোগ আসলে কয়েক মুহূর্তের বেশী একটানা স্থায়ী হয় না ; মনের ব্যাধির রূপ সম্বন্ধে প্রয়োজন গণনা সম্ভব ;—

এই সব মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনের বিষয় এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি বিষয় দর্শকের পরীক্ষা করবার সুযোগ ছিল।

(7) বিজ্ঞানের টুকিটাকি : ইলেকট্রনিক্স-এর নানান যন্ত্রপাতি, কালো-ফর্সার মান বিচার, প্রতিবেদনশক্তি পরীক্ষা, মাছের গতিবিধির উপর

বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ভাষণ দিচ্ছেন

(5) বুদ্ধির খেলা : মানুষের বুদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ যে অঙ্কশাস্ত্রে, তার কয়েকটি আকর্ষণীয় নিদর্শন এই বিভাগে রাখা হয়েছিল। এখানে ছিল অঙ্কের ফাঁকি বা অপসিদ্ধান্ত, অঙ্কের সঙ্করণ, ত্রিমাত্রিক জ্যামিতীয় আকৃতির যথাযথ বিন্যাস, অঙ্কের খেলা, টপোলজীয় আকৃতির বৈচিত্র্য ইত্যাদি। এই সব ছাড়াও এই বিভাগে ছিল একটি ছোট যন্ত্রগণক অর্থাৎ 'মিনি কম্পিউটার'।

(6) পৃথিবী ছাড়িয়ে : এই বিভাগে সৌর-জগৎ ও নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া ছিল। বেতার দূরবীক্ষণের একটি মডেল এই বিভাগের অন্যতম আকর্ষণ। মহাকাশ অভিযানে বিজ্ঞানীরা চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন আলোকচিত্রের মাধ্যমে, সেগুলির কিছু এখানে দেখানো হয়েছিল।

শব্দের প্রভাব, বেতার-পাখা, ইলেকট্রনিক হার্মোনিয়াম, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি এখানে দেখানো হয়েছিল। এসব ছাড়াও ছিল কাচকাটা যন্ত্র, নিউটনের তৃতীয় সূত্রের আকর্ষণীয় প্রমাণ, তড়িৎশক্তি উৎপাদন নীতি, ভৌতিক নাচ এবং আরও অনেক কিছু।

(8) বাংলায় বিজ্ঞান : আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর অবদানের বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছিল। তা ছাড়া বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার সূচনা চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে ভারতে ও বাংলা দেশে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকাদি ও সাময়িক পত্রিকার বেশ কিছু নমুনাও এখানে প্রদর্শিত হয়।

প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি স্মারকপত্রও প্রকাশ করা হয়েছিল।

22শে জানুয়ারী'74 তারিখে সন্ধ্যা ছয়টায় 92, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন ভবনে বিজ্ঞান প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্বয়ং সভায় উপস্থিত থেকে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রদর্শনীটির রূপরেখা ও এর বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে পরিচিতি প্রদান করা হয়। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতির স্থানীয় শাখার পক্ষ থেকে অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান ডক্টর মহাদেব দত্ত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডক্টর মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী। প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গ প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় সাগ্রহে একটি মডেল দেখছেন।

অতঃপর 23শে থেকে 27শে জানুয়ারী পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা 2টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত প্রদর্শনীটি সর্বসাধারণের জন্য খোলা ছিল। প্রদর্শনীতে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। যারা বিষয়বস্তুগুলি যন্ত্র, মডেল ও চার্টের সাহায্যে দর্শকদের কাছে সহজ ও সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করেছিল, তারা অধিকাংশই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী —সংখ্যায় প্রায় এক-শ'—ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, বেথুন কলেজীয়েট স্কুল ও স্কটিশ চার্চ কলেজীয়েট স্কুল থেকে এরা এসেছিল। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'হাতে-কলমে' বিভাগের কিশোর বিজ্ঞানীরাও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এদের সবাইকে সাহায্য করছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর কয়েকজন শিক্ষক এবং বহু গবেষক ও ছাত্র।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রদর্শনীটি পরিচালিত হয়। অন্যান্য বহু সংস্থা নানাভাবে সহযোগিতা করে পরিষদের ধন্যবাদভাজন সমিতি (স্থানীয় শাখা), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগ, শারীরতত্ত্ব বিভাগ ও মনোবিজ্ঞান বিভাগ, বসু
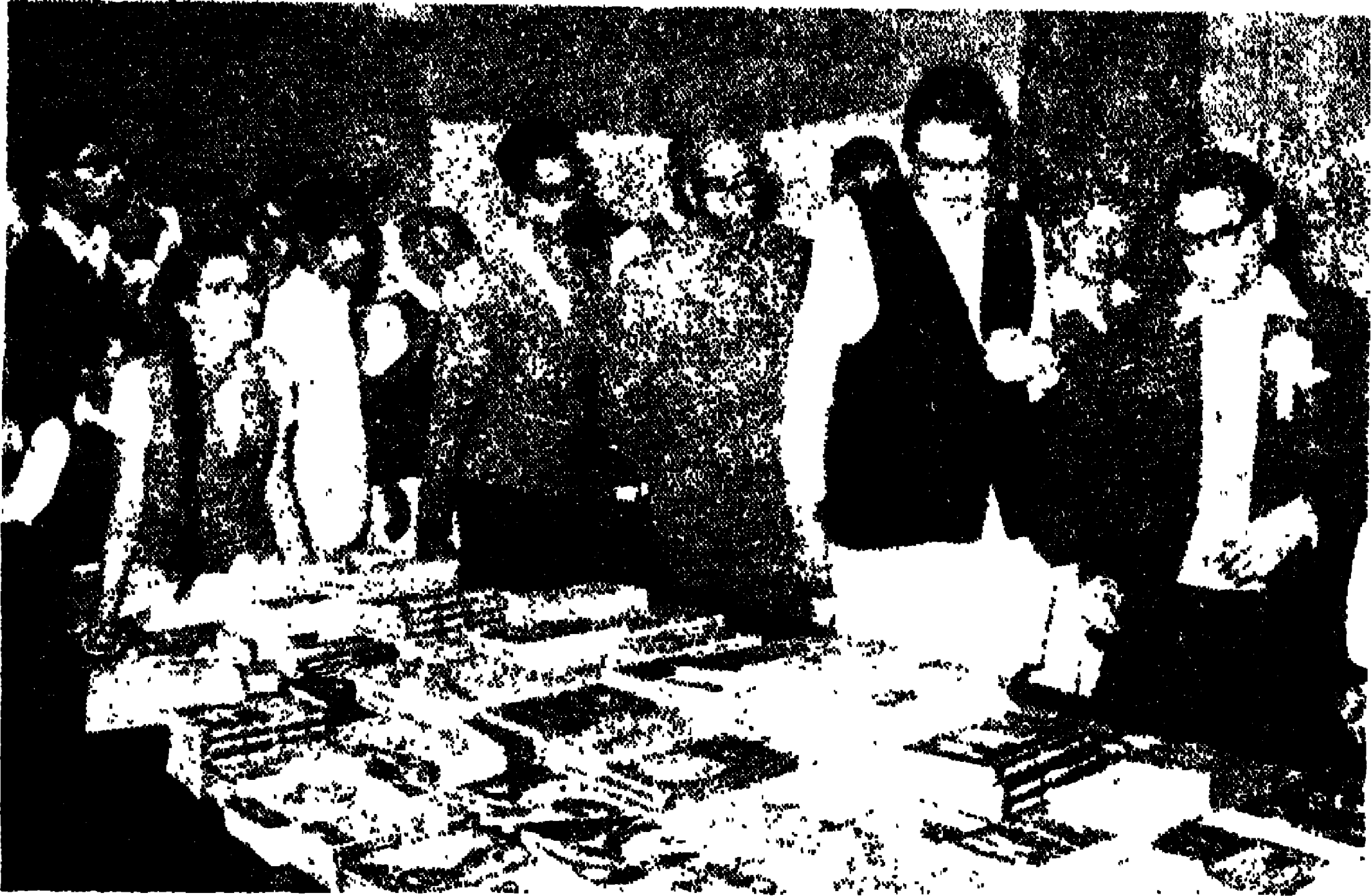
'বাংলায় বিজ্ঞান' বিভাগে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য—আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অশীতিতম জন্মবার্ষিকী ও বোস সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন বিজ্ঞান মন্দির, বিড়লা মিউজিয়ম, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, বেথুন কলেজীয়েট স্কুল ও স্কটিশ চার্চ কলেজীয়েট স্কুল।

বিজ্ঞান-সংবাদ

কম্পিউটারে আলোচনা

মুদ্রিত ইংরেজী লেখাকে সুবিন্যস্ত ইংরেজী বক্তৃতায় পরিণত করবার জন্যে একরকম কম্পিউটার আবিষ্কার করেছেন বেল লেবোরেটরীর (যুক্তরাষ্ট্র) দু-জন কর্মী। কম্পিউটারে শিক্ষাদান পদ্ধতি, সহজে ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্য জ্ঞাপন এবং অন্ধদের জন্যে পুস্তক পাঠযন্ত্র উদ্ভাবনের সম্ভাবনা থাকবে এই কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে। অবশ্য এসব এখনও গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। এর জন্যে কোন অনুবাদ বা রেকর্ডকরা কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন হবে না।

একটি ছাপা ইংরেজী কাগজ টেলিটাইপ রাইটার থেকে কম্পিউটারের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে কম্পিউটারটি বাক্যগুলি বিশ্লেষণ করে তাতে সময় ও জোর চিহ্নিত করে প্রতিটি শব্দের উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য তার স্মৃতিভাণ্ডারে জমা করে রাখে। একটি বিন্যাসকারক যন্ত্র কৃত্রিম স্বর সৃষ্টি করে। কম্পিউটারটি স্বরোৎপাদন, বক্তৃতার ধরণ এবং লিখিত ও কথ্য ভাষার মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে বিন্যাসকারক যন্ত্রটিকে নির্দেশ দেয়।

লেসার রশ্মির সাহায্যে চোখের চিকিৎসা

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর অনুদানের সাহায্যে গবেষণা চালিয়ে লেসার রশ্মির সাহায্যে নিরাপদে চোখের চিকিৎসার একটি যন্ত্র স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক্যালিফোর্নিয়া) গবেষকেরা আবিষ্কার করেছেন। এই প্রণালীটিকে বলা হয় 'লেসার ফটোকোয়াগুলেশন'। চোখের রেটিনা বিচ্যুতির চিকিৎসা, টিউমার নিরাময়, রোগ ছড়ানো বন্ধ করা ও অন্যান্য কাজেও এটি ব্যবহার করা যায়।

চোখের একটি অংশ বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা বেছে নিয়ে যন্ত্রটি সেই জায়গায় লেসারের তীব্র শক্তি প্রয়োগ করে। কারণ চোখের টিস্যু ফটোকোয়াগুলেশনে ধ্বংস হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মত একটি পর্যবেক্ষণ যন্ত্র বা একটি স্লিট ল্যাম্প যন্ত্রটিতে থাকে। সেই আলোর সাহায্যে রশ্মিটি ঠিক জায়গায় পড়ে এবং জায়গাটার আয়তনও নিয়ন্ত্রণ করে।

ক্যালিফোর্নিয়ার প্যালো অ্যাল্টোর কোহেরেন্ট রেডিয়েশন লেবোরেটরীজ যন্ত্রটি নির্মাণ করছে এবং ইতিমধ্যে এই রকম 150টি যন্ত্র বিক্রিত হয়েছে।

তড়িৎ-শক্তির জন্যে তরল গ্যাস

ভালকান সিনসিনাটি, ইনকর্পোরেটেড (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)-এর খবরে প্রকাশ যে, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কারখানায় পরীক্ষায় জানা গেছে 'মেথিল ফুয়েল' নামে এই সব কারখানার উৎপন্ন তরল প্রাকৃতিক জ্বালানী গ্যাস তড়িৎ উৎপাদনের কাজে লাগতে পারে। এই সংস্থাটি জানিয়েছে যে, উত্তর আফ্রিকা বা অন্য যে সব অঞ্চলে উদ্বৃত্ত প্রাকৃতিক গ্যাস আছে, সেই সব জায়গায় মেথিল ফুয়েল তৈরী করা যেতে পারে। উৎপাদনের পরে এই জ্বালানী গ্যাস গ্যালন প্রতি ছয় সেন্টেরও কম খরচে আমেরিকার পূর্ব উপকূল অঞ্চলসমূহে পাঠানো যাবে।

এই জ্বালানী গ্যাস চলতি ধরণের তৈলবাহী জাহাজেই নিয়ে যাওয়া চলবে। কারণ, এই জ্বালানীতে চাপ দেবার বা শীতলীকরণের প্রয়োজন হয় না।

মেথানল কারখানায় যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে বহু দিনের অভিজ্ঞতায় এই সংস্থা এই জ্বালানী গ্যাস তৈরীর প্রয়োগ-কৌশল উন্নত করেছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জাতীয় পশু—বাঘ

সিংহের পরিবর্তে বাঘ এখন ভারতের জাতীয় পশু। 1972-এর নভেম্বরে ভারতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পর্ষদ বাঘকে জাতীয় পশুরূপে নির্বাচিত করেছেন। সংখ্যায় অধিক এবং ভারতের বহু অঞ্চলে পাওয়া যায় বলে বাঘ এই মর্যাদা পেয়েছে। এককালে বাঘের সংখ্যা ছিল প্রায় 40,000, কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে 2,000-এরও কম। মানুষের বসতি, কৃষিবিস্তার, অরণ্য অঞ্চলের হ্রাসপ্রাপ্তি, নিছক সখ বা চামড়ার লোভে অনিয়ন্ত্রিত বাঘ শিকার প্রভৃতি বাঘের সংখ্যা হ্রাসের কারণ বলে অনুমান। অনেক সময় অরণ্য অঞ্চলের বিনাশ ও সেখানে তাদের খাদ্যের অভাবের জন্যে কাছাকাছি লোকালয় থেকে গবাদিপশু হত্যা করায় বাঘকে প্রাণ দিতে হয় মানুষের হাতে। বিষ প্রয়োগ বা আরও নানা উপায়ে এই হত্যালীলা সম্পন্ন হয়ে থাকে বলে অনেকের ধারণা।

অনুমান করা হয় যে, বাঘ শেষ তুষার যুগের পর উত্তর এশিয়া থেকে চীন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমা দিয়ে এদেশে পৌঁচেছিল। পরে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল—তবে হিমালয়ের খুব উঁচু অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম উষর ভূমি বাদে। আরও অনুমান করা হয় যে, বাঘ এমন এক সময় ভারতে এসেছিল—যার আগেই সিংহল ও ভারতবর্ষের সংযোগস্থল সমুদ্রে লীন হয়ে যায়। তাই সিংহলে বাঘ প্রবেশ করতে পারে নি। অনেকে অবশ্য এই মত সমর্থন করেন না। যাই হোক, ভারতের বহু অঞ্চলেই বর্তমানে বাঘের দেখা মেলে। ভারতের বহু অঞ্চলে বাঘ ছড়িয়ে থাকলেও ঠিক একই জায়গায় এদের অসংখ্য

সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না। ভারতের যে যে জায়গায় বাঘ আছে, সেখানে তাদের সংখ্যার যে হিসাব পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়—আসামে-147, অরুণাচল-69, নাগাল্যাণ্ড-80, মেঘালয়-32, পশ্চিম বঙ্গ-73, বিহার-85, উড়িষ্যা-142, অন্ধ্রপ্রদেশ-35, তামিলনাড়ু-33, কেরালা-60, মহীশূর-102, মহারাষ্ট্র-160, মধ্যপ্রদেশ-457, উত্তর-প্রদেশ-262, গুজরাট-8, রাজস্থান-74, মিনিকয়-8।

যদিও অনেক প্রাণীকেই বাঘ বলা হয়, যেমন—চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের বর্তমান জাতীয় পশু বাঘ বলতে বোঝায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার, যার বৈজ্ঞানিক নাম প্যান্থেরা টাইগ্রিস (Panthera tigris)। শুধু সুন্দরবনের বাঘ নয়, ভারতের সব অঞ্চলের বাঘই এক, আর তা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এশিয়া মহাদেশে তথা ভারতীয় উপমহাদেশেই এই বাঘ সীমাবদ্ধ—এর শতকরা 90 ভাগই ভারতে। বাঘের নিবাস হচ্ছে গভীর অরণ্য অঞ্চল—সিংহের মত খোলামেলা অরণ্য অঞ্চল নয় এবং আরও এরা চায় আড়াল। মনুষ্যবসতির কাছাকাছি থাকতেও এরা অভ্যস্ত নয়। বাঘ প্রয়োজন ব্যতিরেকে নিঃসঙ্গ বা একাই থাকে। সিংহের মত দলবল নিয়ে থাকে না। প্রজননের সময় ছাড়া স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে বাস করে না। মাত্র পূর্বরাগের সময় 7-10 দিন এদের একত্রে বসবাস। মিলনের পরেই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বাঘের সঠিক বা প্রকৃত প্রজনন ঋতু নেই, তবে সাধারণতঃ বাংলায় বর্ষার শেষে এদের মিলন ঘটে এবং প্রায় ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসের মধ্যেই প্রসবকাল। বাঘিনীর গর্ভধারণের সময় প্রায় 15 সপ্তাহ। শাবক ভূমিষ্ঠ হবার পর মা তাদের যত্ন নেয়। কারণ এই সময় তারা থাকে অসহায়। তাই তাদের একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত মায়ের কাছেই থাকতে হয়। আর তারই জন্যে প্রয়োজন হয় নিরাপদ স্থানের। অনেক সময় এই নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব বাঘের সংখ্যা হ্রাসের আরও একটি কারণ বলা যেতে পারে। জঙ্গলে এমনি আশ্রয়স্থলের অভাব ঘটে। জঙ্গলে গাছকাটা তাদের বিরক্তি উদ্রেক করায় অনেক সময় মায়েরা শাবকদের ফেলে চলে যায়। ফলে অনাহারে শাবকদের মৃত্যু ঘটে। সাধারণভাবে এই গাছকাটার সময়টা বাঘের প্রজননের সময় যুগপৎ ঘটে থাকে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সময়ে সময়ে বাঘকে সিংহের সঙ্গে মিলিত হতে দেখা যায়। পুরুষ বাঘ ও স্ত্রী-সিংহের মিলনে যে সঙ্কর শাবক উৎপন্ন হয়, তাকে টাইগন (Tigon) বা ব্যাংহ বলা হয়। আবার এর বিপরীত ক্ষেত্রে তার নাম হয় লাইগার (Liger) বা সিংঘ্র। সম্প্রতি আলিপুর চিড়িয়াখানায় যে টাইগনের জন্ম হয়েছে—তা নাকি সর্বাপেক্ষা বেশী দিন বেঁচে থাকবার রেকর্ড করেছে বলে জানা যায়। বাঘের স্বাভাবিক পূর্ণতাপ্রাপ্তির সময় প্রায় পাঁচ বছর। তবে তারা তার পূর্বেই অনেক ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

বাঘ সাধারণতঃ লম্বায় 9-10 ফুট, এমন কি, 12 ফুটও হয় অনেক সময়। বাঘিনী তুলনায় কিছুটা কম। বাঘের লেজ প্রায় তিন ফুট; স্কন্ধশীর্ষের উচ্চতাও প্রায় সাড়ে তিন ফুট। উজ্জ্বল পিঙ্গলাভ বর্ণের উপর কালো ডোরা-কাটা এদের বৈশিষ্ট্য; দেহের তলদেশ হয় সাদা। লেজে দেখা যায় প্রায় চক্রাকার কালো দাগ। যাই হোক, এই হলো বাঘের মোটামুটি বর্ণবৈচিত্র্য। সাদা বাঘ, যা খ্যাতির উচ্চশিখরে, তারা কিন্তু ভিন্ন প্রজাতির নয়। এই বাঘকে ভারতীয় বাঘের অ্যালবিনোটিক ভেরিয়েশন (Albinotic variation) বা পরিবর্তিত শ্বেতীবিশিষ্ট রূপ বলা যায়। এদের দেহ সাদাটে বা খুব হাল্কা পিঙ্গল, যা সাদা প্রতীয়মান হয়। আর ডোরাগুলি ঠিক কালো নয়—প্রায় ঘন বাদামী বা কাল্‌চে বাদামী। মধ্যপ্রদেশ, তথা রেওয়ার সাদা বাঘ প্রসিদ্ধ। এই বাঘকে এখন চিড়িয়াখানায় বংশবিস্তার করতে দেখা গেছে। আসাম, বাংলা, বিহারেও হাল্কা রঙের সাদা বাঘের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে।

বাঘের খাদ্যতালিকায় বন্যবরাহ, হরিণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। গৃহপালিত পশুও এরা হত্যা করে খেয়ে থাকে। এছাড়া বাঘ যেখানে থাকে, সেখানকার ছোট-বড় প্রাণীও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী উদরসাৎ করতে দ্বিধাবোধ করে না। তবে প্রধানতঃ নিজের শিকার করা প্রাণী ছাড়া, কোন মৃত প্রাণী বড় একটা খায় না। মৃত গবাদি-পশু বা অপরের হত্যা করা প্রাণী এরা কদাচিৎ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। পচা মাংস খেতে এদের খুব একটা আপত্তি নেই।

বাঘ স্বভাবে বেশ ধূর্ত। বাঘের ঘ্রাণশক্তি নিয়ে মতবিরোধ আছে। জানা যায় এদের ঘ্রাণশক্তি বেশ ভালই, তবে সব সময় এরা তা ব্যবহার করে না। এদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বেশ প্রখর বলে ঘ্রাণশক্তি ব্যবহার করবার প্রয়োজন বড় একটা হয় না। শিকার সন্ধান করতে বাঘ খুব কমই নির্ভর করে তাদের ঘ্রাণশক্তির উপর বা একেবারে করে না। এই ঘ্রাণশক্তি তারা ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতে। একটি বাঘ গন্ধ ছড়িয়ে জানিয়ে দেয় অপর বাঘকে—কোথায় সে আছে। তাদের দৃষ্টিশক্তিও প্রখর। অসাধারণ তাদের রাত্রে দেখবার ক্ষমতা। অল্প নড়চড়াও তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সাঁতারেও বাঘ বেশ পটু। শোনা যায় রাত্রে নদীবক্ষে নৌকায় বিশ্রামরত মৎস্য-শিকারীদের সাঁতার কেটে সে আক্রমণ করেছে।

বাঘ সাধারণতঃ দিনের বেলায় আড়ালে কোন নিরাপদ স্থান বা গুহা প্রভৃতিতে শুয়ে বিশ্রাম নেয়। সন্ধ্যাকালে তারা বেরিয়ে পড়ে শিকারের সন্ধানে। অবশ্য এমন কোন নিয়ম নেই যে, দিনে তারা শিকার করবে না। খুব গরম না থাকলে এবং রোদের প্রাখর্য না থাকলে বা কোন বিপদ বা বিরক্তিকর ব্যাপারের সম্ভাবনা না থাকলে দিবাভাগেও শিকার করে। সাধারণতঃ বাঘ একাই শিকার করে। কিন্তু কখনো কখনো একটি পরিবার-দল নিয়েও এরা শিকার করে থাকে। বাঘ বেশ

দক্ষ ও নিপুণ শিকারী, নিজের ওজনের চেয়েও বড় প্রাণী শিকার করতে এরা সক্ষম। শিকার পদ্ধতি পরিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট অবস্থাভিত্তিক হয়। অনেক সময় তারা আত্মগোপন করে অনুসৃত বা অভিপ্রেত বস্তুর অলক্ষ্যে সদর্পে তার নিকটবর্তী হয়ে তাকে আক্রমণ করে বা সেই শিকার নিকটবর্তী হলে তখন তাকে আক্রমণ করে। আবার দল নিয়ে শিকারের সময়—দলের একটি পশু আত্মগোপন করে থাকে, আর অন্যেরা শিকারকে তার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। যাই হোক, বাঘ প্রথমে শিকারের ঘাড়ে বা গলায় গভীর দংশনে মৃতপ্রায় করে দূরে নিক্ষেপ করে, যাতে মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর শিকারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়া বাঘের নিজের কোন ক্ষতি করতে না পারে। যাই হোক, এমনিভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে শিকার ঘাড়ের কশেরুকাগুলি ভেঙ্গে গিয়ে তাদের মৃত্যু ঘটে। বাঘ শূকর মাংস বেশী পছন্দ করে বলে কথিত। তাই খুব বেশী অসুবিধা না হলে শূকর শিকারের করে সে বড় একটা সেই শিকারের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চায় না। শিকারের পর বাঘ প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবস্তু উদরসাৎ করে। যদি অবশিষ্টাংশ থাকে, তবে তা লতাপাতা ইত্যাদিতে ঢাকা দিয়ে রাখে। ভোজনের পর প্রচুর পরিমাণে জলপান করে কাছাকাছি কোন নিরাপদস্থানে গিয়ে বিশ্রাম ও নিদ্রার ব্যবস্থা করে। শিকারের কাছ থেকে তারা খুব একটা দূরে যেতে চায় না, কারণ ওই অবশিষ্টাংশ প্রয়োজনমত তাদের সদ্ব্যবহার করতে হবে। নিরাপদে শিকার ভক্ষণ করবার জন্যে বাঘ অনেক সময় তা সুবিধাজনক স্থানে টেনে নিয়ে যায়।

বাঘের সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে যে, এরা হিংস্র, বদমেজাজী, মনুষ্যমাংসলোভী। কিন্তু সব সময় তা ঠিক নয়। জিম করবেট বলেছেন, বাঘ 'ভদ্রলোক'—কিন্তু উত্যক্ত বা আহত হলে তারা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। মানুষ-খেকো বাঘ খুবই বিরল। আর বাঘ ইচ্ছা করে কদাচিৎ মানুষ মারে। আহত, অক্ষম বা বৃদ্ধ হয়ে বাঘ মানুষ-খেকো হয়। মনুষ্যমাংসের স্বাদ পেলেও সেই বাঘ নরখাদক হয়ে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ বয়সে যখন তাদের অন্য প্রাণী হত্যা করা সম্ভব হয় না, তখন তারা মানুষকে আক্রমণ করে। এই কাজটা হয় তাদের পক্ষে অনেক সোজা। শাবকেরাও মানুষের মাংস খেতে খেতে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পরে নরখাদকে পরিণত হয়। শাবক সঙ্গ থাকলে অর্থাৎ বাচ্চাওয়ালা বাঘিনীরা মহা বিপজ্জনক। এদের সামনে পড়লে—তাদের বিরক্ত না করলেও আক্রমণ করতে দ্বিধা করে না। আহত বা ঘুমন্ত বাঘের সামনে পড়লেও বিপদের সম্ভাবনা। এসব ছাড়া বাঘ বড় একটা মানুষের ক্ষতি করে না। মানুষ দেখলে বা যে প্রাণী তারা কখনো দেখে নি, তা দেখলে এরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

বাঘের লম্ফপ্রদান দেখলে বোঝা যায় যে, এরা যেন কিছুটা দূরে হাওয়ায় ভেসে গিয়ে শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। এতে পায়ে আঘাত বা ঝাঁকুনি লাগে না। একটা কথা

এখানে মনে রাখা দরকার যে, শাবকদের রক্ষার ব্যাপারে, উত্তেজিত বা বিরক্ত হলে তারা যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে দ্বিধা করে না।

বাঘিনীরা সাধারণতঃ একপতিপরায়ণ (Monogamous)। তবে একটি বাঘ নিহত হলে—আর একটি বাঘ সেই স্থান দখল করে নেয়। বাঘিনী পূর্বপতির মৃত্যুর পর অতিসত্বর নতুন সঙ্গী জোগাড় করে নেয়। জানা যায় যে, একটি বাঘিনীর পতিত্ব দখলের জন্যে কয়েকটি বাঘের মধ্যে লড়াই বেঁধে যায়। যে জেতে সেই পতিত্বের গৌরব লাভ করে।

বাঘেরা নিজেদের বিচরণের একটা এলাকা ঠিক করে নেয়। আর সেই এলাকা ছেড়ে বড় একটা যায় না। সেটা কোন একটা বাঁধা-ধরা জায়গা না হয়ে হয়তো বেশ কয়েকটা কাছাকাছি অঞ্চলের সমষ্টি হতে পারে। একটা থেকে আর একটা এমনি জায়গায় তারা শিকার খুঁজে বেড়ায়। এই সব নির্বাচিত এলাকায় অপর কোন বাঘ প্রবেশ করলে সংঘর্ষ তার সঙ্গে অবধারিত। স্বাভাবিক বন্যজীবনে বাঘ প্রায় কুড়ি বছর বাঁচে বলে অনুমান। তবে এর কম-বেশী হওয়া বিচিত্র নয়। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে, বাঘেদের এক নজরে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ করা যায় না। বাঘ-বাঘিনী প্রায় একই রকম দেখতে।

বাঘ আজ অবলুপ্তির প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে,—অন্ততঃ সংখ্যায় তারা সঙ্কুচিত। সেই কারণে এই বিখ্যাত পশুটিকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে এক প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। ব্যাঘ্র প্রকল্প (Project Tiger) হয়েছে। এই প্রকল্পে কয়েকটি অঞ্চল বেছে নেওয়া হয়েছে, সেখানে থাকবে এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এই প্রচেষ্টা যে বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ব্যাঘ্র সংরক্ষণ পরিকল্পনায় যে কয়টি অঞ্চল অভয়ারণ্যের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলি হলো—আসামে মানস, বিহারে পালামৌ, উড়িষ্যায় সিমলাপাল, উত্তর প্রদেশে করবেট, রাজস্থানে রনথমভোর, মধ্যপ্রদেশে কনিহা, মহারাষ্ট্রে মেলঘাট, মহীশূরে বান্দীপুর এবং পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন। সংরক্ষণের বিধিব্যবস্থাও উল্লিখিত হয়েছে এই প্রকল্পে। সংরক্ষণের সুব্যবস্থা ও আন্তরিক চেষ্টা বাঘকে অবলুপ্তির গ্রাস থেকে নিশ্চয় রক্ষা করবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র*

---

* প্রাণিবিদ্যাবিভাগ, বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন।

পারদর্শিতার পরীক্ষা

নীচে সাধারণ বিজ্ঞান সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে তিনটি উত্তর দেওয়া আছে—উত্তরগুলির মধ্যে একটিই সঠিক। তুমি কতগুলি সঠিক উত্তর দিতে পারলে, তাই থেকে সাধারণ বিজ্ঞানে তোমার পারদর্শিতা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবে।

1. ফটোগ্রাফ তৈরীর কাজে ব্যবহৃত ব্রোমাইড পেপারে কি থাকে ?
   (ক) পটাসিয়াম ব্রোমাইড KBr
   (খ) সিলভার ব্রোমাইড $AgBr$
   (গ) সোডিয়াম ব্রোমাইড $NaBr$

2. ম্যাগ্‌নেটাইট নামক খনিজ পদার্থের প্রধান উপাদান কি ?
   (ক) ক্যালসিয়াম অক্সাইড CaO
   (খ) আয়রন (ফেরেসো-ফেরিক) অক্সাইড Fe_3O_4
   (গ) ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্বনেট $MgCO_3$

3. হাসপাতালে রোগবীজাণুনাশক পদার্থ হিসাবে আয়োডফর্ম-এর রাসায়নিক সঙ্কেত কি ?
   (ক) CHI_2Cl
   (খ) CHI_3
   (গ) $CHICl_3$

4. প্লাম্বাগো (Plumbago) বা কালো সীসাতে (Black lead) কি থাকে ?
   (ক) সীসা
   (খ) লোহা
   (গ) গ্র্যাফাইট

5. থায়ামিন কোন্ ভিটামিনের রাসায়নিক নাম ?
   (ক) ভিটামিন E
   (খ) ভিটামিন A
   (গ) ভিটামিন B_1

6. চিকিৎসাশাস্ত্রে অ্যানোক্সিয়া (Anoxia) কাকে বলে ?
   (ক) ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া
   (খ) ঘ্রাণশক্তির লোপ পাওয়া
   (গ) শরীরের টিস্যুতে অক্সিজেনের ঘাটতি হওয়া

7. আন্তর্জাতিক মানের এক ক্যারট কত গ্র্যামের সমান ?

(ক) 0·200 গ্র্যাম

(খ) 0·300 গ্র্যাম

(গ) 0·400 গ্র্যাম

8. এক আন্তর্জাতিক নটিক্যাল মাইল (Nautical mile) কত মিটারের সমান ?

(ক) 2852 মিটার

(খ) 2582 মিটার

(গ) 1152 মিটার

9. অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন জেট বিমানের গতি যে মাখ্ সংখ্যা (Mach number) দ্বারা নির্দেশ করা হয়, তা কি ?

(ক) বিমানের বেগ ও বাতাসে শব্দের বেগের অনুপাত

(খ) বাতাসে শব্দের বেগ ও বিমানের বেগের অনুপাত

(গ) বিমানের গতিবেগ ও শূন্যস্থানে আলোকের বেগের অনুপাত

10. এক্স্ রশ্মির (X-ray) তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোন্ সীমার মধ্যে অবস্থিত ?

(ক) 10^{-11} সে. মি. হইতে 10^{-8} সে. মি.

(খ) 10^{-8} সে, মি. হইতে 10^{-6} সে. মি.

(গ) 10^{-6} সে. মি. হইতে 10^{-4} সে. মি.

11. সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির ব্যাস কত কিলোমিটার ?

(ক) 139760 কি. মি.

(খ) 239670 কি. মি.

(গ) 269730 কি. মি.

12. পৃথিবীর ভর 1 ধরলে চন্দ্রের ভর কত ?

(ক) 0.12

(খ) 0·012

(গ) 0·0012

(উত্তরের জন্যে 109নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

সর্দিগর্মি

গ্রীষ্মকালে প্রতি বছরই মে-জুন মাসে আমাদের দেশে সর্দিগর্মিতে বহু লোক প্রাণ হারায়। বেশীর ভাগ লোকই এই রোগের কবলে পড়ে—যারা বাইরে কাজ করতে বেরোয়। প্রচণ্ড রোদে এক রকম গরম হাওয়া বইতে থাকে। একে লু বলে।

শরীরের স্বাভাবিক তাপনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটি ভেঙে পড়লে হঠাৎ সর্দিগর্মি লাগে। কথাটি পরিষ্কার করে বলি। সাধারণতঃ যখন বাইরের তাপমাত্রা বাড়ে, তখন আমাদের শরীরের ত্বক থেকে ঘাম অথবা ফুসফুস থেকে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে গিয়ে, দেহকে ঠাণ্ডা করে। কিন্তু বাইরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেলে এই রকম প্রাকৃতিক নিয়ম দেহকে ঠাণ্ডা করতে পারে না। এর ফলে শরীরের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এমন কি 180° ফারেনহাইট বা তার চেয়ে বেশী জ্বর হতে পারে। এই অবস্থায় ঠোঁট শুকিয়ে আসে, নাড়ীর গতি বাড়তে থাকে। সর্দি-গর্মির প্রধান লক্ষণ হলো ঘাম বন্ধ হওয়া। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ও শরীরের আরও অনেক যন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও অবশেষে মারা যায়। সর্দিগর্মির চিকিৎসায় রোগীর দেহকে খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে তাকে নামানোও যেতে পারে। শরীরে অল্প মাসাজ করলেও ভাল হয়। খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসার সুব্যবস্থা করলেও রোগীর সুস্থ হতে বেশ কয়েক সপ্তাহ লাগে। অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে কয়েক দিন অজ্ঞান হয়ে পর্যন্ত থাকতে দেখা গেছে।

সর্দিগর্মি যে কোন লোকের লাগতে পারে। তবে দেখা গেছে হাই ব্লাড প্রেসার আছে, কিডনীর অসুখে ভুগছে অথবা অত্যধিক মদ্যপান করে যারা, তারাই এই রোগের শিকার হয় বেশী। অবশ্য প্রচণ্ড রোদে ঘরের বাইরে না বেরোলে সর্দিগর্মি লাগবার কোনও আশঙ্কা নেই। কিন্তু মাঠে অথবা পথেঘাটে যে সব শ্রমিক কাজ করেন, তাদের বাইরে না বেরিয়ে উপায় নেই। তারা ঘন ঘন জল খেয়ে দেহকে ঠাণ্ডা রাখতে পারেন। এই সময় একজন শ্রমিকের এক লিটার করে জল খাওয়া দরকার—তেষ্টা না পেলেও। ঠিকমত পোষাক পরে দেহকে বাইরের তাপ থেকে ঢেকে রাখাও বিশেষ প্রয়োজন।

পার্থসারথি চক্রবর্তী

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (খ)
2. (খ)
3. (খ)
4. (গ)
5. (গ)
6. (গ)
7. (ক)
8. (গ)
9. (ক)
10. (খ)
11. (ক)
12. (খ)

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1 : অনশনের ফলে মানবদেহে কি প্রতিক্রিয়া হয় ?

বিনয়ভূষণ কোলে, জলপাইগুড়ি।

প্রশ্ন 2 : কেমিলুমিনেসেন্স কি ?

কাকলি সেনগুপ্ত, শাশ্বতী গুহ, মেদিনীপুর।

উত্তর 1. অনশনের সময় দেহের স্নেহজাতীয় পদার্থ দেহের মধ্যেকার বিভিন্ন কার্যপ্রণালীতে ব্যয়িত হয়। এর ফলে মানুষের ওজন অনেক কমে যায়। দীর্ঘ দিন অনশনের ফলে দেহের ভিতরকার সমস্ত যন্ত্রপাতিই কমবেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। খাদ্যাভাবে শরীরের রক্ত উৎপাদন শক্তি কমে যায়, ফলে শরীরে রক্তের পরিমাণও কিছু কমে। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অল্প মাত্রায় হ্রাস পায় এবং অপরিণত লোহিত কণিকা ও শ্বেতকণিকার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, রক্তে অম্লের ভাগ অনেকাংশে বেড়ে যায়।

অনশনের ফলে মানুষের ওজন কমে যায় এবং দাঁতেরও ক্ষয় হয়। হাড়ে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়ে এবং ফস্‌ফরাসের ভাগ কমে। প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে চুল তাড়াতাড়ি পেকে ওঠে এবং শরীরে নানারকম চর্মরোগ দেখা দেয়। এই সময় হৃৎপিণ্ডের কাজ স্তিমিত হয়ে আসে ও রক্তসঞ্চালনের সময় দীর্ঘতর হয়। শরীরের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গ্রন্থির কার্যক্ষমতাও অনশনের ফলে বিঘ্নিত হয়।

ক্রিয়েটিন নামক একরকম পদার্থ পেশী সঞ্চালনে অংশগ্রহণ করে। অনশনের ফলে এই ক্রিয়েটিন হ্রাস পায়। পেশী আয়তনেও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির অনুভূতিশক্তি কমে যায় এবং দৃষ্টিশক্তিরও ক্ষীণতা দেখা দেয়। এমন কি, এই সময় স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।

উত্তর 2. রাসায়নিক শক্তি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়ে যখন আলোর সৃষ্টি করে, তখন ঐ প্রক্রিয়াকে কেমিলুমিনেসেন্স বলা হয়। এই আলোর কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উষ্ণতা নেই।

কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে অণুগুলি অংশগ্রহণ করে, সেগুলিকে বলা হয় সক্রিয়। প্রাথমিক অবস্থায় যখন উপাদানগুলিকে একত্র করে, বিক্রিয়া ঘটাবার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করা হয়, তখন এই সক্রিয় অণু সৃষ্টির জন্যে কিছু পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাপ প্রয়োগের ফলে বিক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে ও দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। সক্রিয় অণুগুলি নিজেদের মধ্যে ক্রিয়া করে যখন বিক্রিয়ার শেষ স্তরে উপস্থিত হয়, তখন তাদের অতিরিক্ত শক্তি ধরে রাখতে না পেরে ছেড়ে দেয়। যে ক্ষেত্রে এই পরিত্যক্ত শক্তি-বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান হয়—তখনই আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে দৃশ্যমান আলো দেখতে পাই এবং বিক্রিয়াটাকে বলি কেমিলুমিনেসেন্ট।

জোনাকীর আলোর সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। এই আলো কেমিলুমিনেসেন্সের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জোনাকীর দেহস্থিত প্রোটিনে লুসিফেরিন নামক এক ধরণের বিশেষ পদার্থ থাকে। বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সঙ্গে জোনাকীর লুসিফেরিনের জারণের ফলেই ক্ষীণ আলো দেখা যায়। জোনাকী যখন শ্বাসগ্রহণ করে, তখন সংগৃহীত অক্সিজেনের সঙ্গে এই জারণ-ক্রিয়া ঘটে। শুধুমাত্র শ্বাসগ্রহণের সময়েই এই জারণ-ক্রিয়া ঘটে বলে জোনাকীর আলো একটানা জ্বলে না।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ কলিকাতা-9

বিবিধ

সংখ্যায়নিক পদার্থ-বিজ্ঞানসম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অশীতিতম জন্মবার্ষিকী ও বোস-সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা দেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, খড়্গপুর আই আই টি, বসু বিজ্ঞান মন্দির এবং আরও ছয়টি বিজ্ঞান সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গত 8-11 জানুয়ারী বিজ্ঞান কলেজ ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরে সংখ্যায়নিক পদার্থ-বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা আলোচনা-চক্র বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। 8ই জানুয়ারী বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আচার্য বসুর উপস্থিতিতে এই আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম এবং পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু।

এই আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রের সংগঠন সমিতির সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন সমবেত বিদেশী ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, পশ্চিম জার্মেনী, পূর্ব জার্মেনী জাপান ও বাংলা দেশ থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং ভারতের নানা রাজ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী ও তরুণ গবেষক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বিদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা পাঁচটি বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং পাঁচটি আমন্ত্রিত বক্তৃতা ও তিরিশটি গবেষণা-পত্র পঠিত হয়। এই সব বক্তৃতা ও গবেষণার সম্পর্কিত আলোচনা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ গবেষকদের মনে গভীর আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। 11ই জানুয়ারী সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জাপানের অধ্যাপক আর. কুবো। পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বৃটিশ কাউন্সিল আলোচনা-চক্রে অংশ গ্রহণকারী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গবেষকদের প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। কলকাতায় রাজভবনে রাজ্যপাল আয়োজিত প্রীতি-সম্মেলনে আচার্য বসু উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় পদার্থবিদ্যা সমিতির কলিকাতা শাখার নূতন কার্যকরী সমিতি

ভারতীয় পদার্থবিদ্যা সমিতির (Indian Physics Association) কলিকাতা শাখার (Calcutta Chapter) কার্যকরী সমিতির সাম্প্রতিক নির্বাচনে নিম্নলিখিত সদস্যগণ 1974-76 সালের জন্যে নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

সভাপতি—ডক্টর জয়ন্ত বসু (সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স), সহ-সভাপতি—ডক্টর নকুলচন্দ্র দাস (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), সম্পাদক—ডক্টর সুপ্রকাশ চন্দ্র রায় (বসু বিজ্ঞান মন্দির), কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর সুবিমল সেন (সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স), সভ্য — ডক্টর রাজকুমার মৈত্র (সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স), অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন নাগ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডক্টর রমেন কর (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডক্টর সুখেন্দুবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-

সিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স) ও ডক্টর প্রশান্ত রুদ্র (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)।

শ্রীরামপুর চাতরায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী

কল্পতরু ছোটদের আসর আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় চাতরা দত্তপাড়া লেনে গত 30শে ডিসেম্বর '73 থেকে 1লা জানুয়ারী '74 পর্যন্ত। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ।

প্রদর্শনীতে এই বছরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিশ্বের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের জীবনের এক একটি ঘটনা বা মুহূর্ত পুতুল প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো। উল্লেখ করা যায় একটি দৃশ্যের—বিজ্ঞানী নিউটন চিন্তামগ্ন অবস্থায় বাগানে বসে রয়েছেন, হঠাৎ গাছ থেকে একটা আপেল পড়লো। এইরকম ভাবে আর্কিমিডিস, জেমস ওয়াট, সি. ভি. রামন, নিকোলাস কোপার্নিকাস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের জীবনের এক একটি বিশেষ দৃশ্যও প্রদর্শিত হয়েছিল।

রঙীন আলোকবিন্দুর মাধ্যমে ধূমকেতু 'কহুতেকে'র গতিপথের নক্সা ও ধূমকেতু এবং অন্যান্য তথ্যসম্বলিত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বিভাগটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

'চোখ ভাল রাখুন' এই পর্যায়ে 'প্রাকৃতিক চিকিৎসার দ্বারা অতি সহজে কি ভাবে চোখ ভাল রাখা যায়, সে সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য প্রদর্শিত হয়।

এছাড়া প্রতি বছরের মত বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগগুলিতেও নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক মডেল প্রদর্শিত হয়।

ইঞ্জিনীয়ারিং সম্মেলন

আগামী 22, 23, 24শে ফেব্রুয়ারী (1974), রবীন্দ্র সদনে অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনীয়ারস, ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য ও যন্ত্রাদি সম্বন্ধী তিনদিবস ব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

স-ব-চে-য়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

(1974 সালের 1লা জানুয়ারী গৃহীত ছবি)

[ব্লক—'মানবমনের' সৌজন্যে]

"আমাদের দেশে অধিকাংশ জনসাধারণের মধ্যে যদি আমরা বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি প্রচার করতে চাই, তবে সে প্রচার দেশীয় ভাষাতেই করতে হবে—বিদেশী ভাষায় নয়, তা সে বিদেশী ভাষা যত সমৃদ্ধই হোক না কেন।"

*   *   *   *

"যাঁরা বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়—তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।"

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরলোকগমনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ সভায় গৃহীত শোক-প্রস্তাব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের আকস্মিক তিরোধানে এই সভা গভীর মর্মবেদনা ও শোক প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার মহাপ্রয়াণে ভারতের তথা বিশ্বের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল, তাহা কোন দিন পূরণ হইবার নহে। বিজ্ঞানে তাঁহার অলোকসামান্য মনীষার স্মৃতি মানুষের মানসপটে চিরকাল অম্লান ও ভাস্বর রহিবে।

কেবলমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নহে—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধেও আচার্য বসুর ছিল অবাধ ও স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। তিনি ছিলেন ছাত্রবৎসল আদর্শ শিক্ষক। ঢাকা, কলিকাতা এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকবৃন্দ তাঁহার সস্নেহ সান্নিধ্যে ধন্য হইয়াছিলেন। সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেসন অব সায়েন্স ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট, ন্যাশানাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী প্রভৃতি বিশিষ্ট গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকিয়া তিনি অসংখ্য গবেষণা-কর্মীকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়াছেন।

মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আচার্য বসুর ছিল অসীম মমত্ববোধ। এই ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের সুমহান সংকল্প লইয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং প্রবর্তন করিয়াছিলেন ইহারই মুখপত্ররূপে বাংলা ভাষায় রচিত বিজ্ঞান পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য তিনি এক শক্তিশালী আন্দোলনের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। আচার্যদেবের পবিত্র স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিয়া পরিপূর্ণ সাফল্যের ভূমিতে পৌঁছাইয়া দিবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প আজ এই সভা পুনরায় উচ্চারণ করিতেছি।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ গত ছাব্বিশ বৎসর ধরিয়া যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সার্থক রূপায়ণের জন্য আমরা—পরিষদের সভ্য ও কর্মীবৃন্দ—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিতেছি।

পরিষদের জনক ও পথ-প্রদর্শক আচার্যদেবের সহিত পরিষদের যে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্কের স্মৃতি কোনদিনই মলিন হইবে না। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। এই সভা তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছে।*

---

* 11ই ফেব্রুয়ারী, 1974 তারিখে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় এই শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরলোকগমনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির শোক-প্রস্তাব

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু আজ আমাদের মধ্যে নাই। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী মহামানব আচার্যদেব বৃহদারণ্য বনস্পতির মত জাতীয় বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের জনক আচার্য বসু প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতিরূপে বিগত ছাব্বিশ বৎসর ধরিয়া এই পরিষদকে পুত্রাধিক স্নেহে লালন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদ পিতৃবিয়োগের ব্যথা অনুভব করিতেছে।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আমরা যে স্থানে বিজ্ঞানাচার্যের অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইয়া গৌরববোধ করিয়াছিলাম, আজ স্বল্পকালের ব্যবধানে সেখানে তাঁহার শোক-সভায় সমবেত হওয়ার মর্মান্তিক বেদনা আমরা অনুভব করিতেছি।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পুরোধা দেশপ্রেমিক এই বিজ্ঞানীর অভাবে বাংলার তথা ভারতের যে ক্ষতি হইল, তাহা কোনদিন পূর্ণ হইবে না।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া দেশবাসীর সহিত আমরা গভীর ব্যথা অনুভব করিতেছি।

আমরা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ—শ্রদ্ধাবনতচিত্তে পরিষদের জনক পরলোকগত আচার্যদেবের স্মৃতি-তর্পণ করিতেছি ও তাঁহার মহান আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।*

---

*৯ই ফেব্রুয়ারী, 1974 তারিখে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভায় এই শোক-প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণ সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তবিংশতিতম বর্ষ মার্চ, 1974 তৃতীয় সংখ্যা

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণে

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহার তিরোধানে সমগ্র জাতি আজ শোকাভিভূত। যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহার স্নেহধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে তাঁহার দেহাবসান দুঃসহ বেদনাদায়ক।

মৃত্যু যতই শোকাবহ হউক, প্রকৃতির নিয়মে ইহা অলঙ্ঘ্য। কিন্তু মৃত্যুতেই সব শেষ হইয়া যায় না; কীর্তি বাঁচিয়া থাকে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার ফল তাঁহাকে কালজয়ী করিয়াছে। শুধু ভারতবাসীই নহে, বিজ্ঞানানুরাগী মাত্রেই তাঁহাকে চিরদিন পরম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

বসু-সংখ্যায়নের মৌলিক প্রবক্তা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ কেবল মাত্র একজন প্রথম সারির বৈজ্ঞানিকই ছিলেন না—সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়েও ছিল তাঁহার প্রবল অনুরাগ। আমাদের দেশের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় 1943 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ বৎসরেই পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' আত্মপ্রকাশ ঘটে। তদবধি এই পত্রিকা নিরলস প্রচেষ্টায় আচার্য বসুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিবার সাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছে।

আচার্য বসুর স্বপ্ন ভাববিলাসীর কল্পনাক্ষেত্র নহে। প্রারম্ভে যাঁহারা ইহার বাস্তবতায় সন্দিহান ছিলেন, ক্রমেই তাঁহাদের সংশয়জাল ছিন্ন হইয়াছে। আজ সকলেই অনুভব করিতেছেন যে, মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রচার করা সম্পূর্ণ সম্ভব, কেবল শিক্ষিত জনগণই নহে, অর্ধশিক্ষিত অথবা সামান্য শিক্ষিত সকল স্তরের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের একমাত্র কার্যকরী মাধ্যম বাংলা ভাষা তথা মাতৃভাষা। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠা করা আচার্য বসুর একটি অবিনশ্বর কীর্তি।

আচার্যদেবের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে সর্বত্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইতেছে। আমরাও তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। আজ এই শোকমলিন মুহূর্তে আমাদের প্রার্থনা—আমরা যেন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান পরিষদ এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি।

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবনী সম্বন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁহার স্মৃতি সংখ্যায় আমাকে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিবার অনুরোধ করায় আমি বাধিত বোধ করিতেছি। তাঁহার বৈজ্ঞানিক অবদান সম্বন্ধে আমার অপেক্ষা অনেক বিজ্ঞানী বিশেষভাবে অবগত আছেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের প্রবন্ধ নিশ্চয়ই এই সংখ্যায় স্থান পাইবে। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমি লিখিতেছি। তাঁহার সহিত আমার 1909 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্সের প্রথম শ্রেণীতে সহপাঠী বিধায় পরিচয় হয়। আমরা 1909 সালে শেষ এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিই। পরীক্ষার ফলে তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই জন্ম তাঁহার নাম বিদিত ছিল। প্রথম হইতেই তাঁহার এবং অপর কয়েকজন সহপাঠীর, যথা—সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নির্বেদানন্দ নামে পরিচিত), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, পুলিনবিহারী সরকার, অমরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, নিখিলরঞ্জন সেন, প্রাণকৃষ্ণ পারিজা, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাণিকলাল দে প্রমুখ কয়েক-জন ও আমার মধ্যে প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। 1911 সালে তৃতীয় শ্রেণীতে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা আমাদের সহপাঠী হন। 1911 সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রথম স্থান, মাণিকলাল দে দ্বিতীয় স্থান, মেঘনাদ সাহা তৃতীয় স্থান, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ চতুর্থ স্থান ও প্রাণকৃষ্ণ পারিজা পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। নিখিলরঞ্জন সেন, অমরেশ চক্রবর্তী, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ইত্যাদি আরও কয়েকজনও পাশের তালিকায় উচ্চস্থান পাইয়াছিলেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশও আমাদের সমসাময়িক ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও (যিনি পরে মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন) আমাদের সহিত একই বৎসরে পাশ করেন। তিনি ঢাকা কলেজে এম. এ. পর্যন্ত পড়েন। 1915 সালের ফলিত অঙ্কশাস্ত্রে বি. এস-সি অনার্স পরীক্ষায় ও ঐ বিষয়ে এম. এস-সি পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ও মেঘনাদ সাহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। দুই জনই খুব উচ্চ মানের নম্বর পাইয়া-ছিলেন। যতদূর স্মরণ করিতে পারি সত্যেন্দ্রনাথ শতকরা 92 কি 93 নম্বর পাইয়াছিলেন। পরীক্ষকদের মধ্যে সিনিয়র র‍্যাংলার পরাঞ্জপেও ছিলেন। ইহার পূর্বে এত নম্বর আর কেহ পান নাই। এম. এস-সি পাশ করিবার পরেই সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ মিন্‌কাউস্কির বিখ্যাত রিলেটিভিটির পুস্তক অনুবাদ করেন। দু-জনেই যথাযথ থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স ও অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের জন্ম বিশ্ববিখ্যাত হন। মেঘনাদ বলিতেন, সত্যেন্দ্রনাথ যদি আরও কিছু সময় গবেষণায় দিতেন তবে আরও অনেক আশ্চর্যজনক অবদান রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ অন্য অনেক বিষয়ে আকৃষ্ট ছিলেন। বাংলা সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য ও সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি সবুজপত্রের সম্পাদক বিখ্যাত সাহিত্যিক বীরবল নামে পরিচিত প্রমথ চৌধুরীর অনুরক্ত ছিলেন ও তাঁহার নিকট যাইতেন। পদার্থবিদ্যা ছাড়া জৈব রসায়নে (অরগ্যানিক কেমিস্ট্রিতে) বিশেষ জ্ঞান ও গবে-ষণার ক্ষমতার জন্ম অনেক অরগ্যানিক কেমিস্ট্রিতে লিপ্ত অধ্যাপক এবং ছাত্র তাঁহার সহিত আলোচনা

করিয়া আমার অজ্ঞাতসারে উপকৃত হইয়াছে। তাঁহার স্বভাব মধুর ও মেজাজ ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু কোন রকম অসংলগ্ন আলোচনা করিলে বা সাধারণ বিষয়ে বেয়াড়া মন্তব্য করিলে অল্প কথায় যে ভ্রান্ত বাক্যব্যয় হইতেছে তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার সাধারণ বুদ্ধিও অসামান্য ছিল। তাঁহার অমায়িক ও মধুর স্বভাবের জন্য তাঁহাকে অনেকে শিব বলিত। আমাদের কয়েক জনের মধ্যে মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও নিখিলরঞ্জন সেন, প্রশান্ত চন্দ্র, পুলিনবিহারী ও মানিকলাল পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছেন। এখন সত্যেন্দ্রনাথও মহাপ্রয়াণ করিলেন। আমাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব ও ভালবাসা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। আমার অনুরোধে তিনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ট্রাষ্টি হইতে রাজী হন। আমরা অনেক বিষয়ে নির্বিবাদে তাঁহার সহযোগিতা পাইয়াছি। ইঁহাদের অবর্তমানে একলা বোধ করিতেছি।

আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হই, তখন পরস্পরের মধ্যে কোন আলোচনা না করিয়াই সকলে বিজ্ঞানের সেবা করিব—এই সিদ্ধান্ত করি; কারণ রামমোহন রায়ের ভারতবাসীর বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ আবশ্যকতা সম্বন্ধে লর্ড মেকলেকে লেখা চিঠি আমরা জানিতাম। স্বদেশী বয়কট ও বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার আন্দোলনের মধ্যে আমরা মানুষ হই। স্বদেশপ্রেম আমাদের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে নিবিষ্ট থাকে। জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলন ও 1900 সালের প্রথম ভাগের বিদ্রোহী আন্দোলন সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল ছিলাম ও আমাদের মধ্যে অনেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্রোহী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলাম। আমরা কেহই সরকারের কর্মচারী পরীক্ষা দিতে বা আইন শিক্ষা করিতে রাজী ছিলাম। আমরা বিজ্ঞান অধ্যাপনা ও গবেষণা করিব স্থির করিয়াছিলাম ও কাজেও তাহা করিয়াছি। আমাদের মধ্যে পাঁচ জন—সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পারিজা প্রশান্ত চন্দ্র ও আমি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি (জেনারেল প্রেসিডেন্ট) হইয়াছি। ভারতে ডেমোক্র্যাটিক শাসন ও সোস্যালিজমের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন-প্রকল্পের স্রষ্টা জওহরলাল নেহেরু প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহার বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন স্বরূপ প্রতি বৎসর বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করিতেন। প্রাণকৃষ্ণ পারিজার জেনারেল প্রেসিডেন্ট হইবার পূর্বে আমাদের চার জনের একই কলেজের সহপাঠীর জেনারেল প্রেসিডেন্ট হওয়া নেহেরুজী অভূতপূর্ব বলিয়াছিলেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশও জেনারেল প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। আমার মনে হয় আমরা সকলেই বিজ্ঞান চর্চা করিব এই সিদ্ধান্তে মনেপ্রাণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ অনেককে তাঁহার বিষয়ে শিক্ষাদান করায় এখন দেশে তাঁহার গবেষণার ধারা প্রচলিত থাকিবে। একটি বিষয়ে আমি তাঁহার বিশেষ সহযোগিতা পাই। সেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খনিজ কর্দম সম্বন্ধে আমি আমার সহকারী এবং আমার সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিজ্ঞানী গবেষণা করিয়াছি। এই খনিজ পদার্থ (ক্লে মিনারেল) বিবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমির বিশেষ উপাদান এক্স-রে ও অপর একটি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। আমি আমার একজন কৃতী যুবা বৈজ্ঞানিককে (সুবোধকুমার রায়কে) তাঁহার তত্ত্বাবধানে ঢাকায় এক্স-রে পরীক্ষা করিতে পাঠাই। অধ্যাপক কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইহাতে সহায়তা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া এই গবেষণা পরিচালনা করেন। কিন্তু সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসাই আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

তিনি আমার কয়েক মাসের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। আমার আশা ছিল তিনি আরও অনেক বৎসর জীবিত থাকিয়া দেশের ও আমাদের মঙ্গল

করিবেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার তিরোধান আকস্মিক বলিয়া ক্ষোভ হয়। তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাদের অসীম শোকে তাঁহার কৃতিত্ব ও স্বভাবমধুরতাপ্রসূত অপর অনেকেই শোকের অংশ গ্রহণ করিতেছেন ইহা জানিয়া কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি বর্ধন করিবার একটি প্রশস্ত পথ দেখাইয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কার্যকরী বিজ্ঞানের তথ্য তাহাদের দরজায় পৌঁছাইয়া দেওয়া একটি মহান জাতীয় কর্তব্য। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষিত সমাজ ও নেতাদের মধ্যে এখনও জাগরণ দেখা যাইতেছে না। জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার মাধ্যমে সরল এবং সহজবোধ্য ভাষায় কতকগুলি লেখায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের উপকার হয়—এই প্রকারের তথ্য তাহাদের দরজায় পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করা দরকার। এইরূপ লেখার বহুল প্রচলন করিলে এবং নেতা ও সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গোচরে আনিলে তাঁহাদের সাড়া ও অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে আশা করি। সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রতিষ্ঠান যাহাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় ও প্রসার লাভ করে, তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলে নেতাদের ও সরকারের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

কাছের মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ

[স্মৃতিচারণ (সত্যেন্দ্রনাথ বসু) 1894-1974]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

প্রিয়বরেষু,

আপনার অনবদ্য 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' স্মৃতিচারণটি যে আমাকে অবিমিশ্র আনন্দ দিয়েছিল, একথা আপনাকে কয়েক বৎসর আগে লিখেছিলাম। আজ আমাদের এক প্রিয় বন্ধুর স্মৃতি-তর্পণে আপনার মনোজ্ঞ উপাধিটি ধার করছি, কারণ 'কাছের মানুষ' এ-তকমাটি ছিল ললাটলনাম এ-সর্বপ্রিয় সর্বশ্রদ্ধেয় দেশিকোত্তমেরও।

আমার 'স্মৃতিচারণে' তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই ফলিয়ে লিখেছি। তার কাছে কত কি পেয়েছি দিনে দিনে আরো লেখা উচিত ছিল, কিন্তু নানা কর্মের নাগপাশে বদ্ধ মানুষ কি জীবনের তীর্থপথে তার ইচ্ছামত চলতে পারে?

সত্যেনের সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হয় প্রখ্যাত বীরবল-এর রঙিন রসচক্রে—যখন আমি সবে যৌবনে পা দিয়েছি—বোধ হয় 1915 সালে অর্থাৎ প্রায় ষাট বৎসর আগে। কিন্তু সে-অবিস্মরণীয় প্রথম পরিচয়ের দীপদীপ্তি আমার স্মৃতিমন্দিরে আজো তেমনি ঝলমল করছে।

বীরবলের রসচক্রে (Conversazione) রকমারি রসোৎসবের অভ্যুদয় হতো প্রতি শনিবারে। আসত কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। সত্যেনের বয়স তখন 21/22, আমার 18/19। সে এত সহজে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিল—দু-দিনেই তুইতোকারির তালে যে, তাকে সত্যেনদা বলতেও ভুলে গিয়েছিলাম।

যতদূর মনে পড়ে, আমি একটি মালকোষ

গেয়েছিলাম—'বন ঘন মুরলিয়া বাজে বাজে রী।' গান শেষ হতেই সত্যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে: 'আসুন ভাব করি।' তার সৌম্য মুখে কি একটা মায়া মাখানো ছিল—দেখলে ভোলা যায় না। বর্ণ—ঘনশ্যাম, সুপুরুষ বলতে যা বোঝায়, তা-ও নয়—অথচ রূপবানদের কান্তি মূর্তিও তার স্নিগ্ধ শান্ত প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিরূপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারতো না। মানুষকে সে কাছে টানতো তেমনি সহজে যেমন সহজে চুম্বক টানে আলপিনকে। পথ চলতে কাঁধে হাত দিয়ে চলা, হাসির হররায় পূর্ণ উৎসাহে দোয়ার দেওয়া, গানের আসরে প্রবুদ্ধ আগ্রহে সাড়া দেওয়া, গল্পালাপে কথায় কথায় আলো ছড়ানো, কেউ কিছু বললে একমনে শোনা, যেমন সদ্‌গুরু শোনে শিষ্যের আত্মকথা, দুঃখ পেয়ে তার কাছে গিয়ে বললে কি এক যাদুতে মুহূর্তে মনের ভার লাঘব করে দেওয়া, কোথাও যেতে চাইলে 'বহৎআচ্ছা' বলে সহযাত্রী হওয়া, কোন আসরে সভাপতি হতে বললে তৎক্ষণাৎ রাজী হওয়া, কেউ কোন বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে হাজির হলে সব কাজ ছেড়ে স্লেট-পেন্সিল নিয়ে প্রতিপাদ্যকে প্রমাণ করবার রাজপথ দেখিয়ে দেওয়া আর কত বলবো? তার কৃতিত্ব যে ছিল সর্বতোমুখ, প্রতিভা বিস্ময়কর—অথচ কি সহজিয়া! তার সঙ্গে কথালাপ করে কারুরই টের পাবার উপায় ছিল না যে, জ্ঞানের কত অচিন্ত্য ভাণ্ডারের খবর সে রাখে, শিল্পের এত গহন রসের রসিক, বহুপাঠি তার কত রকম চিন্তায় সমৃদ্ধ!

মনে পড়ে, যৌবনে একদা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—জীবন সম্বন্ধে তার কি মনে হয়—আমাদের নিয়ন্তা আমাদের কোন্ মুখে নিয়ে চলেছেন? উত্তরে সে হেসে বলেছিল: 'ভাই, নিয়ন্তার খবর আমি রাখি না—তবে এটুকু দেখতে পাই স্পষ্ট যে, কোন শক্তি প্রতি মানুষের মধ্যে দিয়েই গড়ে তুলতে চাইছেন এক একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপের ছাঁচ।' বহু বৎসর পরে মহা-মনীষী গেটের একটি কবিতায় পাই অবিকল এই বাণীটিই:

Volk und Knecht und ueberwinder
Sie gestehn zur jeder zeit!
Hoechstes Glueck der Erdenkinder
Sei nur die Persoenlichkeit

যুগে যুগে করে স্বীকার ধরায় জনে জনে—
—যে যেখানে আছে, ছোট বড় মহাজন—
সৌভাগ্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ এ-জীবনে
ব্যক্তিরূপের মধুর মঞ্জরণ।

'মধুর' বিশেষণটি আমি আরোপ করেছি বিশেষ করে সত্যেনের কথা ভেবে, যার ব্যক্তিত্বের বিকাশে আমি মাধুর্যের স্বাদ পেয়ে এসেছি দিনের পর দিন। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—মানুষ কি বলে কি করে সে-নিরিখে তার শ্রেষ্ঠ বিচার হতে পারে না, দেখতে হবে সে কি হয়ে উঠেছে। সত্যেন হয়ে উঠেছিল একটি বিচিত্র আবির্ভাব—কীর্তিমান বৈজ্ঞানিক হয়েও শিল্পজ্ঞ, বহুজ্ঞ, বিশ্বের মানচিত্রের দূরতম প্রদেশেরও সাংবাদিক। তাই উচ্চাশী বেকনের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারতো বৈকি: 'I have taken all knowledge to be my province—যা কিছু জ্ঞাতব্য আছে জানতে না পারলে আমি স্বস্তি পাই না।'

এ হলো শুধু তার জ্ঞানের দিক। সত্যেন চাইতো সর্ববিধ তৃপ্তি বইতে—সমাজের, মেলামেশার, হৃদয়ের নানা স্বপ্নের, প্রাণের নানা রংমহলের। কত রকম রঙেই যে সে তার সর্বগ্রাহী অন্তরকে রঙিয়ে তুলেছিল দেখে আমরা সবাই অবাক হতাম। একদিন দেখি সে চৈনিক বই পড়বার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে চীনদেশের জটিল আক্ষরিক সঙ্কেত আয়ত্ত করতে। গ্রিক, ফরাসী, জর্মন, সংস্কৃত—বোধহয় ইতালিয়ান ভাষারও সে কিছু চর্চা করেছিল। সে বলতো প্রায়ই—'বিশেষজ্ঞ তার নানা

গুণ জেনেও আমি চাই না শুধু একটি বিষয়েরই একতারা বাজাতে, আমার হৃদয়ের নানা তারকে বাঁধতে চেষ্টা করি নানা সুরে।' এই উচ্চাশা তার কাছে কথার কথা ছিল না। তাই সঙ্গীতের রসে নিজের অন্তরকে রসিয়ে তুলতে সে এস্রাজে নানা রাগের আলাপ করবার তালিম নিয়েছিল। কেবল এইখানেই তাকে আমি কিছু দিতে পারতাম—আর সবখানেই সে ছিল দাতা আমি গ্রহীতা। বিশেষ করে বিদেশী ভাষায় পারঙ্গম হতে চেয়েছিলাম আমি সর্বপ্রথম তার উৎসাহে, পরে শহীদ সুরাবর্দির প্রেরণায়—যে আমাদের উভয়েরই কাছে পরে রুশদেশের সংস্কৃতির নানা চমকপ্রদ তথ্য ও তত্ত্বের পরিবেশক হয়ে এসেছিল। তাকে সত্যেন কত প্রশ্নই যে করতো—মহাকথক শহীদও এমন শ্রোতা পেয়ে অনর্গল বলে চলতো। আমার মনে আছে—রোলাঁকে যখন আমি প্রথম সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে গান শুনিয়ে পটিয়ে আসি তখন সত্যেন আমাকে লিখেছিল এক উচ্ছ্বসিত পত্র যে, এ একটা কাজের মত কাজ করা হলো বটে। তারপর বিদেশ থেকে ফিরে যখন নানা বিদেশী ও বিদেশিনী বন্ধুবান্ধবীর কথা বলতাম সত্যেন ও তার পরম স্নেহাস্পদ বন্ধু নীরেন রায়ের কাছে, তখন সত্যেন পড়তো সে কি আগ্রহে তাঁদের আমাকে লেখা ফরাসী স্নেহলিপি! আমি বলতাম সকৃতজ্ঞে: 'ভাই আমি ফরাসী ও জর্মন ভাষা শিখতে উঠে-পড়ে লেগেছিলাম এ-দুই ভাষায় তোমার রস পাওয়ার এজাহারে।' আমি রোলাঁর বিখ্যাত Jean Christophe পড়া সুরু করিও মুখ্যতঃ সত্যেনেরই উদ্দীপনায়।

কিন্তু এ হলো তার ব্যক্তিরূপের একটি দিক মাত্র। তার আরো কত দিক ছিল, যা শুধু আমার নয়—তার বহু অনুরাগীর মনেও আলো জ্বালিয়েছিল উদ্বোধনের: শেখো শেখো শেখো মন দিয়ে, জানো জানো জানো প্রাণ দিয়ে, দেখ দেখ দেখ চোখ চেয়ে, শোন শোন শোন কান পেতে, কেবল আলো আলো আলো ছড়াও—সর্বোপরি ভালবাস ভালবাসাও।

আর এই আশ্চর্য ভালবাসার ক্ষমতাই আমি মনে করি তার ব্যক্তিরূপের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই এই সম্বন্ধে আর কিছু বলে ইতি করবো—যদিও তার প্রেমৈশ্বর্যের সম্বন্ধে আমি আমার 'স্মৃতিচারণে' অনেক কিছুই লিখেছি—আপনি হয়তো পড়ে থাকবেন। যতটা পারি পুনরুক্তি বাঁচিয়েই লিখবো—তবে সর্বপ্রেমিকের প্রেমের কথা এই ম্রেসরি-সামন্ত যুগে একাধিকবার বললেও ভাগবত অশুদ্ধ হবে না।

খৃষ্টদেব বলতেন: ভগবানের নাম যখন তখন নিও না যাযুরি ঢঙে। সত্যেন বোধহয় এই সাবধানবাক্যে সাড়া দিত মনেপ্রাণে। তাই সে আলাপ বা পত্রে কদাচ ভগবানের উল্লেখ করতো। অনেকে এজন্যে তাকে নাস্তিক বলেন। কিন্তু আমি জানতাম তার মন আস্তিক ছিল—যদিও ভাগবতের বৈষ্ণব বা উপনিষদদের দ্রষ্টা বলতে যা বোঝায়, তা সে ছিল না। তাই আমি তার সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি সুদীর্ঘ কবিতায় লিখেছিলাম*

নাস্তিবাদী নহ তুমি জানি আমি—কিন্তু থাক আজ।
তব শুভ জন্মদিনে এ-বৃথা বিতর্কে কিবা কাজ?
আজ শুধু চাই বন্ধু, তোমার দানের অঙ্গীকারে
তোমাকে অভিনন্দিবে স্মৃতির মঞ্জুল উপচারে।

---

*মধুমুরলী 120-121 পৃষ্ঠা

মনে পড়ে—মৃদুভাবে স্নিগ্ধ হাসি ঝরায়ে তোমার
করেছ আমার তাপ উপশান্ত তুমি কতবার।
কতবার হৃদয়ের দুঃখব্যথা তোমাকে জানায়ে
পেয়েছি নবীন আশা ভরসা তোমার স্নেহচ্ছায়ে।
কত না দ্বিধার সংশয়ের গ্রন্থি করেছ মোচন,
দিয়েছ সান্ত্বনা তব দরদী প্রবোধে ক্ষণে ক্ষণ—
সে সংবাদ জানো না তো তুমি—দাতা দিয়ে ভুলে যায় :
কৃতজ্ঞ গ্রহীতা শুধু ভোলে না— কী পেয়েছে কোথায়।…
পথ আমাদের ভিন্ন, তবু লক্ষ্য একই, অদ্বিতীয় :
সত্যের সাধনা গণি উভয়েই চিরবরণীয়।
এ-বিশ্বের নিহিতার্থ যাহা আমি জেনেছি জীবনে,
প্রতিভাত হয় যদি অন্যরূপে তোমার নয়নে—
কী বা আসে যায়? মূল প্রত্যয়ে যখন আছে মিল,
জানি—হবে আন্তরিকতার লক্ষ্যসিদ্ধি—অনাবিল
সর্বতাপহরা চিরন্তনী সুধাকরুণায় তাঁর
যাঁর জগদ্ধাত্রী কৃপা অন্তিম সম্বল সবাকার।

একদা আমার একটি চিঠির উত্তরে লিখেছিল একটি দীর্ঘ পত্রে যে, ভগবানে সে সত্যই বিশ্বাস করে, যথার্থ সাধুদের শ্রদ্ধা করে, কেবল অবতারবাদে বিশ্বাস করে না। লিখেছিল—এ-জগৎ চলেছে এক দুর্লংঘ্য নিয়মে, যে নিয়মের চাকা কোনো অবতারই ঘুরিয়ে দিতে পারেন না। দুঃখের বিষয় এ চিঠিটি আমি হারিয়ে ফেলেছি, তবে নীরেন আমাকে লিখেছিল—এর একটি কপি করিয়েছিল—সেটি আশা করি খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। পাওয়া গেলে দেখা যাবে যে, সত্যেন মনেপ্রাণে আস্তিকই ছিল, কেবল মামুলি আস্তিক নয়। অবতারবাদে সে বিশ্বাস করতো না—তার একথা আমি মনে একটুও ঘা পাই নি—যদি আমি নিজে অবতারবাদে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি—শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পূর্ণ অবতার। কিন্তু পরমহংসদেব বলতেন যে, অনেক ঋষিরাও অবতারবাদে বিশ্বাস করতেন না যদিও সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতেন: "ভগবান কি বস্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনই প্রয়োজন নেই, তাঁর সঙ্গে দেখা করো—তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানিয়ে দেবেন তাঁর স্বরূপ কি (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

কেবল একটি কথা জোর করেই বলা যায়—যে, প্রেম একটি পরম ভাগবত বিভূতি। যোগী কবি জর্জ রাসেল যেন লিখেছেন উদাত্ত ঝঙ্কারে :

When the spirit wakens
　　It will not have less
Than the whole of life
　　For its tenderness.

অন্তরতম যখন জাগে
　　রয় না তো আর স্বল্পমুখী;
গাঢ় কোমলতা—আকিঞ্চনে
　　হয় যে সে সারা বিশ্বমুখী।

স্বামী বিবেকানন্দও পেয়েছেন গভীর প্রাণময়তা মন্ত্রে: 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন—সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

এ-পরা প্রীতি জেগে উঠে বিশ্বতোমুখ হতে

পারে না ভগবানের প্রত্যক্ষ কৃপাস্পর্শ না পেলে। কিন্তু একথা বলা চলে অকুতোভয়েই যে, যে-প্রেমিকের প্রেম যত ছড়িয়ে পড়ে সে বিশ্বান্তর্যামীর বিশ্বপ্রেমের ততই কাছে আসে, কারণ এ-প্রেমের একটি অবদান দিব্যদৃষ্টি, যার বরে জীবের মধ্যে শিবকে চাক্ষুষ করা যায়। কাজেই যে শিবকে ভালোবেসেছে সে জীবের মধ্যে তাঁকে দেখে বিশ্ববাসীকে ভাল না বেসে পারে ?

সত্যেন বিশ্বপ্রেমিক হতে চেয়েছিল সত্যই যদিও এ-প্রেমের সাধনায় কতটা আপ্তকাম হয়েছিল আমি জানি না। কারণ তার শেষ কয়েক বৎসরের আন্তর ইতিহাসের আমি খবর রাখি না। কিন্তু এটুকু জানি যে, বন্ধুবাৎসল্যে তার মতন উদার সিদ্ধি এ-হিংসাদ্বেষমিথ্যাচারের কুটিল জগতে লাখে না মিলায় এক। আমাকে সে একাধিকবার বলেছিল : "কলেজে এসে ভাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ—সতীর্থদের ভালোবাসতে পারা। বিজ্ঞানের গোণাগুন্তির জ্ঞানও বরেণ্য, কিন্তু এ-ভালবাসা তার চেয়েও বড়।" আমার এ-উদ্ধৃতিকে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা নিশ্চয়ই সায় দেবেন, বলবেনই বলবেন যে, এমন হৃদয়বান মহাপ্রেমিক এ-স্বার্থান্ধ জগতে সুদুর্লভ। আমি বারবারই নানাসূত্রে উপলব্ধি করেছি যে, এই প্রেমের শক্তিই ছিল তার মহিমময় চরিত্রের মুকুটমণি। তাই আমি তার অশীতিতম জন্মদিনে লিখে তাকে পাঠিয়েছিলাম—(তার শেষ পত্রের উত্তরে : "তুমি কবে আবার কলকাতায় আসবে দিলীপ ? তুমি এলে চাঁদ হাতে আসবে।")

তোমার স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে উড়ে আসে আমার মনে,
বলি আমি : বন্ধু, তুমি আছো
ঝরিয়ে তোমার স্নেহের আলো ঘুচাতে দীন মনের কালো
এ-তৃষ্ণার্ত বেসুর বিশ্বে আছ।
সর্বসাথী হয়ে তোমার ব্যক্তিরূপের স্পর্শে অপার
আশার সুরই জাগিয়ে স্নিগ্ধ সুরে
পরকে আপন করে নিয়ে নির্বলকে শক্তি দিয়ে
টেনে আনো প্রেমের অন্তঃপুরে।
'লোকোত্তর প্রতিভা' তোমার শুনেছি তো তাই কতবার
গৌরবে যার হয়েছি গৌরবী,
যার ছোঁয়াতে কতদিনই পেয়েছি যে, আমিও চিনি
আদর্শবাদ, তাই তো আমি কবি !
নিজে কবি না হয়েও কবির গুণীর বুকে স্নেহ-
স্পর্শে দিতে সুরের উদ্দীপনা,
এ সত্য কি আমি আমার জানি নি অন্তরে—তোমার
সাড়ায় পেয়ে সঙ্গীতের প্রেরণা ?
নিশায় পেয়ে উষার আভাষ নাস্তিকদের সব উপহাস
কানে বেজেই থেমে গেছে প্রাণে,
উঠেছে বারবারই নেচে কাঁটা গোলাপরাগে সেজে
তোমার সত্য-আবাহনের গানে।

বন্ধু এ নয় কথার কথা, যে দরদী জানে ব্যথা,
তাই জানোই যে, আমি অনুরাগী
তোমার পূজাদীপ্ত মনের— যে পায় আভাস চিরন্তনের
জ্ঞানের অটল আরাধনায় জাগি।
মনে পড়ে—কোন্ সুদূরে তোমারি বাসন্তী সুরে
সুরমলয়ের নামত পুলক প্রাণে :
যদিও তুমি জানতে না তা, আমার মনে থাকত গাঁথা
তোমার বাণী আমার নানা গানে।
সৃষ্টির নয় একটি ধারা, দাতা যে—সে আপনহারা
ছন্দে করে কতই না সৃজন!
তার আলোকের জাদুবলে ঊষর জাগরণেও ঝলে
কত অচিন স্বপ্নের নন্দন!
তাইত জ্ঞানীর ধ্যানীর এত দাম জীবনে, কজন পেত
তার দেখা—যে লুটিয়ে যাবে নিতি
দুঃখদারুণ মেঘের কালোয়? আমরা তবু চাই যে আলোয়
কার আশ্বাসে? যে তার গগনগীতি
শুনেছে তার মনগহনে, তাই সে বিলায় অভয় ঋণে
তার ভরসা—রয় যে মনের পারে,
যার চরণের ধ্বনি শুনি গান গেয়ে ধায় সুরধুনী
নৃত্যে আবাহন করি দাতারে।
দিনের পর দিন দিয়েছ কত কী দান! ছড়িয়ে গেছ
কত চিন্তামনি স্ফুরৎপ্রভা,
ভাবের কণা রসে উছল, প্রীতির আদর, নীতি শ্যামল,
কত না মূর্ছনা মনোলোভা!
বিদেশী ভাষার যে মন্ত্র দিতে তুমি তাই অতন্দ্র, *
পাশ কাটিয়ে তার বয়ে দুর্নিবার
অন্ধ মোহ জাতীয়তার পেতাম ঝলক বিশ্বরমার
দীক্ষা পেয়ে বিনম্র জিজ্ঞাসায়।
তোমার গভীর মর্মতলে স্বপ্নাতীত স্বপ্ন জ্বলে,
সে-দ্যুতি যে দেখে নি—সে তোমার
জানে নি স্বরূপ অতুলন, আমি যে দেখেছি, স্মরণ
তাই করেছি তোমার সিন্ধু উদার
সত্য-স্নেহ-সাধন-উজল বিকাশকে—যে শুধু অমল
জ্ঞানের প্রেমের করেছে অর্চনা :
ছোট সুখের ধনের মানের নয় যে কাঙাল—বিশ্বরূপের
নাচদুয়ারের করে যে বন্দনা।

---

* Man muss nur in die Fremde gehen, un das Gute kennenzulernen, was man zu Hause besitzt.........(Goethe)
মানুষ বিদেশে গেলে তবেই যথার্থ দাম দিতে শেখে স্বদেশের সম্পদের।

জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধার্ঘ্য

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

ইংরেজী 1939 সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল লাহোরে, সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর (পরে সার) জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। অধিবেশনের সমাপ্তির পর প্রতিনিধিদের ভারতের সুপ্রাচীন নগরী তক্ষশিলায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল একটি স্পেশাল ট্রেনে করে। তারই একটি প্রশস্ত দীর্ঘ সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বার্থগুলিতে স্থান হয়েছিল কংগ্রেসের সভাপতি ও অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী, আচার্য সত্যেন বোস, শিশির মিত্র, স্নেহময় দত্ত প্রমুখ অন্যান্য কয়েকজন এবং আমার মত অখ্যাত ও নগণ্য প্রতিনিধির। জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তর পাঞ্জাবের দারুণ শীতের রাত্রিতে শয্যায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত প্রায় সকলেই; শুধু একজনই ভারী ওভার কোট গায়ে আসন-পিঁড়ী হয়ে বিছানায় বসে একটির পর একটি সিগারেট ধ্বংস করে চলেছেন; তিনিই আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ঐ সময়ে সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয় লুঠেরারা ভারত সরকারের ইংরেজ ও দেশীয় কর্মচারী কয়জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে তাদের জন্যে মুক্তিপণ আদায় করবার চেষ্টার কথা প্রায় প্রতি দিনই খবরের কাগজে বের হচ্ছিল এবং কেউ একজন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন যে, যদি সে রাত্রিতে ট্রেনের উপর ঐ রকম কোন হামলা হয়, তা হলে কি হবে? মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটি নামিয়ে অধ্যাপক বসু দুটি আঙুলের মধ্যবর্তী ধূমায়িত সিগারেটটিকে অধ্যাপক ঘোষের দিকে প্রসারিত করে স্মিতহাস্যে বললেন "আমরা আমাদের পালের গোদাকে দেখিয়ে বলবো, ওকে নিয়ে গিয়ে এক লাখ, দু-লাখ যা হয় দাবী করো, ঠিক পেয়ে যাবে। তারপরে পর্যায়ক্রমে আমাদের কারো মূল্য এক হাজার, কারো পঁচিশ, কারো এক-শ' দাবী করতে পার, কিন্তু তাও পাবে বলে মনে হয় না। সুতরাং প্রাণে যদি না মারো তো বছরের পর বছর ধরে বসে বসে খাওয়াতে হবে।" অধ্যাপক ঘোষ বালিশ থেকে মাথাকে একটু তুলে বললেন "বটে।" আর অন্যান্য সকলে হো হো করে সশব্দে হেসে উঠলেন।

এমনি সরস কথাবার্তা চলছে যখন, তখন কোন এক জানালার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ তীরের মত এক ঝলক কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকলো কামরার মধ্যে আর সঙ্গে সঙ্গে "হ্যাচ্চো হ্যাচ্চো" শব্দে তিন-চার জনের নাক ও মুখ দিয়ে পরপর জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরোতে লাগলো। আমি একটি বার্থের উপর কম্বলে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের রসালাপ উপভোগ করছিলাম। এমন সময়ে অধ্যাপক দত্ত একসঙ্গে কয়েকবার সশব্দে হেঁচে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন—ডাক্তার পাল এই হাঁচির মড়ক থেকে উদ্ধার করবার মত কোন ওষুধ সঙ্গে আছে কি? কিছুদিন আগে কোন বিদেশী ওষুধ কোম্পানীর কাছ থেকে Endrene নামে সর্দির ওষুধের চারটি Sample শিশি পেয়েছিলাম, তাই সুটকেসের মধ্যে সঙ্গে ছিল। বিছানা থেকে উঠে তাই বের করে তাঁর নাকের মধ্যে কয়েক ফোঁটা দিতেই তাঁর হাঁচি থামলো। ততক্ষণে ঘোষ

হয় অধ্যাপক বসুর নাকের মধ্যেও হাঁচির সুড়সুড়ি আরম্ভ হয়েছিল। তাই রুমালে একটু নাক ঘষে সানুনাসিক স্বরে বললেন 'ডাক্তার, থাকে তো আমাকে একটু দাও ওষুধ।' তখন তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর নাকের দুটি ফুটোয় ড্রপার দিয়ে কয়েক ফোঁটা ওষুধ দেবার পর তিনি কয়েক মিনিট একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আঃ ডাক্তার বাঁচালে।' বলা বাহুল্য ঐ সর্দির ওষুধের মাধ্যমেই বিশ্ববরেণ্য জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সত্যেন বোসের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আজও ছত্রিশ বছর আগেকার সে ঘটনা আমার স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে আছে।

তারপর নয় বছর পরের ঘটনা। অধ্যাপক বসু 1945-এ ঢাকা ছেড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়ে 1947 সালে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের জন্যে কয়েকজন উৎসাহী সহকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' গঠনের সিদ্ধান্ত করেন এবং খবরের কাগজ থেকে 1948-এর 21শে ফেব্রুয়ারীতে পরিষদের প্রথম অধিবেশন হবে জেনে তাতে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলাম। কারণ তার আগেও প্রায় 20 বছর ধরে ভারতবর্ষ, স্বাস্থ্যসমাচার প্রভৃতি পত্রিকায় এবং নানা সভা-সমিতিতে বাংলা ভাষায় চিকিৎসাসম্বন্ধীয় কিছু বক্তব্য লেখা ও বলবার চেষ্টা আমার ছিল নেহাৎ ব্যক্তিগতভাবে। আমাকে সভায় দেখে আচার্য বসু খুশী হয়ে বললেন—ডাক্তার এসেছো, বেশ, বেশ, এবার কাজে লেগে যাও। সেই আন্তরিক আহ্বানেই আবার আরম্ভ হলো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, কখনো পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভা, কখনো সহঃসভাপতি আবার কখনো বা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার অন্যতম উপদেষ্টা রূপে।

পরিষদের একটি স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্যে তিনি প্রথম থেকেই চেষ্টা করছিলেন এবং কখনো বা কেন্দ্রীয় সরকার, কখনো বা প্রাদেশিক সরকার আবার কখনো বা বিশিষ্ট ধনীদের এবং সকল সময়েই জনসাধারণের কাছে গৃহনির্মাণকল্পে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছিলেন অক্লান্তভাবে। তাছাড়া তিনি উৎসাহী সহকর্মীদের বলতেন কার্যকরী সমিতির সভ্যেরা অন্যূন আড়াই-শ' টাকা করে না দিলে অন্যের কাছে এই বাবদে সাহায্য চাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। কথাটি আমরা সকলেই সশ্রদ্ধচিত্তে মেনে নিলাম। কয়েক মাস পরে কার্যকরী সমিতির সভায় অনেকেই কেন প্রতিশ্রুতি পালন করে নি জানতে চাইলে আমি যখন বললাম —জমির বন্দোবস্ত হলেই আমরা নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি পালন করবো, তখনই তিনি রাগতভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন যা দিতে হবে, তা দিতেই হবে, কোন শর্তসাপেক্ষ নয়। আমি ধমক খেয়ে গতিক সুবিধার নয় দেখে চুপ করে গেলাম। সকলের মুখেই একটা অস্বস্তি ও আতঙ্কের ভাব, কারণ এরূপ রাগতভাব মাকি কেউ কখনো তাঁর বেলায় আগে দেখে নি। সুতরাং দুর্ভাগ্য আমারই।

পরদিন সকাল বেলা একটা অস্বস্তিকর রাত্রি যাপনের পর ছুটে গেলাম আচার্য বসুর বাড়ীতে। তখন তিনি বিছানায় আধশোয়া অবস্থা কি একখানি ম্যাগাজিনে পাতা উল্টেপাল্টে দেখছেন। আমি প্রণাম করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বললেন—'কিগো ডাক্তার রুদ্র, এত ভোরে কি মনে করে? তিনি আমাকে খেয়ালখুসীমত ডাক্তার পাল, ডাক্তার রুদ্র, রুদ্রেন্দ্রবাবু প্রভৃতি নানা নামে ডাকতেন। আমি মাথা নীচু করে বললাম'—অন্যায় কাজের জন্যে ক্ষমা চাইতে এসেছি। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বললেন 'কি অন্যায় করেছ যে, ক্ষমা চাইতে এসেছ?'

'কালকের মিটিং-এ আমি বেফাঁস যা বলেছিলাম, তার জন্যে।' আমার কথা শুনে তিনি হো হো করে হেসে বললেন—'আরে পাগল,

মিটিং-এ কিছু বলেছিলি হয়তো বা, তার জন্যে আমিও ধমকে দিয়েছি—সে অধিকার তো তোরাই আমায় দিয়েছিস ; মিটিং-এর সঙ্গে সঙ্গেই তা চুকে বুকে গেছে, তার জন্যে মন খারাপ করিস নে। আয় কাছে বোস' বলে বিছানার উপরই তাঁর কাছে টেনে নিলেন। আমি আবার তাঁর পায়ের ধুলা নিয়ে কাছে বসলাম, তিনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সে দিন তাঁর মুখের সে অপূর্ব হাসি দেখে আমার মনের সকল গ্লানি তৎক্ষণাৎ বিস্মৃত হয়ে গেলাম।

তাঁর সান্নিধ্যে যখনই গেছি তখনই পেয়েছি ভালবাসা ও আমার প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসের পরিচয়। বিজ্ঞান পরিষদের গৃহনির্মাণের জন্যে জমি কেনা হলো রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে, আর বাড়ী হতে চলেছে যখন, তখন তাঁরই প্রস্তাবে আমি ট্রাস্টিদের একজন মনোনীত হলাম। তাঁরই নির্দেশমত দলিল রেজেষ্ট্রি করতে এবং কর্পোরেশনের সঙ্গে ফয়সালা করতে ছুটতে হলো।

1951-এ আমি বাংলা ভাষায় লেখা "শারীরবিদ্যা" নামক পুস্তকের জন্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিংহ দাস পুরস্কার পেলে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। উপরন্তু পরিষদের রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতামালার জন্যে প্রথম তিন বছর যথাক্রমে ৺চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৺নিখিলরঞ্জন সেন ও অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের মত বিজ্ঞানের দিকপালদের পরেই চতুর্থ বক্তৃতার জন্যে তিনি আমাকেই মনোনীত করলেন 'খাদ্য ও পুষ্টি' সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্যে। ঐ বক্তৃতা পরে যখন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন আমি অনুরোধ করামাত্র তিনি তার জন্যে একটি ভূমিকাও লিখেছিলেন, যা তিনি আগে কখনও করেন নি অন্য কোন পুস্তকের জন্যে। আমার প্রতি অগাধ ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপে তা চিরদিন আমার স্মৃতিপটে জাগরূক থাকবে।

তিনি ঘরে বসেই আড্ডা দিতে ভালবাসতেন এবং পছন্দসই বড় বড় সভাসমিতিতে সময়ে সময়ে যোগ দিলেও কখনো কোন ক্লাবের হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে যেতে চাইতেন না। দক্ষিণ কলকাতার লোকের কাছে 'চক্রবৈঠক' একটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্লাব। আমি তখন তার প্রেসিডেন্ট। সভ্যেরা আমাকে অনুরোধ জানালেন, একদিন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোসকে ক্লাবে নিয়ে আসবার জন্যে। আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে যখন অনুরোধ করলাম, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন 'অতদূরে লোকের পাড়ে যাবো কিরে ? না না আমি ঐ সব ক্লাবে-টাবে যাই না।' আমি আবার বললাম 'আপনি তো বৈঠক ভালবাসেন আপনাকে যেতেই হবে, কারণ আমি ওদের কথা দিয়েছি।' শুনে একটু হেসে বললেন "তবে তো যেতেই হবে দেখছি। দেখেই আসি তাহলে তোমাদের চক্রবৈঠকে কিরকম চক্রান্ত হয়।" সম্মতি আদায়ের পর খুসীমনে আমি বললাম 'তাহলে ঐ দিন সওয়া চারটার সময়ে গাড়ী নিয়ে আমি আসবো।'

'আরে না-না, আমার গাড়ীতেই যাবো, তুমি কেন আবার দু-দুবার দক্ষিণ থেকে উত্তর কলকাতায় ছুটোছুটি করবে।'

'কিন্তু আপনি কি যথাস্থানে চিনে যেতে পারবেন ?'

"তাইতো তবে তোর বাড়ীতেই আমি আগে যাবো, কারণ বালীগঞ্জ প্লেস আমার জানা আছে, কারণ নীরেনদের বাড়ী ওখানেই। তোর নম্বর কত না ?"

'5/4, একেবারে বণ্ডেল রোডের সংখ্যের কাছেই বাঁ দিকের লাল বাড়ী', বলে আবার প্রণাম করে বিদায় নিলাম। যথাদিনে যথাসময়ে তিনি আচার্যাণীকে নিয়ে আমার বাড়ীতে উপস্থিত, তারপর পথে তাঁকে তাঁর কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে রেখে আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম চক্রবৈঠক ক্লাবে।

সেদিন কিন্তু আর ঘরে বৈঠক বসলো না, বসলো চাঁদের আলোয়, লেকের জলের ধারে চক্রবৈঠকের নিজস্ব বাগানে। এত বড় বিজ্ঞানী কিন্তু কিরকম বৈঠকী মানুষ তিনি, তার পরিচয় দিলেন আচার্য বোস সে রাত্রিতে তাঁর হাস্যপরিহাসমুখর জমজমাট আড্ডায় দীর্ঘ দু ঘন্টা ধরে। সেটা শুধু চক্রবৈঠকের পক্ষেই নয়, আমারও পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা

1974 এর প্রথম দিনটি আচার্য বসুর অশীতিতম জন্মদিন। তাই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মীরা মিলিত হয়েছিলাম নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনষ্টিটিউটের জয়ন্ত বসুর কক্ষে। স্থির হলো বিজ্ঞান পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে ঐ দিন তাঁকে একটি রূপার ফলকের উপর খোদিত একটি অভিনন্দনপত্র এবং ঐ সঙ্গে উত্তরীয় পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়া হবে। কিন্তু আমি তো 30শে ডিসেম্বর ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের কার্যকরী সমিতির মিটিং-এ যোগদানের জন্যে নাগপুরে রওনা হয়ে যাব। সে জন্যেই ঐ দিন ভোর বেলায়ই গেলাম আচার্য বসুকে প্রণাম করে তাঁর ঐ বিশেষ জন্মদিনটিতে উপস্থিত থাকতে না পারবার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করতে, আর হাতে নিয়ে গেলাম আমার সদ্যপ্রকাশিত বই 'Biology of Senescence' খানা তাঁর হাতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে। তখন তাঁর ঘরে বসেছিলো পবিত্রদা (সুসাহিত্যিক পবিত্র গাঙ্গুলী), আগরতলার একজন অধ্যাপক এবং অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক ও মহিলা। আমি প্রণাম করে জন্মদিনে উপস্থিতির অপারগতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বইখানি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললাম 'এখানে ইংরেজীতে লিখেছি বলে হয়তো আমাকে বকবেন।' বাধা দিয়ে হেসে তিনি বললেন, 'কেন বাংলাতে লিখলে কি আর ইংরেজীতে লিখতে নেই?' অবাক হলাম, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার একনিষ্ঠ প্রবক্তার মুখে ঐ কথা শুনে। তিনি বইখানা উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে বললেন 'বাংলা ভাষায় চর্চা করতে গিয়ে ইংরেজীটা এখনো ভুলিস নি দেখছি, পড়ে দেখবো এখন'।

আগরতলার অধ্যাপকটি প্রশ্ন করছিলেন, আর অনাড়ম্বর সরস ভাষায় আচার্য তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন অক্লান্তভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা। মাঝে মাঝে একটি শেষ হলে আর একটি সিগারেটে আগুন ধরাতে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ক্ষান্ত হচ্ছিলেন মাত্র। অনেক সময়েই তাঁকে দেখেছি অক্লান্তভাবে সরস ও সাবলীল ভাষায় বহুক্ষণ ধরে শুধু সাধারণ কথাই নয়, এমন কি দুরূহ বিজ্ঞানের বিষয়ও বলে যেতে, কিন্তু সহজে তিনি কাগজের উপর কলম চালাতে চাইতেন না, কেবল আঁক কষার সময় ছাড়া। সে জন্যে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে, কি নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি হিসাবে তাঁকে লিখিত ভাষণ পাঠ করতে দেখি নি। ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তাঁর বক্তব্যকে প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় লোকের কাছে বলতে দেখেছি অক্লান্তভাবে। সেদিনও তিনি তেমনি ভাবেই নানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর নিজের জীবনের নানা বিষয়ে। প্রশ্নগুলির মধ্যে ছিল তাঁর ছেলেবেলাকার ও ছাত্রজীবনের কথা, কেন তিনি বিলিতি ডিগ্রী নিতে আগে যান নি, তার সঙ্গে আইনষ্টাইন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির যোগাযোগের কথা ইত্যাদি। এরই মধ্যে একবার প্রশ্ন হলো স্বর্গীয় অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা সম্পর্কে। উত্তরে একটু হেসে তিনি বললেন 'মেঘনাদ সব সময়েই আমাকে ছাত্রজীবনে, এমন কি পরেও তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতো বটে, কিন্তু আমার মনে তেমন কোন ভাব কখনই ছিল না।' ছিল না যে, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি, যখন অধ্যাপক সাহা এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন পার্লামেন্টের সদস্যপদ

প্রার্থী হয়ে উত্তর কলকাতার এক নির্বাচনকেন্দ্র থেকে, তখন তাঁর সমর্থনে যে সকল জ্ঞানী-গুণী লোকের স্বাক্ষরিত সমর্থন-পত্র প্রচারিত হয়েছিল, তার সকলের উপরে যে নামটি জাজ্বল্যমান দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, তা আচার্য সত্যেন বোসের।

সেদিন শেষবারের মত অধ্যাপক বসুর জীবনের বহু জানা ও অজানা কথা আবার তাঁর নিজের মুখে শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেগুলি বলে শেষ করা সম্ভব নয়, কিন্তু সেগুলি চিরকালই লেখা থাকবে জীবন্ত-ভাবে তাঁর অসাধারণ জীবনের বিচিত্র আলেখ্য-রূপে। আর তারপরই চিরনিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে তাঁকে শায়িত দেখলাম বিগত 4ঠা ফেব্রুয়ারী ভোরবেলায়। মনে হলো জীবনের চেয়েও মহীয়ান 'মৃত্যুহীন' এই অনন্ত শয়ন। ছাত্র ও আমার মত প্রিয়জনের সঙ্গে সঙ্গে আমিও নিবেদন করি তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য ও প্রার্থনা করি ভগবানের চরণে তাঁর জন্যে অক্ষয় ও অনন্ত শান্তি।

মরণোত্তরে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ অমর হোন

মহাদেব দত্ত*

যে পূতাগ্নির নিষ্কম্প উজ্জ্বল শিখা বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি মানব-সংস্কৃতির বিভিন্ন সাধনার ক্ষেত্র আলোকিত করছে, মানব-সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে, দেশ ও সমাজ উন্নয়নে, মানবপ্রীতি, ভালবাসা স্থাপনে শত শত দীপ প্রজ্বলিত করেছে, সেই পূতাগ্নি 4ঠা ফেব্রুয়ারী নির্বাপিত। ওই শিখাটি অনির্বাণ হোক।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ জগতে একজন মহান বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত। 'বোস ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্' তাঁর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এজন্যে তিনি চিরস্মরণীয়। একক-ক্ষেত্র তত্ত্বে আচার্যের অবদান তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বিজ্ঞানের এই শাখা যিনিই চর্চা করবেন, তিনি আচার্যের গণিতে অসাধারণ দখল ও পদার্থবিদ্যায় গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাবেন। ছাত্রদের সঙ্গে তাপ-জ্যোতি বিশ্লেষণে তিনি যে যন্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন বিদেশেও তার স্বীকৃতি আছে। বিজ্ঞানের খুব অল্প শাখা আছে, যা তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদানে সমৃদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতায় আচার্যের নাম চিরমুদ্রিত থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞানে তাঁর সাধনাপ্রবাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে হবে যোগ্য বিজ্ঞানসাধকের একনিষ্ঠ সাধনার মধ্য দিয়ে। তিনি যা সুরু করেছিলেন, তা সুসম্পন্ন করতে হবে। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে রূপ দিতে হবে। এজন্যে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে, তাঁর জীবনসাধনাকে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

প্রত্যেক আচার্যের সাধনার তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক থাকে—জ্ঞানার্জন, জ্ঞান ভাণ্ডারের নতুন নতুন সংযোজন, অর্জিত ও নবলব্ধ জ্ঞানকে শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে সঞ্চারণ।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সাধনায় এই তিন দিক কি রূপ নিয়েছিল, কিবা তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল, তা সম্যক আলোচনা করা প্রয়োজন।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ আজীবন জ্ঞানার্জনে ব্রতী ছিলেন। তবে তাঁর পদ্ধতি ছিল অভিনব,

*ফলিত গণিতের উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-9

বহু সাধনাসাধ্য। যখনই তিনি কোন কিছু শিখতে বা জানতে আগ্রহী হতেন, তখন সেই তত্ত্বের মূলগত ধারণা কি ও তাতে কি কি প্রধানতঃ পাওয়া গেছে, তা জেনে নিয়ে মূল ধারণা থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয় নিজেই প্রমাণ করে নিতেন ও যে সব উল্লেখযোগ্য ফল ওই তত্ত্বে পাওয়া সম্ভব, তা প্রায় সবই সন্তোষজনকভাবে নিজেই পেতেন। যতদিন না তিনি নিজে সন্দেহাতীতভাবে ওই সব ফল পেতেন, ততদিন চলতো তাঁর নিরলস প্রয়াস। এজন্যে তিনি যা জানতেন, তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের আয়ত্তে থাকতো। বই বা ছাপানো প্রবন্ধে যা আছে, সেটা ঠিক হোক বা ভুল হোক তা মেনে নেবার ঝোঁক অনেক ছাত্র ও গবেষকদের মধ্যে দেখা যায়। এটা ভ্রান্ত, দূষণীয় ও জ্ঞানার্জনের পথে বিশেষ বাধা। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ নিজে না দেখে কখনো কোন বিষয় মেনে নিতেন না। এমন কি, বইতে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে হিসাবনিকাশ করে তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন না। বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়টি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে কত ভাবে পাওয়া যায়, তা নিজে দেখে নিতেন। এই কারণে তাঁর ওই সব তত্ত্বে বিশেষ দখল জন্মেছিল ও নিজের সৃজনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। আচার্য যে ভাবে নিজে শিখতেন তা এই শতাব্দীর গোড়ায় প্রসিদ্ধ গণিতাচার্য হিলবার্ট (Hilbert) সম্বন্ধে শোনা যায়। 'নোটস অন কোয়ান্টাম মেকানিক্স্' নামক বইয়ের মুখবন্ধে 'ফের্মির' এই অভ্যাসের কথা লেখা আছে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সব সময় এটা প্রত্যক্ষ করা যেত। এইভাবে জ্ঞানার্জনের অনুশীলন তরুণ ছাত্র-গবেষকদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। যদি করা যায়, তবেই সত্যেন্দ্রনাথের এই দিকটি অম্লান হয়ে থাকবে।

আচার্যের জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন নতুন সংযোজনের কথা আগেই বলা হয়েছে অতি সংক্ষেপে। তিনি কিভাবে তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন, সে বিষয়ে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে।

স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে যখন তিনি ছাত্রদের নিয়ে ক্লাস করতেন, তখন ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যেত, আলোচনার শেষ হতো না এবং এভাবেই দিনের পর দিন বা কখন কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতো। তাঁর আলোচনা চলতো প্রধানতঃ মাতৃভাষায়। যেহেতু যা তিনি শিক্ষা দিতেন তা তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিতেন, তাই নিজের মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে তাঁর কোন অসুবিধা হতো না। আর তিনি চাইতেন যে, ছাত্রদের মনোযোগ ভাষাতেই সীমাবদ্ধ না থাকে, তাদের প্রকৃতভাবে বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয় হোক। এজন্যেই তিনি বিদেশী ভাষা আলোচনার জন্যে ব্যবহার করতেন না। আলোচনার বিষয়বস্তু তাঁর নিজের গবেষণার বিষয় হোক বা না হোক, তাতে তাঁর কোন অসুবিধা হতো না। যে কোন গবেষক কোন সমস্যা নিয়ে এসেছেন এবং তিনি বুঝেছেন এই সমস্যা বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, তখনি তিনি সে বিষয়ে নিজে ভাবতে, হিসাবনিকাশ করতে সুরু করে দিতেন। এবং যতদিন না নিজের কাছে ওই সমস্যার সমাধান হতো, ততদিন তিনি এই বিষয়ে ক্ষান্ত হতেন না। তাঁর এই আলোচনা থেকে যে গবেষক এই সমস্যাটি আলোচনা করতে এসেছিলেন, তিনি তাঁর এই সমস্যার শুধুমাত্র পূর্ণ বিশ্লেষণ পেতেন তা নয়, নানাদিক থেকে নতুন আলোকপাত হতো এই সমস্যায়। সাধারণভাবে আচার্যের কাছে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করা সহজ ছিল—যে জন্যে তাঁর সম্পর্কে 'অবারিত দ্বার' কথাটি চালু হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যখন নিজের বা অন্য কোন গবেষকের সমস্যা নিয়ে ভাবছেন, তখন তাঁর কাছে গেলে শুনতে হতো—'ভাই এখন একটু এসো।' উহ্য থাকতো, আমি এখন ব্যস্ত।

এই সব দিক থেকে দেখলে আচার্য বসুর মধ্যে 'আচার্যে'র পূর্ণ আদর্শ রূপ পেয়েছিল। তিনি প্রকৃত আচার্যের একজন জলন্ত দৃষ্টান্ত। আচার্যকে আমাদের মধ্যে অমর রাখতে গেলে প্রয়োজন একটি শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, যেখানে আচার্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্র গবেষকেরা নিরলসভাবে আচার্যের প্রদর্শিত পথে আচার্যের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নিরলস বিজ্ঞান সাধনা করে যাবে। কিন্তু আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বললে তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হবে না। তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানতে গেলে, তিনি অনেক সভায় যে কথা সুস্পষ্টরূপে বলেছেন, তা স্মরণ করতে হবে। তাঁর বিজ্ঞানসাধনায় মূল প্রেরণা এসেছিল দেশপ্রেম থেকে। তরুণ বয়সে তাঁর স্বপ্ন ছিল এমন কিছু করতে হবে, যাতে দেশের গৌরব বৃদ্ধি হয়, জগৎসভায় ভারত বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। যখন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রাবস্থা, তখন বাংলার সমাজে চলেছে বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে জাতীয় আলোড়ন। তখন দেশ প্রেমী চিন্তাশীলেরা ভাবছেন কিভাবে দেশকে স্বাধীন করতে, কিভাবে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে, দেশকে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় উন্নত করে নানা শিল্প গড়ে তুলে ভারতকে সমৃদ্ধশালী করতে হবে।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সমস্ত চিন্তাভাবনা এই আদর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত ছিল। নিজের বিজ্ঞানের অবদান দিয়ে তিনি ভারতকে জগত সভায় গৌরবোজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাইলেন বিজ্ঞানকে জাতির দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। জাতির প্রত্যেক নাগরিককে বিজ্ঞান-চিন্তার সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে। বিজ্ঞানের প্রয়োগে কিভাবে দেশকে উন্নত, সমৃদ্ধশালী করা যায়, সে বিষয়ে জাতিকে সচেতন করে তুলতে হবে। তাঁর দরদী মন চেয়েছিল, বিজ্ঞানের সাধনায় তিনি যে আনন্দানুভূতি পেয়েছেন, তা সার্বজনীন হোক। এজন্যে তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা যাতে হয়, সে জন্যে নিজে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হলেন ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন করলেন। এই বিষয়ে একনিষ্ঠ কর্মীদের সংঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন। বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশ করে সাধারণের কাছে বিজ্ঞানের কথা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হলো।

পঁচিশ বছরের উপর ধরে চলেছে বিজ্ঞান পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞান পরিষদ থেকে একটি বৃহদাকারের বিজ্ঞানকোষ প্রকাশ করতে। তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞান পরিষদে এমন ব্যবস্থা থাক যে, তরুণেরা নিজেদের চেষ্টায় হাতেনাতে বিজ্ঞানের নানা যন্ত্র তৈরী করবার সুযোগ পাবে। এজন্যে বিজ্ঞান পরিষদে স্থাপিত হয়েছে তরুণদের জন্যে বিজ্ঞানের 'হাতে কলমে' বিভাগ. তিনি চেয়েছিলেন পরিষদে একটি বিজ্ঞান সংগ্রহশালা থাকবে, যেখানে নানা রকম বিজ্ঞানের সহজ মডেল থাকবে, যা ছাত্রেরা, তরুণেরা হাতেনাতে তৈরী করবে ও যা দেখে তারা হাতেনাতে কাজ করতে শিখবে। এজন্যে তিনি আরো চেয়েছিলেন একটি গ্রন্থাগার, যাতে ছাত্রেরা, তরুণেরা তাদের আগ্রহের বই, পত্রিকা পাবে। তাঁর বাসনা ছিল এভাবে বিজ্ঞান পরিষদ গড়ে উঠলে নানা স্থানে এই পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমস্ত জাতি বিজ্ঞানমুখী হয়ে সত্যই সমৃদ্ধশালী হবে।

অর্থাভাবে এবং সরকার ও জনসাধারণের আনুকূল্যের অভাবে তাঁর এই আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ রূপ পায় নি। যদি এই বিজ্ঞান পরিষদকে, তার পত্রিকাকে, তার হাতে-কলমে বিভাগকে, গ্রন্থাগারকে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রূপ দেওয়া যায়, তবেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

অবারিত দ্বার—শিখা অনির্বাণ

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়*

জীবনে যাঁর দ্বার অবারিত ছিল তাঁর শেষ যাত্রায় সকলেই ছুটে আসবেন এতে অপ্রত্যাশিত কিছু নেই। কিন্তু বহু কিশোর ও কৈশোরোত্তীর্ণকে তার মধ্যে দেখে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা আরও নত হয়ে গেছে। রাজ্যপাল ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা এসেছিলেন—তাঁরা তো অনেক বিখ্যাত লোকের মৃত্যুতেই গিয়ে থাকেন। বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রবৃন্দ, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটাদির কর্মীরা তো আসবেনই। বাংলাদেশ থেকে বন্ধুরা ছুটে এসেছিলেন দেখে দুঃখের মধ্যে মনে শান্তি পেলেও আশ্চর্য হই নি—ঢাকা তো অধ্যাপক বসুর অন্যতম স্থান—এখানেই বসু-সংখ্যায়নের জন্ম। কিন্তু এই কিশোরেরা এসেছিলেন কেন? বোধ হয় লোকমুখে শোনা তাঁর প্রতিভার প্রতি অপার বিস্ময়ে। তাঁর স্নেহ ও সহানুভূতিও হয়তো এদের কেউ কেউ পেয়েছে। অধ্যাপকের জীবিতকালে দেখেছি তিনি ঘরে শুয়ে শুয়ে অঙ্ক কষছেন—আর কয়েকটি বালক হাতে বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে তাঁর জানালায় উঁকি মেরে দেখছে। কিশোরদের এগিয়ে আসা তাঁর ছাত্র ও ছাত্রস্থানীয়দের কাছে বড়ই মূল্যবান। এই কিশোরেরা তাঁকে অনির্বাণ শিখা বলে প্রণাম জানিয়েছে। প্রবন্ধের শিরোনামার 'শিখা অনির্বাণ' কথাটি তাদেরই কথা। শোনলাম এই কিশোরের দল বলেছিল পদব্রজে সমস্ত পথ তারা যাবে। সেটা সম্ভব ছিল না—কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ বিজ্ঞান কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস অবধি পদব্রজে তারা যাত্রার সঙ্গী ছিল। আমরা সকলে এই কিশোর ও যুবকদের সবাইকে চিনি না—কিন্তু আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের প্রতি তাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা দেখে এই যুবক ও কিশোরদের মঙ্গল কামনা করি।

কিন্তু এই সমস্ত কথার চেয়েও অনেক বড় কথা ঐ 'শিখা অনির্বাণ' কথাটির মধ্যে তাদের কাছে পেয়েছি। অধ্যাপক যে দীপটি জেলে দিয়ে গেছেন, তার শিখা চিরদিন প্রজ্বলিত থাকবে। তাই এই মহাপুরুষের তিরোধানে শোক প্রকাশ অনুচিত। তবু যা উচিত তা কি সব সময় করা যায়? 22নং ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ীতে গেলে সেই সদাহাস্যময় প্রশান্ত মুখটি আর দেখতে পাব না, এই দুঃখ কে সংবরণ করতে পারেন? কখনও বা প্রিয় কোন ছাত্রতুল্যকে দেখে খাটের উপর শিশুর ভঙ্গীতে হাত দুটি ঠুকে বলেছেন 'এই যে……বাবু এসে গেছে'। তার পর হাত দুটি উপরে তুলে ডাকার ভঙ্গীতে তার নাম করে বলেছেন 'আয় আয় আয়'। এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও সারল্যের আর দেখা পাব না। তাঁর কাছে আসবার জন্যে জ্ঞানী-গুণী হবার প্রয়োজন ছিল না। অতি সাধারণ লোকও তাঁর সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা বলতে পারতো। বিজ্ঞান কলেজে পঞ্চাশ দশকের স্মৃতি ভোলবার নয়। অধ্যাপক চেয়ারে বসে মাথাটি হেলিয়ে কার সঙ্গে কথা বলছেন। একটি ছাত্র এসে একটা বিজ্ঞানের প্রশ্ন করলো—সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি অন্যদিকে হেলালেন—লম্বা লম্বা চুলগুলি এদিক থেকে ওদিকে গেল—উত্তরটাও

* ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, খড়্গপুর।

সঙ্গে সঙ্গে। প্রশ্নের উত্তরে কখনও বা বললেন 'ওরে বাবা'—তারপর একটু পরে বা তার পরের দিন উত্তরটা এসে গেল। যন্ত্রপাতি নিয়ে কখনও বা টেবিলের উপর উঠে বসেছেন। সেই ঘরটিতে ইদানীং তাঁকে বিশেষ দেখা যেত না। কিন্তু ঘরটিতে তাঁর নৈকট্য অনুভব করা যেত। আজ সে ঘরে ঢুকলে কি মনে হবে?

কিন্তু শুধু এই স্মৃতিগুলি দিয়েই তাঁকে মনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখলে চলবে না। তাঁকে মনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাঁর আদর্শ মনে রেখে। তবেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখানো হবে—তবেই শিখা অনির্বাণ থাকবে। যার পক্ষে যতটা সম্ভব আদর্শ বুঝতে হবে ও নিজ নিজ সাধ্যমত করতে হবে। তাঁর মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাদানের আদর্শ সুবিদিত। বিজ্ঞানে তাঁর আত্মপ্রত্যয় ও বৃথা প্রবন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে মূলে প্রবেশ করবার চেষ্টার আদর্শও তাঁর নিকটস্থ ছাত্রবৃন্দের অবিদিত নয়, অন্যান্য আদর্শের উল্লেখ না-ই করলাম। এগুলি দিয়েই শিখা অনির্বাণ রাখতে হবে। তাঁর বয়স্ক বন্ধু-বান্ধব ও তাঁর চেয়ে বয়সে বড় তাঁর শিক্ষক ও অন্যান্যদের সহানুভূতি ও সাহায্য এই বিষয়ে অবশ্যই পাওয়া যাবে।

দেখতে পাই অনির্বাণ শিখার কিছু যেন ইতিমধ্যেই প্রজ্বলিত হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের খণ্ড খণ্ড সংক্রমণ ঘটেছে তাঁর নিকটস্থ নানা জনের মধ্যে। বছর দুই আগের একটি ছোট ঘটনা বলি। ছুটির দিন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের বিজ্ঞান কলেজে গেছি। দেখা গেল জল নেই। জল ছাড়া বহু গবেষণার কাজ চলে না। একজন বিখ্যাত গবেষক বেরিয়ে এসে দারোয়ানদের জিজ্ঞাসা করায় তারা বললো যে, ছুটির দিন জল দিতে কর্তৃপক্ষ বারণ করেছেন। উক্ত গবেষকটি বললেন কাগজকলম নিয়ে এস, আমি লিখে দিচ্ছি, আপাতঃ আমার হুকুমেই জল দাও, পরে আমি ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বুঝে নেব। এই ভঙ্গীতে কথা বলা, গবেষণাকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা—এ তো আচার্যেরই দেখানো পথ। শুনেছি কাউকে তিনি বলেছেন—গুণী, জ্ঞানী, ধনী বহু মেলে, কিন্তু একটা 'সাহসী ভাল' লোক পাওয়া যায় না। তাঁর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে দু-একটি সাহসী লোক দেখেছি বৈকি! গবেষণা ও পাঠে তাঁর আদর্শ অনেককেই মেনে চলতে দেখেছি—বিশেষতঃ পঞ্চ দশকে দারিদ্র্য বরণ করে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন। তাঁর মত সঙ্গীত ও সাহিত্যে রসবোধসহ গণিতে সূক্ষ্ম দৃষ্টি—হয়তো তাও আছে।

তাই আজ অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে এই খণ্ডে খণ্ডে ছড়ানো ক্ষমতা ও আদর্শের উপর নির্ভর করেই যুবকদের এবং আমাদেরও চলতে হবে। হয়তো এই পথ অনুসরণ করলে আজকের কৈশোরোত্তীর্ণ ও যুবকদের কারো কারো মধ্যে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের পূর্ণ গুণরাজি যুগোপযোগী রূপে দেখতে পাব। তাঁর দ্বার অবারিত ছিল বলেই তাঁর ব্যক্তিত্ব বহু জনের কাছে প্রতিভাত—তাই একটি শিখা ছোট-বড় বহু দীপ জ্বালিয়েছে। তাই 'শিখা অনির্বাণ'—তাই 'অবারিত দ্বারের' কথা হয়তো এখানেই শেষ হবে না।

অধ্যাপককে আমরা নিজেদের মধ্যে পেয়েছিলাম—এটা যে কত বড় সৌভাগ্য, যত বয়স বেড়েছে ততই তা ভাল করে বুঝেছি। তাঁকে হারিয়ে যেন অন্য রূপে তাঁকে পেতে পারি—তাই প্রার্থনা যেন 'শিখা অনির্বাণ' থাকে।

মাষ্টার মশায়কে যেমনটি দেখেছি

(স্মৃতিচারণ)

নন্দদুলাল সেনগুপ্ত

'আঁক পেলেই কষবি'

1946 সালের গ্রীষ্মকালীন এক বৈকালে মাষ্টার মশায়ের বিজ্ঞান কলেজের ঘরে তাঁর টেবিলের পাশে খাতা-পেন্সিল নিয়ে, তাঁর সঙ্গে একটা বিষয় হাতে হাতে কষে দেখছি।' তিনিও খাতা-কলম নিয়ে গভীর মগ্ন। হঠাৎ বললেন- 'এই ভাখ কত সহজ হলো'। আমি দেখে বললাম 'সার এই differential equation এবং তার সমাধান ও সেটা নিয়ে আলোচনা তো জানা আছে'। এই বলেই বইয়ের খোঁজে যাবার জন্তে উঠছি, কিন্তু উনি চুল ধরে ফেলেছেন—'বলিস কিরে—এই সহজ অঙ্কটার জন্তে বই দেখবি!—অঙ্কটা পরিষ্কার, কষে ভাখ। তোরা যে কবে শিখবি? আঁক পেলেই কষবি।'

অভ্যাসটা রপ্ত করতে অনেক সময় ও অনুশীলনের প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে অনেকভাবে উপকৃত হয়েছি—এই উপদেশ পালন করবার জন্তে।

জবর একটা 'হাত-সাফাই' করেছি'। তাঁর হাতে তখন সিগারেট, সুতরাং ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারছি না। কাছে গিয়ে বসতেই খাতা-পেন্সিল নিয়ে দেখিয়ে দিলেন,—খুব একটা স্থানোপযোগী (Appropiate) transformation করে ঐ জটিল গণিতের সমস্যাটা একেবারে সহজ করে ফেলেছেন। আমিও এই চমৎকার সুযোগ ছাড়লাম না, প্রশ্ন করলাম—'এটা হঠাৎ কেমন করে আপনার মনে এলো?' তখন উনি ধীরে ধীরে গত দু-দিন ধরে কত রকম চেষ্টা করে সুবিধা করে উঠতে পারেন নি (ওঁর ভাষায় 'হাত-ফসকে' গেছে)। তারপর কেমন করে ঐ 'হাত-সাফাই' (Transformation)-এর প্রশ্ন আসতে পারে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—'যেটা (গণিতের সমস্যাটা) যত বেশী গোলমেলে, সেটার জন্তে তত বেশী শক্ত 'হাত-সাফাই' দরকার—বুঝলি। এগুলি কষতে কষতে হাত আসে, শুধু শুধু শক্ত বলে বসে থাকলে হবে না।'

'হাত-সাফাই'

সময়টা 1947 সাল, একেবারে গোড়ার দিকে। গণিতের একটা জটিল সমস্যা নিয়ে মাষ্টার মশায় আটকে পড়েছেন। আমাদের দু-একজনকে ডেকে ভাবতে বলেছেন। তার অর্থ এই নয়, উনি নিজে ভাবা ছেড়ে দিয়েছেন—বরং উল্টোটাই সত্য, উনি অহোরাত্র ওটা নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করছেন। আমি দু-দিন এড়িয়ে চলেছি—কারণ আমি কিছুই করতে পারি নি। পরের দিন দুপুর বেলা আমার খোঁজ পড়লো। আমি ঘরে ঢুকতেই উনি সোল্লাসে বললেন—'এই ভাখ কেমন

—সহজ উত্তর।

প্রায় বিশ বছর আগে বোম্বাইয়ের কোলাবা অঞ্চলে ওঁর এক প্রাক্তন ছাত্রের বাড়ীতে উঠেছেন। সেবার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ক্লাশে আমাকে Statistical Mechanics পড়াতে হচ্ছে। সেই সূত্রে ঐ বিষয়ের গোড়ার কথা একটু ভাবতে চেষ্টা করছি। ওঁকে পেয়েই প্রশ্ন করলাম—'সার Statistical Mechanics-এ Mechanics কতটুকু? সহজ উত্তর দিলেন—'Liouville উপপাদ্য (Theorem)।' নিজের সন্দেহটা দূর হয়ে গেল।

স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থান্তর
(Spontaneous transition)

1959 মুসৌরীতে 'summer school হচ্ছে—তৎকালীন চার্লিভিলী হোটেলের আঙিনায় বসে আছি আমরা। মাষ্টার মশায় নিজের থেকেই বললেন—"ভাখ যখন প্রথম জার্মেনীতে ছিলাম, তখন আইনষ্টাইন আমাকে একটা সহজ প্রশ্ন করে ঠকিয়ে দিতেন: আইনষ্টাইন প্রশ্ন করতেন—'ভাখো বোস, একটা কণা (Particle) বা একটা যৌগিক বস্তু (System) যদি কোন উচ্চতর শক্তির অধিকারী (Higher energy states) হয় এবং সমস্ত জগতে আর কিছুই না থাকে—তুমি কি মনে কর না সেটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নিম্নগামী (শক্তির মাপে) (Lower energy state) হবে?' তখন আমার কোন উত্তর ছিল না।—এখন সাহেবকে পেলে বলতাম—'দেখ সাহেব, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে তোমাকে জানাতে চাই—'কি হবে দেখবার জন্তে সাহেব তুমিও নেই আমিও নেই'।

[বিষয়বস্তুটা গোড়ার কথার (Foundation) দিক থেকে ভাবলে অত্যন্ত গভীর—অন্যত্র এই বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

কর্তারা (Masters) কি বলেন ?

কোন বিষয়ে জানবার বা পড়বার দরকার হলে বলতেন—'কর্তাদের (অর্থাৎ Masters), যাঁদের স্বকীয় দানে শাস্ত্র গড়ে উঠেছে, তাঁদের বই বা মূল গবেষণা-পত্র পড়'।

আমরা দু-একবার বলতে চেষ্টা করেছি—ওঁদের লেখা বেশীর ভাগ সময়েই রীতিমত শক্ত আর অনেক সময়েই পুরাতন, পড়তেও অনেক সময় লাগে। উনি বলতেন—'কোন গোলমেলে ব্যাপারের সত্যিকারের সুরাহা যদি চাও, খুঁজে বের কর—কর্তারা কি বলেন। আর যদি তাতেও সন্তুষ্টি না আসে, তবে নিজে কোমর বেঁধে লেগে যাও'।

[এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল আইনষ্টাইনকে উনি প্রায়ই 'বড়কর্তা' বলতেন।]

'বিশ্বাসে বিশ্বাস ?'

বছর দেড়েক আগে 1972 সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি। স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থান্তরের (Spontaneous transition) ব্যাপারে নিজের অনুপপত্তি মেটাবার জন্তে মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে ওঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। আমার বক্তব্য শুনে উনি ওঁর অভিজ্ঞতা জানিয়ে বললেন—'ভাখ দুনিয়ায় বেশীর ভাগ লোকই 'বিশ্বাসে বিশ্বাস' করে চলে। তুমি যদি বল তোমাদের বিশ্বাসে আমার বিশ্বাস নেই—তোমাকে পাগল বলে এক পাশ করে রাখবে, ব্যাস-মিটে গেল কের্তন। আসল কথা কি জানিস—শুধু বিশ্বাসটা নড়বড়ে বললেই বা ভাবলেই চলবে না, সেখানে নূতন শক্ত ভিত গড়বার চেষ্টা করতে হবে'।

[একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, প্রশ্নটা ওঁর তাপ-রশ্মিবিকিরণ সূত্রের (Thermal-Radiation Theory) উপর দ্বিতীয় গবেষণা-পত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আঙ্গিকভাবে জড়িত ছিল।]

'$\frac{2\pi e^2}{hc}$—fine-structure constant'

দ্বিতীয় দশকের শেষ থেকে তত্ত্বীয় পদার্থবিদেরা ভেবে এসেছেন $\frac{2\pi e^2}{hc}$— যেটা একটা সংখ্যা মাত্র (Dimension-less)—কোন সহজ এবং সাধারণ সূত্র থেকে আসবে। অনেকে এই বিষয়ে চেষ্টাও করেছেন। এই প্রসঙ্গে উনি আমাকে প্রায়ই আলোচনার মাধ্যমে বলতেন (1946-47),—"কোয়াণ্টাম বিজ্ঞান (Quantum mechanics) বিদ্যুচ্চুম্বক ক্ষেত্র (Electromagnetic field) কোয়াণ্টীকরণের (Quantize) পর কেন্দ্রীয় অংশের পরিচালকের (Operator)

গুণক পরিষ্কার ভাবে $\frac{2\pi e^2}{hc}$ হয়ে আসে। উনি এ নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন মনে হতো। আমি একদিন একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম—'স্যার! আপনি এই চলতি পদ্ধতির অর্থাৎ Hamiltonian-এর—মধ্যেই $\frac{2\pi e^2}{hc}$ খুঁজছেন, কিন্তু মূল সূত্রগুলি (Basic theories) যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ (Closed) না হয়—তবে ওর মধ্য থেকে এটাকে পাওয়া যাবে কি?' উত্তরে বলেছিলেন—'তোর কথার ঠিক প্রতিবাদ করতে পারছি না। আমারও মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, কি মনে হয় জানিস—যদি সত্যিই ওর মধ্যে থাকতো তবে বের হয়ে যেত।'

এ-বিষয়ে ওঁর দৃঢ় আস্থা উনি আমাকে বার বার বলেছেন—'$\frac{2\pi e^2}{hc}$ আমাদের প্রাকৃতিক এবং জ্যামিতিক সংযোজনা (Connectivity) থেকে আসবে। যেমন ধাখ π প্রথম পেলে তুমি বৃত্তের ব্যাস, পরিধি ও ক্ষেত্রফল থেকে—কিন্তু π-র প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা গেল—transcendental সংখ্যা হিসাবে এবং ওর মান বের করা হলো আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন পদ্ধতিতে।'

'তুরীয় অবস্থা'

কোন বিষয় বই থেকে বা মূল গবেষণা-পত্র থেকে পড়ে লেখকের বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না বা ওঁর নিজের মনোমত হচ্ছে না বুঝলেই বলতেন—'আরে ও তুরীয় অবস্থা না হলে বোঝা যাবে না।' এর সুযোগ আমি একবার বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে নিয়েছিলাম।

স্থান—বোম্বাইয়ের কোলাবায় ওঁর ঢাকার প্রাক্তন ছাত্রের বাড়ী। সকাল বেলায় এস্রাজ নিয়ে বসেছেন, ঢুকতেই বললেন—শুনবি। আমি ঐ প্রথম ওঁর বাজনা শুনি। পরে কথা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ওঠে—আমি আস্তে আস্তে তাপ-বিকিরণ সূত্রের (Thermal Radiation Theory) কথা তুলতে চেষ্টা করি—যাতে ওঁর প্ল্যাঙ্ক সূত্রের (Planck's law) উপর ওঁর গবেষণা-পত্রখানার সম্বন্ধে সুযোগ বুঝে প্রশ্ন করা যায়। ওঁর ভাল মেজাজ দেখে—কথায় কথায় বললাম—'স্যার $\frac{8\pi\nu^2 d\nu}{c^3}$ কে লোকে আগে বেশ বুঝতো ছবি এঁকে—ইথারে স্থিতিশীল কম্পন (Stationary wave) মাত্রা ইত্যাদি ভেবে—জার্মানরা গালভরা নাম দিয়েছিল—der Freiheitgrade des Äther (ইথারে স্বাধীন সঞ্চালন মাত্রা)—আপনি তো ওকে তুরীয় অবস্থায় তুলে দিয়েছেন—'Phase সেলের সংখ্যা। সঙ্গে সঙ্গে উনি উত্তর দিলেন—'আরে আরে বলিস কি! ওটাই তো মোক্ষম ব্যাপার—ওটার $\left(\frac{8\pi\nu^2 d\nu}{c^3}\right)$ ঐ নূতন অর্থ বের করবার পর ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে—phase সেলগুলিই হচ্ছে মূল কথা—এখন বন্টন (Distribution) ওদের (Phase সেলের) উপরই ভাবতে হবে। ($\frac{8\pi\nu^2 d\nu}{c^3}$ -এর নূতন ব্যাখ্যা ওঁর মূল গবেষণা-পত্রের চতুর্থ অনুচ্ছেদের শেষ অংশ মাত্র—লেখকের মন্তব্য)। সুতরাং পরের অংশটা (ঐ গবেষণা-পত্রের) শুধু আঁক কষা, যার এখনকার নাম সমবায়-সংক্রান্ত সমস্যা (Combinatorial problem)।'

বোস-সংখ্যায়নের সম্পূর্ণ নূতন ধারাতে উনি কেমন করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিলেন—সে কথা ওঁর মুখ থেকে শোনবার ইচ্ছা ছিল। অনেক দিন চেষ্টা করে পারি নি—সেদিন ওঁর কথা ওঁর মুখেই শোনলাম।

এই প্রসঙ্গে একদিন কলকাতায় (1946) বোস-সংখ্যায়ন—যাকে উনি আমাদের কাছে সব সময়ই (মাত্র একবার বাদ) Symmetric Statistics বলতেন—সম্পর্কে কথা উঠতে উনি

বলেছিলেন—new statisticsটা কি, তা জানিস —'A statistics over states !'

'বাস চলে গেছে'

1947 সালের প্রথমের দিকে, বিজ্ঞান কলেজে ওঁর ঘরে আমরা অনেকে বসে আছি। আলোচনা হচ্ছিল কোয়ান্টামবাদ (Quantam Mechanics) ও আপেক্ষিকতা বাদ (Relativity Theory) নিয়ে। আমাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করেছিল—'স্যার Schrodinger equation-এর উপযোগিতা সুদূর প্রসারিত, কিন্তু $\frac{\delta}{\delta t}$ থাকবার জন্যে এটাকে সাধারণভাবে আপেক্ষিক অপরিবর্তনশীল (Relativistic invariant) ভাবা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ ভেবে উনি উত্তর দিয়েছিলেন 'সেটা বোধহয় অসম্ভব হবে না। তোর অসুবিধা লাগলে তুই সময়ের (Time) পরিবর্তে সময়-অনুরূপ স্তর (Time-like surface) ভেবে এগুতে পারিস।'

আমাদের মধ্যে তখন কারও জ্ঞান ও চিন্তাধারা ততটা গভীর ছিল না যে, ওঁর এই উক্তির গভীর তাৎপর্য বুঝে নিয়ে সেই সূত্র ধরে অগ্রসর হবো।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, পরবর্তী কালে দেখেছি, ঠিক এই কাজটা এবং ঐ সূত্র ধরেই জাপানের তত্ত্বীয় পদার্থবিদ S. Tomonaga করেছেন, ঐ সময়ের সামান্য কিছুদিন আগে এবং এই কাজের জন্যে নোবেল পুরস্কারের অংশীদার হয়েছেন। কিন্তু জাপানী ভাষায় (1943) ওঁর (Tomonaga) গবেষণা-পত্র বা তার ইংরেজী অনুবাদ (1946), দুটিই তখন আমাদের সকলেরই অগোচরে ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ ও বোস-সংখ্যায়ন

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলেছেন। আজ তাঁর সম্বন্ধে লেখা আমার পক্ষে কি পীড়াদায়ক, তা সমূহ ব্যক্ত করা অসম্ভব। 67 বছর আগে, প্রায় বাল্যে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় ও তা এক অতুল্য অন্তরঙ্গতার পূর্ণতা লাভ করে। বাল্যপ্রণয়ের কি মহিমা, কি মাধুর্য, সে প্রণয় কখনও ক্ষীণ নিষ্প্রভ হয় না। আমি হয়েছিলাম সেই দুর্লভ রত্নের এক অধিকারী। এই বন্ধুত্ব সুরু হয় যখন আমরা উভয়েই ছিলাম হিন্দু স্কুলের ছাত্র। সত্যেন্দ্র ছিলেন আমার চেয়ে এক ক্লাস উপরের ছাত্র। কিন্তু উপর ক্লাসের ছাত্র হলে নীচের ক্লাসের ছাত্রের প্রতি যে এক অবজ্ঞার সাধারণতঃ সঞ্চার হয়, সত্যেনের তা ছিল না। যে দিন বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, সেই দিনই তিনি আমার সঙ্গে চলে আসেন আমাদের বাড়ীতে, বাগবাজারে। সেই দিন থেকেই আমার মা হয়ে গেলেন তাঁরও মা; আর আমি তাঁর সঙ্গে তাদের 22নং ঈশ্বর মিল লেনে গিয়ে তাঁর মাকে আমার মাতৃপদে বরণ করে এলাম।

আমার মত অন্তরঙ্গ তাঁর বন্ধু-সংখ্যা ছিল পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে, শতাবধি হতে পারে। তাঁর জীবনের একটা উজ্জ্বল দিকই ছিল বন্ধুপ্রীতি। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ধূর্জটিপ্রসাদ, সুধীন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য, যামিনী রায়, বিষ্ণু দে,

জীবনতারা হালদার, রাধারমণ মিত্র, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, ডক্টর বিষ্ণু মুখার্জী, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী—কত লোকের নাম করবো,—তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর অন্তর্গত। সতীর্থদের মধ্যে হলেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা, সার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ডাক্তার সুনীল বোস (নেতাজীর ভ্রাতা), মাণিকলাল দে, গৌরীপতি চ্যাটার্জী, ইত্যাদি। খাঁর বন্ধু হোক, সতীর্থ হোক পরিচিতজন হলেই তিনি তাঁকে একেবারে আপন করে নিতেন। একবার তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলে তাঁর ব্যবহারে ও মর্মস্পর্শিতায় মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না। অতি দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব—আলাপ-আলোচনায় কত সময় অতিবাহিত হয়েছে। কখনও আমি তাঁর মুখে কারুর সম্বন্ধে কোন রূঢ় মন্তব্য বা নিন্দাবাক্য বলতে শুনি নি। তিনি ছিলেন প্রকৃত অজাতশত্রু; বালকের মত স্বভাব, সাজগোজ-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উদাসীন, ধনসম্পত্তি ও সম্মানলাভ সম্বন্ধে নিস্পৃহ। তাঁর ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ীতে প্রতি শনিবার বিকেলে একটি ঘরোয়া বৈঠক হতো—আমি সুরু করেছিলাম চৌদ্দ বছর আগে। কত জ্ঞানীগুণী লোকের সমাবেশ হতো—পদার্থবিদ্, রাসায়নিক, ভূতত্ত্ববিদ্, প্রাণীতত্ত্ববিদ্, ভাষাতত্ত্ববিদ্, প্রত্নতত্ত্ববিদ্, ডাক্তার, শিক্ষাবিদ্, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, কবি, সঙ্গীতবিদ্। সকলেরই ইচ্ছা তাঁর সঙ্গে স্ব স্ব বিষয়ে কিছু আলোচনা করেন, কিছু সমস্যাভঞ্জন করে নেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি শুনতেন সকলের কথা ও তাঁদের যার যা জিজ্ঞাস্য তার সমাধান করে দিতেন। বস্তুতঃ তিনি শুধু পদার্থবিদ্ ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রায় সর্ববিষয়বিদ। এর উপর তিনি ছিলেন সুরসিক, সুলেখক, মরমী ও মানবদরদী। দানও ছিল তাঁর সংখ্যাতীত—যা থাকতো অপ্রকাশ্য। এ ছাড়া তিনি ছিলেন কাব্য ও সাহিত্যরসিক, সঙ্গীতপ্রিয়। তাঁর শিক্ষকতা ছিল আদর্শ ও অবিস্মরণীয়। তাঁর ইংরেজী ও বাংলা রচনা রসবৈশিষ্ট্যে, স্নেহগুণে ও প্রাঞ্জল্যে প্রোজ্জ্বল। তিনি যেমন জীবনের সুবৃহৎ অংশ পদার্থবিদ্যা ও গণিত শিক্ষকতায় ও গবেষণায় এবং গবেষণার প্রেরণাদানে নিয়োজিত ছিলেন, তেমনি গবেষণার জন্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি উদ্ভাবনায়ও তিনি ছিলেন পারদর্শী।

কিন্তু জীবনে তাঁর মহত্তম কীর্তি মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষাদান ও বিজ্ঞান প্রচারের প্রচেষ্টা—বলা যেতে পারে অভিযান। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গঠন আর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবন নির্মাণ তাঁর সর্বোত্তম কীর্তির নিদর্শন। জীবনের 25-26 বা 27 বছর তাঁর এজন্যে চলেছিল একনিষ্ঠ অক্লান্ত উদ্যম।

তাঁর স্কুল ও কলেজ জীবনের কিছু কথা এখানে আমি বলবো—কেন না, যে সকল গুণাবলীর কথা উল্লেখ করলাম তার অধিকাংশেরই উন্মেষ হয়েছিল সেই কালে।

বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা ও নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতার একপ্রান্ত থেকে পাড়ি দিতেন অপরপ্রান্তে পায়ে হেঁটে। বালিগঞ্জ পর্যন্ত ট্রাম-লাইন সম্প্রসারিত হয় নি, বাসও চালু হয় নি। একজন বন্ধুকে সঙ্গে এনে অপর এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন। যাঁর বাড়ী গিয়ে বসতেন তাঁর বাড়ীর সকলের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মীয়তা—ভাই বোন মা বাবা সকলের সঙ্গে। আমাদের বাড়ীতে—12নং হরলালমিত্র স্ট্রীটে এলে আড্ডা বসতো 4-5 ঘণ্টা, কখনও কখনও দিনভর, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যেতো। মা খাবার ও চা তৈরী করে এনে সকলকে খাওয়াতেন। আমাদের বাড়ীতে এলে সত্যেন সঙ্গে নিয়ে আসতেন হারিৎকৃষ্ণ দেব, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখুয্যে, হরিশচন্দ্র সিংহ প্রভৃতিকে। আমার দাদার বন্ধুরা—যামিনী রায়, হরিপদ মাইতি, হরিপ্রসাদ সান্ন্যাল ও আমাদের আত্মীয় ভূপতিভূষণ ভট্টাচার্য যোগ দিতেন। বিজ্ঞান, দর্শন,

ধর্মতত্ত্ব, সঙ্গীত, বঙ্গবিচ্ছেদ, ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ, শ্রীঅরবিন্দ, বারীন, বোমার মামলা ইত্যাদি এমন কোন বিষয় ছিল না, যা না আলোচিত হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সত্যেন আমার পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অঙ্ক প্রভৃতির বই নিয়ে বসে পড়া ধরতেন ও বুঝিয়ে দিতেন, না পারলে কষে দিতেন। হরিশ, নীরেন, ধূর্জটিপ্রসাদ, দিলীপ সকলকেই তিনি পড়াতে ভালবাসতেন। সেই সময়ে মাণিকতলা মেন রোডে কেশব অ্যাকাডেমিতে কয়েকজন দেশপ্রেমিকের চেষ্টায় যারা দিনমজুরী করে খায়, তাদের জন্যে শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রের যোগস্থাপন হয়েছিল। সত্যেন, হরিশ, নীরেন ও আমাকে জুটিয়ে নিয়ে গেলেন রাত্রে শ্রমজীবীদের পড়াতে। শিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের—এমন কি, মুটে-মজুরের উন্নতির চেষ্টা সত্যেনের সেই কিশোরকাল থেকেই মজ্জাগত।

সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণও দেখেছি আমাদের বাড়ীতে যখন আসতেন তখন থেকে। আমার দাদা পশুপতি ডাক্তার গান করতেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন,—"ওহে সুন্দর মম গেহে আজি", নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে", "কমল বনের মধুপ রাজি", "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার", "অনেক কথা কয়েছিলাম", "তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী", "সে কোন বনের হরিণ ছিল"—ইত্যাদি। তাঁর ছিল অতি সুমধুর গলা আর গান গাওয়া শিখতেন স্বয়ং কবিগুরু ও দীনু ঠাকুরের কাছে। দাদা একটা কটেজ পিয়ানো সংগ্রহ করেছিলেন। কখনও তাই বাজিয়ে, কখনও হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতেন। হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল তাঁর দু'খানি রবীন্দ্র সঙ্গীত রেকর্ড করে বাজারে ছেড়েছিল। হরিশ্চন্দ্র গান করতেন—"দাঁড়াও আমার আঁখির আগে",—"তোমার অসীমে মম প্রাণ লয়ে", "দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি", "বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই"—ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচিত ও গীতাঞ্জলির গান। একদিন সত্যেন এক এস্রাজ সংগ্রহ করে আনলেন—অনন্ত চক্রবর্তী নামে তাঁর এক বাল্য-বন্ধু যোগাড় করে দিয়েছিলেন। তাতেই—কিছু অনন্তবাবুর শিক্ষকতায়, কিছু এস্রাজ বাজানোর বই কিনে ও তাই দেখে রাগরাগিণী দুরস্ত করে ফেললেন। তার পর তাঁর মাথায় এলো নতুন কিছু রাগিণী তৈরী করতে হবে, যা বিদ্যমান রাগ-রাগিণী ভেঙে হবে না—শব্দ-শাস্ত্রসম্মত সুরের পর্দার সংযোজন করে রচিত হবে। এই ভাবে তৈরী করলেন এক রাগিণী—কিছুটা ভীমপলশ্রী ঢং-এর। আমার দাদা সেই সুরে বসানো একটি গান রচনা করে দিলেন। সেই গানও বিলুপ্ত, রাগিণীটিও বিস্মৃত। যা হোক সেই পুরনো এস্রাজটি এতাবকাল বরাবরই সযত্নে সুরক্ষিত ছিল, সত্যেন্দ্র আজীবন বাজিয়ে গিয়েছেন। এ সকল সবিস্তারে বলবার আমার উদ্দেশ্য, কিশোর জীবনে সত্যেন্দ্রের যে সব বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ হয়েছিল, পরিণত বয়সে তা পূর্ণতা লাভ করে।

সত্যেন্দ্রের অনন্যসাধারণ মেধার কথা সুপরিজ্ঞাত। স্কুল-কলেজে পাঠকালে তিনি যে বন্ধুদের বাড়ী গিয়ে এত সময় অতিবাহিত করতেন, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে, 'ক্যারাম' খেলতেন—দাবা-বোড়ে খেলাতেও খুব নেশা ছিল, তা পূরণ করতেন গভীর রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করে। বিজলী-বাতি ছিল না তখন। অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে তখন আলা হতো কেরোসিনের হ্যারিকেন লণ্ঠন। সত্যেন পড়তেন রেড়ির তেলের প্রদীপের আলোতে। প্রদীপের আলোতে পড়েই তিনি এন্ট্রান্সে পঞ্চম ও তার পর এম. এস-সি পর্যন্ত বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করেন। হিন্দু স্কুলে পড়বার সময় গণিত-শিক্ষক উপেন বক্সী মশাই আমাদের ক্লাসে একদিন আমাদের বললেন যে, উপরের ক্লাসে একজন বড় প্রতিভাবান ছাত্র

আছে, নাম সত্যেন বোস। তাকে তিনি অঙ্কের উত্তরের খাতায় 100-র ভিতর 110 দিয়েছেন; সে কয়েকটি অঙ্ক একাধিক পদ্ধতিতে করেছে বলে। আর সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎবাণী করলেন, সত্যেন কালে একজন Laplace, Cauchy তুল্য গণিতবিদ্ হবে। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম শ্রেণীর ক্লাসে লেকচারের সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে স্বীয় টেবিলের পাশে একটা টুলে বসতে দিতেন; গ্যালারিতে থাকলে তিনি নানাবিধ কুটিল প্রশ্নে অধ্যাপককে বিব্রত করবেন এই আশঙ্কায়। এখনকার শান্ত নম্র স্নেহশীল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সে সময়ে নানারকম দুষ্টামী ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছাড়া আরও দু-জন কলেজ অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সত্যেন্দ্র তাঁর অসামান্য মেধার জন্যে। একজন হলেন ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক প্যাসিভ্যাল, অপর একজন হলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।

যে সময়ের কথা আমি বলছি, সে সময়ে পড়াশোনায় যেমন তিনি ছিলেন অগ্রসর, তেমনি ছিল তার বিস্তার। সব ক্লাসেই তিনি সে ক্লাসের পড়া সম্পূর্ণ করে আগের ক্লাসের পড়াও রপ্ত করে রাখতেন। এমন কি, আগের ক্লাসের ছাত্র-বন্ধুকে পড়িয়ে তৈরী করে দিতেন। যখন তিনি সবে বি. এস-সি তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেছেন। তখন Routh-এর Particles Dynamics ও Rigid Dynamics শেষ করা হয়েছে। মেণ্ডেলিফ রচিত রসায়নের দু-ভালুম, যিনি পরমাণুর পর্যায়-সারণী রচনা করেছিলেন—পড়ে শেষ করেছিলেন। আমাদের বাড়ী যখন আসতেন তখন একদিন বললেন আমাকে, একটা টেলিস্কোপ বানানো যাক, এসো। আমি খুঁজে দুটি কুব্জপৃষ্ঠ ম্যাগনিফায়ার লেন্স কিনে আনলাম ও এক টিন-মিস্ত্রীকে দিয়ে চোঙা বানিয়ে টেলিস্কোপ খাড়া করলাম। তারা বিবর্ধন 5-6 গুণ হয়েছিল, কিন্তু লেন্স অপরিশোধিত হওয়াতে বিম্ব অস্পষ্ট দেখাতো। আর একদিন একটা পকেট ইলেকট্রিক বাতি এনে বললেন, ওর ব্যাটারীটা বিনষ্ট হয়ে গেছে, একটা ব্যাটারী তৈরী করে বাতিটা জ্বালাতে হবে। মশলা জোগাড়-পাতি করে এনে মাটির খোল বানিয়ে ব্যাটারী তৈরী করা গেল, আলোও জ্বললো, কিন্তু নিষ্প্রভ ও অল্প-স্থায়ী হলো। আর একদিন তাঁরই প্রস্তাবে পাথুরে কয়লা একটা বড় ভাঁড়ে নিয়ে খুরি ঢেকে কাদা দিয়ে লেপে ও তাতে ফুটো করে একটা কাচের নল লাগিয়ে ভাঁড়টার নীচে আগুনের জ্বাল দিয়ে কোল গ্যাস নিষ্কাশন করা গেল। তার মুখে দেশলাই জ্বেলে ধরলে গ্যাস জ্বললো। সত্যেন্দ্রের কিশোর কালের যান্ত্রিক প্রচেষ্টা—পরে তিনি যখন ঢাকায় ও কলকাতা সায়েন্স কলেজে অধ্যাপনা করতেন, তখন তাঁর স্বীয় ও সহকারীদের গবেষণার প্রয়োজনে উদ্ভাবিত ও নির্মিত যন্ত্রপাতির সূচনা করে। বিশেষ করে দুটি যন্ত্র নির্মাণের কথা আমার-জানা আছে। প্রথমটি হলো Wissen-berg ধাঁচের এক্স-রশ্মি ক্যামেরা। এই ক্যামে-রার একটা অংশ তৈরী করে দেবার ভার আমায় দিয়েছিলেন, আমার আপিসের কার-খানাতে বানিয়ে তাঁকে দি। আর একটি যন্ত্র হলো Thermo-luminescence Spectral Photometer, যেটি বিদেশে বিজ্ঞানী-মহলে খুব প্রশংসা অর্জন করেছে ও সেরূপ যন্ত্র তৈরী ও ব্যবহৃত হচ্ছে।

যখন আমি মিশ্র গণিত বিভাগে এম. এস-সি পড়ি, তখন গণিত বিভাগের একটি বিশেষ মডেল রচনায় প্রচেষ্টায় আমার একটু বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় তিনি তার একটা উপায় বাৎলে দেন: মডেলটি হলো Cylindroid-এর তল। এই তলের মডেল রচনা করে প্রান্ত দুটি জুড়তে গিয়ে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। সেই অসুবিধা দূর করবার উপায় দেখিয়ে দেন সত্যেন্দ্র। মডেলটি তৈরী করে আমার কলেজের অধ্যাপক

C. E. Cullis-এর হাতে দিলে তিনি আনন্দে অধীর হয়ে সেটি হাতে নিয়ে লেকচার কামরায় কয়েকবার পায়চারি করে নিজের চেয়ারে স্থির হয়ে বসেন ও কি করে আমি মডেলটি রচনা করি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মডেলটি প্রেসিডেন্সী কলেজের Obsesvatory ঘরের আলমারীতে রক্ষিত ছিল ও প্রত্যেক বছর ক্লাসের ছাত্রদের দেখানো হতো। এখন সেটি আছে কি নেই জানি না।

সত্যেন্দ্রের স্কুল-কলেজ দিনের কথায় ফিরে আসছি। সেই সময় থেকেই তাঁর কাব্য ও সাহিত্যে প্রবল অনুরাগ জন্মায়। রবীন্দ্রনাথের "যেতে নাহি দিব" কবিতা সম্পূর্ণ আবৃত্তি করতেন স্মৃতি থেকে। টেনিসনের 'In memorium' কবিতা ও সমস্ত 'মেঘদূত' মুখস্থ আবৃত্তি করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' থেকে পড়ে আবৃত্তি করে শোনাতেন—বধূ, পুরাতন ভৃত্য, হৃদয় যমুনা, বর্ষশেষ, সোনার তরী, স্বপ্ন—প্রভৃতি নানা কবিতা। ওঁর একটি বড় প্রিয় কবিতা ছিল 'মরণ-মিলন'; এখন কানে বাজে সে কবিতার আবৃত্তি-ঝঙ্কার—"তুমি, কারে করিও না দৃকপাত —আমি নিজে লব তব শরণ, যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও,—ওগো, মরণ হে মোর মরণ"।

আমার দাদা পশুপতি রবীন্দ্রনাথের গল্প "মেঘ ও রৌদ্র" নিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। সত্যেনকে দিয়েছিলেন পড়তে। তার দু-চার দিন পরেই আমাদের বাগবাজারের বাড়ীতে সত্যেন ও বন্ধুরা জড় হলে সত্যেন প্রস্তাব করলেন—এস হাতে লেখা একটা মাসিক পত্র বের করা যাক। নামকরণ করলেন 'মনীষা'। সত্যেন্দ্রকে আমরা সবাই সম্পাদক নির্বাচন করলাম। 'মনীষা' চার পাঁচ মাস বের হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। পরে সত্যেন্দ্র বাংলা ভাষায় যে 'বিজ্ঞান পরিচয়' পত্রিকা প্রতিষ্ঠায় অংশ-গ্রহণ করেছিলেন ও ঢাকা থেকে কলকাতা এসে 1948 সালে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা আর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করলেন, তার প্রেরণার উন্মেষ হয়েছিল সেই কিশোর কালেই।

অনেকে মনে করেন যে, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা তাঁর মহত্তম কীর্তি। আমিও তাই মনে করি। তিনি গত 26-27 বছর ধরে নিরলস সাধনায় এই দুটিকে সঞ্জীবিত রেখে ক্রমপরিণতিতে অগ্রসর করে দিয়েছেন। জগতে তিনি তাঁর উদ্ভাবিত 'বোস-সংখ্যায়নের জন্যে কীর্তিত হয়ে থাকবেন। সত্যেন্দ্র কিন্তু তাঁর কীর্তি ও সম্মানেরও উপরে স্থাপিত করেন তাঁর দেশের মঙ্গলকে। শিক্ষা বিস্তারেই রয়েছে সেই মঙ্গল সাধনার পথ, ভেদ জ্ঞান, হিংসা, দারিদ্র্য ও দৈন্য দূর করবার পথ, উন্নতির পথ। শিক্ষা ও বিজ্ঞান আপামর সাধারণের মধ্যে বিস্তার করায় তাঁর ছিল অচল আস্থা। আর সে বিস্তার সাধিত করতে হলে চাই মাতৃভাষায় সর্বস্তরে শিক্ষা ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান রচনা।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' প্রাণপ্রতিষ্ঠা সময়ের আর আর একটি ঘটনার বিবরণ এখানে আমি দিচ্ছি। ঘটনাটি পরিচয় পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

1931 সাল, বোধ হয় মার্চ-এপ্রিল মাস হবে। তখন সত্যেন্দ্র ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ। কি এক কাজে এসেছিলেন কলকাতায়। একদিন ডালহৌসি স্কোয়ারে আমার আপিসের কামরায় এক অতি প্রিয়দর্শন যুবককে নিয়ে হাজির। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হলেন সুধীন দত্ত, কবি। তুমি যেমন একদিন কবিগুরুর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করেছিলে, ইনিও তেমনি সম্প্রতি কবিগুরুর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা শেষ করে দেশে ফিরেছেন। দু-জনেই তোমরা সাহিত্য

রসিক। তোমাদের দু-জনের মিল জমবে ভাল। তোমার আপিসের পাশের কামরাতেই এরও আপিস। সুধীন একটা বাংলা ত্রৈমাসিক বা মাসিক পত্রিকা বের করতে চায়। তুমি সাহায্য করতে পারবে বলে তোমার কাছে এনেছি ওঁকে। সত্যেন্দ্র চলে গেলেন। সেদিন থেকে সুরু হলো আমার গাড়ীতে আপিসের শেষে একত্রে বাড়ী ফেরা। সুধীন্দ্রদের কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাড়ীতে সান্ধ্যযাপন করে আমি বাড়ী ফিরতাম। সুধীন্দ্র তাঁর রচিত কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। কিছু দিন পরে তিনি পাকাপাকি প্রস্তাব করলেন পত্রিকা বের করবার, আমার পরিচিত লেখকদের ডেকে আনতে বললেন এই জন্যে। প্রথমে আমি ডেকে আনলাম নীরেন্দ্রনাথকে। স্থির হলো মাসিক নয়, প্রথমে ত্রৈমাসিক বের করা হবে ও চলতি পত্রিকাদি থেকে তাকে একটা বিভিন্ন বিশেষ রূপ দেওয়া হবে। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ছাড়া সরজ করে সমালোচনা বের করা হবে—শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, তাৎকালিক বিশ্ব সাহিত্যের। আমার উপর ভার চাপালেন সমালোচনা লেখবার একটা প্রধান অংশ নেবার। নীরেন্দ্রনাথ পত্রিকার নামকরণ করলেন 'পরিচয়'। তাঁরই লেখা সম্পাদকীয়, সত্যেন্দ্রের লেখা 'বিজ্ঞানের সঙ্কট', সুধীন্দ্রের পিতা বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ, সুশোভন সরকার, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, বীরবল প্রভৃতির রচনা, প্রবন্ধ, কবিতাদি সম্বলিত হয়ে আমার আঁকা প্রচ্ছদপটে শোভিত হয়ে 'পরিচয়' আত্মপ্রকাশ করলো বঙ্গাব্দ 1338-এর শ্রাবণ মাসে। সুরু হলো পরিচয়ের জয়যাত্রা। পরিচয়ে সত্যেন্দ্র আর একটি প্রবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন, 'আইনস্টাইন' নামে 1342 বঙ্গাব্দে।

সত্যেন্দ্রের কিশোর জীবনের কথা ও সে সময়কার আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে ছেদ টানবার আগে আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করবো, যাতে তাঁর নিরহঙ্কার ও ঔদাসিন্যের আলেখ্য চিত্রিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের সংখ্যায়নের গবেষণাটি রচিত ও প্রকাশিত হয় 1924 সালে। অবিদিত নেই, রচনাটি তিনি পাঠিয়েছিলেন আইনস্টাইনের কাছে ও তিনি রচনাটির জর্মন ঘোষণা করে Zeits für Physiq-এ অনুবাদ করে ছাপিয়ে দেন। এই সুযোগে সত্যেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'-বছরের জন্যে ছুটি নিয়ে চলে আসেন ইওরোপের জ্ঞানীমহলে আলাপ-আলোচনা জমাতে। প্রথমে আসেন প্যারিসে। এদিকে আমি আগেই প্যারিসে এসে উপস্থিত হয়েছি কয়েক সপ্তাহ আগে। অভাবনীয় সৌভাগ্যক্রমে আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে কলম্বো থেকে 'হারুনা মারু' জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করি। সত্যেন্দ্র প্যারিসে আমার উপস্থিতির কথা জানতেন না। আমিও তাঁর আসবার কথা শুনি নি। 17 রু দু সমরার্দে এক মেসে ভারতীয় ছাত্রদের এক বাসকেন্দ্র ছিল। ডক্টর প্রবোধ বাগচী ছিলেন সেখানকার মুরুব্বি। তিনি আমাদের উভয়েরই জন্যে সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। পুরাতন বন্ধুকে নিকটে পেয়ে সত্যেন্দ্র ও আমার—উভয়েরই মন আনন্দে আপ্লুত হয়। অবসর হলেই আমি সত্যেন্দ্রের কামরায় ও তিনি আমার কামরায় চলে আসতেন। সত্যেন মাদাম কুরীর লেবরেটরিতে কাজ করতে সুরু করলেন। কিছুকাল তিনি লুই দ ব্রগলীর আপন গবেষণাগারেও কাজ করেছিলেন। যে দিনের ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করেছি, সে দিন আগের রাত্রি থেকে তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়ে তুষারপাত আরম্ভ হয়। সকালে উঠে বিছানা ত্যাগ করে জানালা দিয়ে দেখি রাস্তা গাছপালা, বাড়ীর ছাদ ইত্যাদি সব বরফে ছেয়ে গেছে। শিলাবৃষ্টির মত ঢেলা বরফ নয়, পেঁজা তুলোর মত ধীরে ধীরে উপর থেকে

নেমে আসে যেন হাওয়ায় ভাসছে। আমি আপন কামরা ছেড়ে সত্যেনের কামরার দরজায় এসে বেল বাজালাম। "চলে এসো ভিতরে", Entres vous, বলে তিনি সাড়া দিলেন। ভিতরে গেলে বয়কে—Garcon-কে ডেকে দু-পেয়ালা কোকো ও রোল আনতে আদেশ দিলেন। বললেন বোস, তোমায় একটা জিনিষ দেব। দেখি না দান্তের Divina Commedia পড়ছেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে জার্মান ভাষায় ছাপানো 4-5 পৃষ্ঠার আইনস্টাইন অনূদিত তাঁর গবেষণার কপি—reprint একটি আমায় দিলেন। জার্মান জানতাম না ভাল; বলতে সত্যেন সন্দর্ভটি পড়ে ইংরেজী করে দিলেন। বিষয়টি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ছিল ভাসাভাসা। তবু বোঝলাম সত্যেনের উদ্ভাবিত পদ্ধতি একটা সম্পূর্ণ নতুন, অভিনব সৃষ্টি। ছাপানো গবেষণাটির শেষে আইনস্টাইনকৃত মন্তব্য পড়ে শোনালেন, আইনস্টাইন বলছেন,—আমি মনে করি বোস-কৃত সমাধানটি আমাদের উপস্থিত জ্ঞানরাজ্য ছাড়িয়ে একটা নতুন পথ উন্মোচন করে দিল। আমি অন্যত্র দেখাবো যে, বোস-প্রদর্শিত পদ্ধতি কয়েকটি গ্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সত্যেন্দ্র আবার দান্তে পড়ায় মনোনিবেশ করলেন। আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, মহামতি আইনস্টাইন বলেছেন যে, বিজ্ঞানে উপস্থিত জ্ঞানের বাইরে এক অভিনব পদক্ষেপ,—আর তার রচয়িতা এক নিহিত গৌরব বিষয়ে একান্ত অনাসক্ত, উদাসীন! দান্তে পাঠ শেষ হলে আমি সত্যেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম প্যারিসের এক অভিজাত শ্রেণীর রেস্তরাঁয়, মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে।

কবিগুরুর সহযাত্রী হয়ে প্যারিসে এসে বিদেশে আমার পুরাতন বন্ধুলাভ হয়েছিল, তেমনি কবিগুরু তাঁর পুস্তিকা 'বিশ্ব-পরিচয়' লিখে তা সত্যেন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত করলে বইটি আমাকে পাঠিয়ে দেন তার সমালোচনার জন্যে। এই সম্মানের অধিকারী আমি নই জানলেও তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করা আমার ছিল সাধ্যাতীত। 'পরিচয়ে' 1344 বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় আমার কৃত সমালোচনাটি বের হয়।

পদার্থ-বিজ্ঞানে যে অবদানের জন্যে সত্যেন্দ্রের জগদ্ব্যাপী খ্যাতি—সেটি হলো বোস-স্ট্যাটিস্টিক্স। বাংলায় এটি বোস-সংখ্যায়ন নামে পরিচিত। গত 1লা জানুয়ারীতে সত্যেন্দ্রের অশীতিতম জন্মদিবস ও সেই সঙ্গে বোস-সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় বোস ইনস্টিটিউটে চারদিন-ব্যাপী একটি সার্বজাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কোন একটি ধর্মের অনুশাসন, দর্শন-সূত্র বা বৈজ্ঞানিক সঙ্কলন উপলক্ষে এই রকম সার্বজাতিক সম্মেলন আমাদের দেশে তো বিরল, অন্য দেশেও ঘটেছে কচিৎ কখনো। বুদ্ধ-প্রয়াণের দু-শ' বছর পরে সম্রাট অশোক প্রাচ্য দেশের বৌদ্ধ শ্রমণদের আহ্বান করে এই রকম সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেছিলেন। প্লেটো, কেপ্লার গ্যালিলিও, আইনস্টাইন প্রভৃতির সম্মানার্থে এই রকম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে কোন ক্ষেত্রে 4-5 শ' বছর, কোন ক্ষেত্রে শতাধিক বছর পরে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যেন্দ্রকে কেন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলতে শুনেছি—আমার যা পাওনা, তা আমি পেয়েছি। কি অর্থে এ কথা বলতেন ঠিক জানি না। কিন্তু এই কথা অবধারিত যে, নোবেল পুরস্কার পেলে যে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, তার চেয়ে অনেক বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছে তাঁর নামের। সে নাম কীর্তিত হবে 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকর'। মৃত্যুর দিন তাই আমি আকাশ-বাণীতে বলেছি—সত্যেন্দ্রের তিরোধানে যে শূন্যতা ও ক্ষতি হলো তা অপূরণীয়। কিন্তু তিনি সারা জগতের সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভাল-

বাসায় শীর্ষে পদার্পণ করে চলে গেলেন—এ মৃত্যু নয়, মহাপ্রয়াণ, এ অমরত্ব লাভ।

বোস-সংখ্যায়নের সহজ কথায় কি তাৎপর্য, তা বোঝাবার প্রয়াসে আমি দুটি প্রবন্ধ আগেই লিখেছি। প্রথমটি বের হয় পরিচয় পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের (1339 বঙ্গাব্দ) দ্বিতীয় সংখ্যায়, দ্বিতীয়টি বের হয় বিশ্বভারতী পত্রিকার 1364 বঙ্গাব্দের তৃতীয় সংখ্যায়। বোস-সংখ্যায়ন যাঁরা ভাল করে পড়তে, বুঝতে ও অনুধাবন করতে চান, তাঁদের আমি Science Today, Jaunary, 1974 সংখ্যা ও ডক্টর মহাদেব দত্ত রচিত 'বোস-সংখ্যায়ন', এই দুটি পড়ে দেখতে বলি। প্রথমটিতে ডক্টর বীরেন্দ্র সিং ও ডক্টর সুদর্শনের লেখা দুটি অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে, যাতে প্রাঞ্জল করে বোস-সংখ্যায়নের তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

বোস-সংখ্যায়নের এখানে একটি অঙ্কের শাসন-মুক্ত সহজ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলাম।

বিশ্ব-জগৎ আমাদের কাছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই দ্বৈতরূপে প্রকট। ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই দুয়ের ধর্ম, আচরণ এক নয়—ভিন্ন ভিন্ন। বাড়ীর ছেলে ও এক ক্লাস ছেলের আচরণ এক প্রকার নয়। এক বিন্দু জল ও কোটি কোটি জলবিন্দুতে তৈরী মেঘ বা সমুদ্রের আচরণ এক নয়। দু-একজন বা দশ-বিশ জন লোকের আর বহু লোকের জনতা বা ভিড়ের আচরণ এক নয়। যেখানে দু-পাঁচ জন একত্র হন, সেখানে উদিত হয় মিল ও সখ্যতা। কিন্তু ভিড়ে লোক হয় বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, পদদলিত—এমন কি, মৃত্যু এসে দেখা দেয়। ভিড়ের ধর্ম চাপ সৃষ্টি। বস্তুতঃ যেখানেই একের—ব্যষ্টির বদলে বহুর—সমষ্টির সমাবেশ, সেখানেই ব্যষ্টিধর্মের বদলে সমষ্টিধর্মের প্রাধান্য। টার্গেট শুটিংয়ে, তাস-খেলায়, বিশেষতঃ Flash খেলায়, বয়স অনুপাতে মৃত্যুহার নির্ণয়ে সামষ্টিক হিসাবের সার্থকতা। টার্গেট শুটিং-এ চাঁদমারির বৃত্তগুলির কোন বৃত্তে শতকরা কয়টি বুলেট গিয়ে লাগলো, তাস ও পাশা খেলায় দানের গড়পড়তা কি রকম, বয়স অনুপাতে শতকরা মৃত্যু কত—এই সবই হলো অস্থির। সমষ্টিগত হিসেবের কয়েকটির উদাহরণ দিলাম। বোস-সংখ্যায়নও এক সামষ্টিক সঙ্কলন; অবশ্য পদার্থবিজ্ঞায়।

ব্যষ্টিধর্মী বস্তুপিণ্ডের গতিবিধি নিরূপণ সূত্র রচনা করেছিলেন গ্যালিলিও ও নিউটন। এই সূত্র কতিপয় ও নিউটন উদ্ভাবিত ক্যালকুলাস গণিত প্রয়োগ করে নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা যায় রাইফেল থেকে ছোঁড়া বুলেট পৃথিবীর আকর্ষণে টিপের বিন্দু থেকে বিচ্যুত হয়ে কোথায় গিয়ে লাগবে। এই রকম—এও নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা যায় গ্রহগুলি একটা নির্দিষ্ট কাল পরে আকাশে কে কোথায় অবস্থান করবে। জোয়ার-ভাটা ও ধূমকেতুদের পুনঃপ্রত্যাবর্তনের সময়াদিও নির্ভুলভাবে কষে বের করা যায়। চাঁদে ও বিভিন্ন গ্রহে যে সকল মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে, তাদের যাত্রাপথের ও সময়ের হিসাব-নিকাশ করা হয়েছে নিউটন সূত্রাদি অবলম্বনে। কিন্তু পদার্থবিদদের কাছে সমস্যা দেখা দিল গ্যাস নিয়ে। গ্যাস হলো কোটি কোটি অণুর সমাবেশ। গ্যাসের আচরণ কি অণুগুলির আচরণ নিরূপণ করে তাদের যোগ বিয়োগ করে বের করা হবে? অসম্ভব। গ্যাসের চাপ ও তাপ হলো অণু-সমষ্টির গতি-ভরঘটিত ও চলৎ-শক্তিঘটিত সামষ্টিক অঙ্ক। সমষ্টি হওয়ায় এই দুটি প্রকট, নয়তো একক অণুর চাপ বা তাপ অর্থহীন। গ্যাসের আর একটি অস্থির হলো কোন আধারস্থ গ্যাস অণুদের গত্যঙ্কের অনুপাত—Distribution। এই গত্যঙ্কানুপাত নিরূপণে ম্যাক্সওয়েল পত্তন করলেন তাঁর সুবিখ্যাত সামষ্টিক সূত্র। নিউটনের যেমন ব্যষ্টিক সূত্র, ম্যাক্সওয়েলের তেমনি সামষ্টিক সূত্র। পূর্বেই

আমি বলেছি পদার্থজগৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টি—এই দ্বৈতরূপে প্রকট। এখন পদার্থের গতিবিধির আচরণ নির্ণয়ে পাওয়া গেল গতিশাস্ত্রের ব্যষ্টি গণিত ও সমষ্টি গণিত।

কিন্তু এতেও সমস্যার সমাপ্তি হলো না। উনিশ শতকের শেষে, বিশ শতকের গোড়ায় পদার্থবিদ ব্যস্ত হলেন বিকিরণের (Radiation) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুপাতে শক্তি বা দীপ্তির বণ্টন—হার বের করতে। Boltzman, Gibs, Rayleigh, Jeans প্রভৃতি ধুরন্ধরেরা নিযুক্ত হলেন এই কাজে। নানা সূত্র প্রস্তাবিত করলেন তাঁরা; কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে গরমিল দেখা দিল। 1900 সালে প্ল্যাঙ্ক একটি সূত্র প্রণয়ন করলেন, যা কার্যক্ষেত্রে ঠিক মিলে গেল। এটি প্রণয়নে প্ল্যাঙ্ক একটি প্রকল্প স্থাপন করলেন যে, বিকিরণ নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ নয়, বিকিরণ একরকম কণিকা-সমষ্টি; পদার্থ-কণিকা নয়—শক্তি-কণিকা, নাম দিলেন Quanta। কোয়ান্টাম প্রকল্পের সাহায্য নিয়ে তিনি যে পদ্ধতিতে তাঁর সূত্রটি খাড়া করলেন, তা ছিল তাত্ত্বিক আচারপুষ্ট, সুতরাং আপত্তিকর। পদার্থবিদেরা ও স্বয়ং আইনস্টাইন চেষ্টা করলেন প্ল্যাঙ্ক-সূত্রকে আচারনিষ্ঠ করে দাঁড় করাতে। কিন্তু তা ঠিক মত হলো না। অবশেষে 1924 সালে প্ল্যাঙ্ক সূত্র প্রতিষ্ঠার সত্যেন্দ্র যে অবপাত করলেন, আইনস্টাইন ও পদার্থবিদেরা সর্বস্বীকৃতভাবে তাকে স্বীকৃতি দিলেন, একবাক্যে তার জয় ঘোষণা করলেন। সত্যেন্দ্রের অবশ্য প্রাথমিক ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্ল্যাঙ্ক সূত্র প্রতিষ্ঠা। কেননা, এই সূত্রটি কার্যক্ষেত্রে হুবহু মেলে; আর কোয়ান্টাম প্রকল্পের ধ্রুবত্ব প্রমাণিত করেছিলেন আইনস্টাইন 1905 সালে, photo-electric effect থেকে। ফলে প্ল্যাঙ্ক সূত্র তো সুপ্রতিষ্ঠিত হলোই, সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন সংখ্যায়নের উৎপত্তি হলো। প্ল্যাঙ্ক ও অন্যান্য পদার্থবিদদের মত কষ্টকল্পনা ও বিপথ অনুসরণ না করে প্রাথমিক বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোক-কণিকা—light quanta-র জন্যে একটি নতুন সংখ্যায়ন উদ্ভাবন করলেন। সেই সংখ্যায়ন প্রয়োগে নিষ্কাশিত হলো প্ল্যাঙ্ক সূত্র। এই নূতন স্বপ্রতিষ্ঠিত সংখ্যায়নই পদার্থ-জগতে বোস-সংখ্যায়ন (Bose-Statistics) নামে বিখ্যাত। আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রের গবেষণাটি পড়ে বললেন যে, নতুন পদ্ধতিটি শুধু কোয়ান্টা নয়, অন্যান্য কণিকা—সমষ্টিতেও লাগানো যায়—যে হিলিয়াম গ্যাসেও, তা তিনি অন্যত্র দেখাবেন। পদার্থবিদ্যায় একটা নতুন পথ উন্মুক্ত হলো, নতুন রাজ্যে প্রবেশ করবার। অনেক নব নব কণিকার দল পদার্থবিদদের দ্বারে এসে আঘাত হানছিল। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, ডয়টেরন প্রভৃতি, তাছাড়া নৈসর্গিক কণিকারা—যেমন, π-মেসন প্রভৃতি। পদার্থবিদেরা দেখলেন সকল কণিকাই একমাত্র বোস-সংখ্যায়ন অনুবর্তন করে না। বোস-সংখ্যায়ন প্রণয়ন করবার সময় সত্যেন্দ্র লক্ষ্য করলেন যে, আলোক কোয়ান্টারা অভিন্ন, একটিকে অপর থেকে পৃথক করবার উপায় বা চিহ্ন নেই। ভিন্ন-ভিন্ন কোয়ান্টার চিহ্ন থাকলে তাদের ভিন্ন প্রকোষ্ঠে স্থান দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। আলোক-কোয়ান্টার ক্ষেত্রে সে সুযোগ অবর্তমান। পরে পদার্থবিদেরা দেখলেন যে, অন্যান্য কণিকার বেলায়—যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভেদ চিহ্ন আছে। সে হলো, spin বা ঘূর্ণী। সকল কণিকাদেরই গতি ও আবর্তন ছাড়া ঘূর্ণী আছে। তা আবার দু-রকমের, জোড় সংখ্যার ও বিজোড় সংখ্যার। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পর ডিরাক ও ফের্মি কণিকাদের জন্যে আর একটি সংখ্যায়ন প্রণয়ন করলেন,—নাম হলো ফের্মি-ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স। ফলে দাঁড়ালো আলোক-কোয়ান্টা—যার কোন স্পিন নেই বা শূন্যস্পিন ও জোড়স্পিন সমন্বিত কণিকারা বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে। যাদের বিজোড় স্পিন তারা মেনে চলে ফের্মি-ডিরাক

সংখ্যায়ন। বহু সংখ্যক আদিম কণিকা পদার্থবিদেরা আবিষ্কার করেছেন, তাদের একত্র করে এক বিরাট পদার্থ-জগতের উদ্ভব হয়েছে আজ। বোস-সংখ্যায়ন ও ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন তাদের জন্যে প্রকৃষ্ট বিধি-বিধান সূত্র উপহার দিয়েছে।

এই কথা আজ নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, গ্যালিলিও, নিউটন, ম্যাক্সওয়েল, নীলস বোর, অগ্রণী প্রভৃতি সমপর্যায়ে কীর্তিত হবে সত্যেন্দ্রের নাম।*

পরিশিষ্ট

যাঁরা আইনষ্টাইন অনূদিত বোসের মূল গবেষণা দুটি ও স্বদেশী ও বিদেশী বিখ্যাত পদার্থবিদ কর্তৃক রচিত গাণিতসম্বলিত সংকলন বা ভাষ্য পাঠ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের সুবিধার্থে নীচে কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেওয়া গেল :—

1. S. N. Bose 70th Birthday Commemoration Volume, part, 1.

(i) "Plancks Gesetz und Lichtquanten hypothese"

(ii) Warmegleichgewicht Im Stralungsfeld Bei Anwesenheit Von Materite.

2. A Text Book of Heat: By M. N. Saha D. Sc ; F. R. S and B. N. Srivastava, M. Sc ; Allahabad University—1931

Bose Statistics of Photons in a Blackbody Chamber. Chapter XIII

3. Wave Mechanics and Quantum Theory : By Arthur Haas ; Ph. D. Prof of Physics, Vienna University.

The Quantum Statistics of Bose ; Chapter XIII

4. The Physical Significance of the Quantum Theory : By Lindemann, M. A ; D. Phil ; F. R, S. Prof. of Experimental Philosophy ; Oxford University, Clarendon Press ; 1932

The Einstein-Bose Statistics, Chapter VI

* একটা কথা উঠেছে যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহা বোস-সংখ্যায়ন প্রণয়নে ইঙ্গিত বা প্রেরণা দিয়েছিলেন। বন্ধুবর সত্যেনের মুখে আমি যা শুনেছি জানাচ্ছি। ঢাকায় সত্যেন্দ্র থাকাকালীন মাঝে মাঝে ছাত্রদের পরীক্ষা উপলক্ষে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে মেঘনাদের সাক্ষাৎ হতো। হলে তাৎকালিক পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যাদির আলোচনা হতো। পাউলি উদ্ভাবিত নতুন তথ্য Pauli's system নিয়ে আলোচনাকালে একদিন মেঘনাদ সত্যেন্দ্রকে বলেছিলেন—প্ল্যাঙ্ক সূত্রকে পাঁক থেকে উদ্ধার করে স্বপ্রতিষ্ঠিত একটি উপায়ে কেন দাঁড় করানো যাবে না, স্বনির্ভর কোন সংখ্যায়নের ভিত্তিতে। এই চ্যালেঞ্জ সত্যেন্দ্র গ্রহণ করেন ও তাঁর সংখ্যায়ন উদ্ভাবন করেন। স্বয়ং মেঘনাদ সাহার মুখে ঠিক একই কথা আমি শুনেছি। জ্যোতির্বিদ হেলি নিউটনকে বলেছিলেন—কেপলার প্রদর্শিত গ্রহদের যে উপবৃত্ত পথে গতি—তার মূলে সূর্যের আকর্ষণের কি সূত্র আপনি বলতে পারেন? নিউটন বলে দিলেন। মেঘনাদের সত্যেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ ঠিক সেই রকম।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মরণে

অসীমা চট্টোপাধ্যায়*

পয়লা জানুয়ারী বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অশীতিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সারা বাংলাদেশে—সারা ভারতবর্ষে কি আনন্দের প্লাবন বয়ে গেল। শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে শতসহস্র দেশবাসী—আবালবৃদ্ধবনিতা সূর্যোদয়ের আগেই তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত হয়েছিল। অশীতিবর্ষের বিশ্ববিখ্যাত মানবদরদী জাতীয় অধ্যাপককে তারা অসংখ্য ফুলের মালা আর ফুলের তোড়া দিয়ে পরমশ্রদ্ধা জানিয়ে গেল। গায়ে সাদা শাল, পরনে সাদা পায়জামা। তিনি ছিলেন খাটের উপরে বসে আর সকলকে জানাচ্ছিলেন সম্ভাষণ। মুখে তাঁর সরল হাসি। সমবয়স্কদের জানাচ্ছিলেন প্রীতি ও শুভেচ্ছা, ছাত্র-ছাত্রী—কিশোর-কিশোরীদের করছিলেন আদর আর বুকভরা আশীর্বাদ, যেমন তপোবনের মহর্ষি। আটই জানুয়ারী পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত অবদান 'বোস-সংখ্যায়ন'-এর 50 বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সেই সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এলেন এবং বললেন—'বিশ্ব-বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আমি আজ এত সমাদর পেলাম। আমার মনে হয় আমার বাঁচবার আর প্রয়োজন নেই।' তিনি সত্যই বুঝেছিলেন যে, তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন সমাগত। দিন কুড়ি পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় 31শে জানুয়ারী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি কত আশীর্বাদ করলেন—মাথায় হাত বুলালেন। তখন কিন্তু সত্যই বুঝি নি তিনি চার-দিন পরেই আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নেবেন।

4ঠা ফেব্রুয়ারী তাঁর তিরোধানের সংবাদে সমগ্র দেশ শোকে অভিভূত হয়ে পড়লো। চারদিকে এক গভীর শোকের ছায়া নেমে এলো। দেশের জন্যে, দেশবাসীর জন্যে নিজেকে আহুতি দিয়ে তিনি অন্তর্হিত হলেন, বিনিময়ে তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে কিছুই নিলেন না।

এই মহামানবের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগসূত্রে আসবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল 1939 সাল থেকে। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। আমি রসায়নশাস্ত্রে এম. এস.-সি পাশ করে বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করি। অধ্যাপক বসু তখন মাঝে মাঝে পরীক্ষার ব্যাপারে ও নানাকাজে বিজ্ঞান কলেজে আসতেন। রসায়ন শাস্ত্রের উপর তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। শুধু অনুরাগই নয়—তাঁর যথেষ্ট অবদানও আছে এই বিজ্ঞানশাস্ত্রে। এছাড়া সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও অন্যান্য কলাবিদ্যায় তাঁর গভীর জ্ঞান ও অনুরাগ ছিল। এস্রাজ বাজাতেন অপরূপ। তাঁর এস্রাজ শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল অনেকবার। আমি যে ঘরে কাজ করতাম সেখানে এসে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকতেন। আমার কাজের সম্বন্ধে আলোচনা করতেন এবং নানাভাবে আমার কাজের সাহায্য করতেন। একদিনের একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। একটা পদার্থের রাসায়নিক সংশ্লেষণের জন্যে আমার 'ট্রিপ্‌টোফ্যান' দরকার হয়। অথচ সংশ্লেষণটি না করতে পারলে আমার ডি. এস-সির থিসিস হবে না। এমত অবস্থায় আমি অধ্যাপক বসুকে বললাম:—'ট্রিপ্‌টোফ্যান না হলে কাজ আর হবে না।

* বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

তিনি বললেন, 'বোধ হয় আমার ঢাকার গবেষণাগারে ট্রিপ্টোফান আছে। থাকলে আমি তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেব।' দিন কয়েকের মধ্যে তিনি ঢাকা ফিরে গেলেন এবং তাঁর ফেরবার সাতদিনের মধ্যেই আমি ঐ রাসায়নিক পদার্থটি রেজিষ্টার্ড পোষ্টে পেলাম। দিন কয়েকের মধ্যে আমার থিসিসের কাজ সমাপ্ত হলো। আমার কাজের এই সাফল্যে তিনি এত আনন্দ পেয়েছিলেন যে, তা বলবার নয়। পরে তিনি যখন রাজা-গুরুপ্রসাদ সিং খয়রা-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়ে ঢাকা থেকে কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে এলেন 1945 সালে, তখন তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। তাঁর ঘরের আর আমার ঘরের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র একটা দালান। আমার কাজে তিনি যে কত অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তা বলবার নয়। এরপর অনেক দিন কেটে গেল।

1947 সালে মার্কিন দেশে যাত্রার প্রাক্কালে আমি তাঁর কাছে আমার ঘর ও যাবতীয় জিনিষ জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। তিনি তখন সায়েন্স ফ্যাকালটির প্রেসিডেন্ট। দেশে ফিরে দেখলাম তিনি আমার সমস্ত জিনিষ সযত্নে রেখে দিয়েছেন। আমার অনুপস্থিতিতে অনেকেই আমার ঘরটি দাবী করেছিলেন। কিন্তু তিনি সকলকেই বলেছিলেন, 'দেখো বাবা, মেয়েটা বিশ্বাস করে ঘরটি জমা দিয়ে গেছে। আমি কেমন করে ঘরটা হস্তান্তর করি।' ঘরটি না থাকলে বিজ্ঞান কলেজে আর আমার গবেষণা করা সম্ভব হতো না। 1951 সালে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে এমেটিন বিসমাথ আইয়োডাইড তৈরী করবার জন্যে অনুরোধ আসে। তখন এই রাসায়নিকটির দাম ছিল প্রতি পাউণ্ড এক হাজার টাকা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রসায়ন বিভাগের কর্মকর্তারা এই ব্যাপারে কোন আগ্রহই দেখালেন না এবং একটু জায়গাও দিলেন না। অধ্যাপক বসু তখন বললেন—'ঠিক আছে, মাঠে একটা সেড তৈরী করে দিচ্ছি, সেখানে অসীমা কাজ করবে।' তাঁর এই কথা শুনে এক অধ্যাপক তাঁর একটি খালি ঘর কিছু দিনের জন্যে ছেড়ে দিলেন এবং তার ফলে 50 পাউণ্ড এমেটিন তৈরী করা সম্ভব হলো।

বিজ্ঞান কলেজে থাকাকালীন বহু ঝড়ের সম্মুখীন আমি হয়েছি। কিন্তু অধ্যাপক বসু সকল সময়েই তাঁর পক্ষপুটে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। 1967 সালে অগাষ্ট মাসে আমি পিতৃহীনা হলাম, আর তার ঠিক চার মাস পরে আমার স্বামী চিরদিনের জন্যে বিদায় নিলেন। এই মর্মান্তিক দুঃখের দিনে তিনি পিতার স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি তাঁর অপার পিতৃস্নেহে আমায় মানসিক শান্তি দিয়েছেন।

তাঁর কাছ থেকে প্রগাঢ় স্নেহ পেয়েছি, পেয়েছে আমার মেয়ে। আমার স্বামীও সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন নি। তাঁর সঙ্গে সকলের এক অদ্ভুত আত্মিক যোগ ছিল। তাই সকলকে তিনি আপন করে নিতে পারতেন। তিনি সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পুত্র-কন্যার মত ভালবাসতেন। সামান্য পিয়ন, বেয়ারাদের জন্যে তিনি কত চিন্তা করতেন—তাদের দুঃখকে অনুভব করে তাদের অন্ন সংস্থানের জন্যে তিনি কত ব্যস্ত হয়ে পড়তেন যেন তাঁর আপন প্রিয়জন। বিজ্ঞান কলেজের প্রতিটি ধূলিকণা আজ তাঁর অভাব অনুভব করছে—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সর্বোপরি মাতৃভাষার প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জনসাধারণকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে না পারলে, কারিগরী শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যায় তাদের শিক্ষিত করতে না পারলে তারা তাদের অন্ন জোটাতে সক্ষম হবে না এবং তার ফলে দেশের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। তাই আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ

সহজ ও সরলভাবে বোঝাতে হবে এবং বিজ্ঞানকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করবার একমাত্র উপায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে প্রচার করা, বিজ্ঞানের মূল মন্ত্রগুলি সুস্পষ্টভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা। এর জন্যে তিনি বিগত তিরিশ বৎসর ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং তাঁর সে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গঠনের কারণই হচ্ছে, এই সংস্থার মাধ্যমে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশন এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে প্রচার করা। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচার ফলবতী হয়েছে। তবুও তিনি কিশোর-কিশোরীদের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে, কারিগরী শিক্ষার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

মানবসেবী, ছাত্রদরদী বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানাচার্য বসু তাঁর নশ্বর দেহ আজ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাঁর বিদেহী আত্মা আমাদের মধ্যে চিরকাল অনুপ্রেরণা জুগিয়ে আসবে। তাঁর কাছে এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, আমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর অমর আত্মার শান্তি। সবশেষে তাঁর আত্মার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

(শেষ কটা দিনের স্মৃতি)

শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোসের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 1923 সালে আমার বিয়ের পরে, যদিও আগেও ওঁকে চিনতাম। আমার স্বামী প্রশান্তচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাজেই খুব সহজেই আমিও দলে ভিড়ে গিয়েছিলাম।

বিয়ের পরে আলিপুর হাওয়া আপিসের উপরতলায় আমাদের প্রথম বাসা। দক্ষিণের লম্বা বারান্দায় আমরা তিনজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরামকেদারায় বসে আনন্দে আড্ডা জমিয়েছি। অনেক সময় বন্ধু গিরিজাপতি ভট্টাচার্যও সঙ্গে এসেছেন। দিলীপ রায়ের তো আমি মাসী, আর সে সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত, কাজেই সেও প্রায়ই সঙ্গে আসতো। সত্যেন্দ্রনাথের মত এমন সব রকম পরিবেশে—যাকে বলে "ডালে ঝোলে অম্বলে"—নিজেকে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে শুধু নয়, সবাইকে নিয়ে জমাট মজলিশ তৈরী করতে আমি আর কাউকে দেখি নি। কেউই তাঁর কাছে সামান্য ছিল না, সকলেই ছিল জীবন্ত মানুষ। দেড় বছরের কথা—একদিন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি খাটের কাছে মাটিতে একজন হিন্দুস্থানী একটা কাঠের বাক্স নিয়ে বসে একটা শিশি বের করে কি সব শোঁকাচ্ছে আর দেখাচ্ছে। আমি প্রশ্নভরা চোখে চাইতেই এসে বল্লেন "আতরওয়ালা গাজীপুর থেকে আসল আতর নিয়ে আমার কাছে আসে মাঝে মাঝে। আমি ও আমার ভাজ দু-জনে গিয়েছিলাম, বল্লেন "দাও তো এদের দু-জনকে দু-শিশি চামেলীর আতর"। সে তাড়াতাড়ি আমার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছে, যাতে আমার

বাড়ী এসেও কিছু বিক্রী করতে পারে। ধমক দিয়ে বল্লেন "ওর ঠিকানা নিয়ে কি করবে? এখানেই তো পেয়েছো।" আমি ওকে দাম জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন "দামের কথা জানবার দরকার নেই; আমিই তো কিনে দিলুম, আর কিনে কি হবে?" চুপ করে গেলাম—মজা যে মন্দ নয়। হঠাৎ সকালবেলা দুই শিশি আতর পাওয়া গেলো।

সেই গাজীপুরীর সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা বলা হলো, ঘরের খবর নেওয়া হলো। সে খুশী হয়ে চলে গেল। হেসে বল্লেন "লোকটা ভাল। সত্যই আসল জিনিষ নিয়ে আসে, তাই মাঝে মাঝে ওর কাছ থেকে 'খোসবোই' কিছু কিছু কিনে রাখি।" বুঝতে পারলাম তাহলে হঠাৎ দরকার হলে হাতের কাছে থাকলে একে-ওকে দেওয়া চলে। ঘরখানা যেন শ্যামবাজারের পাঁচমাথা। যে কোন লোকের সঙ্গেই সেখানে দেখা হতে পারে। রাস্তা থেকে উঠেই বিনাদ্বিধায় চেনা-অচেনা কত লোকই যে ঘরে আসে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মাস আড়াই আগে এক দিন সকালে ওঁর ঘরে বসে আছি, হঠাৎ একটি যুবক ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে, ঘরে ঢুকেই খাটের কাছে গিয়ে বললো "আপনিই কি সেই বিখ্যাত সত্যেন বোস?" সত্যেনবাবুর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, বল্লেন "সেই রকমই তো মনে হয়।" আমাকে দেখিয়ে "আর ইনিই কি"—আমি তাড়াতাড়ি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম "আমার স্বামীর নাম ছিল প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।" "ও, হ্যাঁ, তিনি তো এই কিছু দিন আগে গত হয়েছেন, রেডিয়োতে শুনেছি, কাগজে পড়েছি" ইত্যাদি। সত্যেনবাবু কৌতুকের দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন দেখে—সে তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে গিয়ে সত্যেনবাবুর কাঁধে হাত দিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে ছোট ছেলের মত বলতে লাগলো 'এতদিন পরে আমার সত্যেন বোসকে দেখা হলো। বহু দিন থেকে ইচ্ছে বিখ্যাত প্রোফেসর সত্যেন বোসকে দেখবো। আজ সেই বিবেকানন্দ রোড থেকে এই জন্যে ছুটতে ছুটতে এসেছি।' বড় মেয়ে নীলিমাও দাঁড়িয়ে—আমরা সকলেই ভদ্রলোকের রকম দেখে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছি। সত্যেনবাবু প্রশ্ন করলেন 'কি করা হয়?' 'আমি বাংলা সরকারের দুধ সরবরাহ করবার ডিপোর চার্জে আছি। এখনি আমার দুধের গাড়ী পৌঁছে দিয়ে ছুটে এসেছি আজ সত্যেন বোসকে দেখবই।' আমি বল্লাম 'সরকারের তো দুধই নেই, কাজেই সরবরাহ করছেন কি? দুধ থাক আর না থাক চাকরীটা আপনাদের ঠিকই আছে।' সত্যেনবাবু এবং অন্যেরা সকলেই আমার কথায় সায় দিয়ে হাসতে লাগলেন। তারপর বল্লেন 'এখন ঠিক বলতো কেন আমার কাছে এসেছো?' 'সত্যি বলছি আপনাকে দেখা ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।' তুমি দুধের চার্জে আছো, কিন্তু হরিণঘাটার ভাল ঘি কেন আমরা একটু করে পাই না? এখানে খাঁটি ঘি নেই, লুচি খাবার ইচ্ছে হলে খেতে পাই না। এবারে একজন চেনা লোককে দিয়ে ঝাড়গ্রাম থেকে ঘি আনিয়েছি। বাংলাদেশ থেকে সব উড়ে গেছে।' 'আচ্ছা সার, এবারে আমি আপনাকে এক শিশি হরিণঘাটার ঘি এনে দেবো। কিন্তু আপনি ডিরেক্টার অব এগ্রিকাল্‌চারকে বলেন না কেন? তাহলেই তো সব পেতে পারেন।' হেসে বল্লেন 'নারে বাপু, কারোকে বলেটলে আর কিছু নিতে চাই না। আর কাগজে তো দেখলুম তার বিরুদ্ধে কি যেন একটা চার্জ এনেছে। ঐ ছেলেটাকে আমি খুব চিনতুম। খুব ডেয়ার ডেভিল ছেলে ছিল। ঢাকাতে রায়টের সময় তিন তিনবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।' মুখে একটা বিষন্ন হাসি ফুটে উঠলো। বুঝলাম সে অন্যায় যদি করে থাকে তার সাজা হবে—এটাতে

ওঁর অমত নেই, কিন্তু তার কাছে ওঁর মন কৃতজ্ঞ আছে প্রাণ বাঁচিয়েছিল বলে এবং সেই জন্যে ওঁর মনে এখন করুণাও হচ্ছে তার অসম্মানে। এই হলো সত্যেন বোসের হৃদয়ের গভীরতা। এইরকম ভাবে কথাবার্তা একটুক্ষণ হবার পর ছেলেটি বেশ গুছিয়ে সত্যেনবাবুর চেয়ারখানার উপর পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলো। বুঝলাম সহজে উঠবার মৎলব নেই। অগত্যা সত্যেন বাবুকে বললাম বেলা হয়ে গেলো, আজ আর আপনার সঙ্গে গল্প করা হলো না, এবারে বাড়ী যাই। উনিও বুঝেছিলেন সহজে ঘর খালি হবে না, কাজেই থাকতে বলে লাভ নেই। 'আচ্ছা এসো দিদি।' এইসব টুকরো টুকরো ছবিতে বারে বারেই ওঁর আসল রূপটি ফুটে উঠতে দেখেছি। বলতে পারতেন তো 'তুমি কে হে, সকালবেলা আমাকে বিরক্ত করতে এসেছো?' কিন্তু তাতো ওঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই বলছিলাম ওঁর ঘরখানা যেন শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা।

এমন কি জানোয়ারও ওঁর কাছে ফ্যালনা ছিল না। ফুল ও গাছের প্রতি মমতা তাঁর ঢাকার বাগান যে দেখেছে সেই জানে।

শ্রীযুক্ত দিলীপ রায়ের দাদামশাই প্রকিতযশা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে সারা ভারতের বিখ্যাত সব ওস্তাদদের নিয়ে প্রায়ই জলসা হতো মন্টুর (দিলীপ) কৃপায়। সব সময়েই দেখেছি সত্যেন্দ্রনাথ হাজির আছেন—ঘন্টার পর ঘন্টা জলসা চলছে আর এই স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক মশগুল হয়ে বসে আছেন। তখন ওঁকে দেখলে কে না বলবে যে, সঙ্গীত সাধনাছাড়া আর ওঁর অন্য কোন পেশা আছে। সেই সব আনন্দের দিন মনের মণিকোঠায় চিরদিন সঞ্চিত হয়ে রইলো। এই দীর্ঘ বন্ধুত্বের স্মৃতিতে সব ভরে রয়েছে। কোন্ কথা বলবো আর কোন্ কথা ফেলবো ভেবে পাচ্ছি না।

আমার কাছে অনুরোধ এলো প্রোফেসর বোসের জন্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র যে বিশেষ সংখ্যা বেরোবে, তাতে আমার কিছু লেখা দেওয়া চাই। আমার তো অন্য কোন লেখা দেবার ক্ষমতা নেই এক গল্প বলা ছাড়া। তাই যখন বসে বসে ওঁর কথা ভাবছি এক একটা ছবি চোখে ভেসে উঠছে।

সেদিন আমার স্বামীর মৃত্যুর আগে অসুখের সময় কি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ওঁর মুখে দেখেছি। প্রশান্তচন্দ্রের মনকে হাল্কা করবার জন্যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটুটের অনেক বোঝা নিজে ঘাড়ে করে নিলেন—'প্রশান্ত, তুমি ভেব না, আমি আছি। তুমি মন নিশ্চিন্ত করে অসুখটাকে সারিয়ে নাও।' তিনি মারা যাবার পরে সত্যেনবাবুর প্রথম ভাবনা—রাণীর কি হবে? ওকে এখন কে দেখবে? ওর তো অসুস্থ শরীর, আর তো কেউ ওকে তোয়াজ করে রাখবে না। একদিন হেসে আমাকে বলেছিলেন—'বেশী অত্যাচার না করে নিজের শরীরটাকে ভাল রেখো। এখন তো বেশী অসুখ করলে আর কেউ তোমার জন্যে নার্স নিয়ে আসবে না দিদি।' আমি বললাম 'আপনি আমার জন্যে এত ভাবেন কেন?' আমি ছাড়া আর কে তোমার জন্যে ভাববে শুনি?' মনে হলো কথাটা সত্যি; অমন দরদ আর কার আছে? আমার স্বামী আমাকে একলা ফেলে গিয়েছেন এই বেদনা এত তীব্র ও গভীরভাবে সত্যেনবাবু ছাড়া আর কে অনুভব করেছে? এখন বন্ধুবৎসল তো চোখে পড়ে না। লোকে পরের দুঃখে সহানুভূতি জানায়, পাশেও এসে দাঁড়ায়, কিন্তু ঘাড় পেতে বোঝা তুলে নিতে তো কেউ এগোয় না।

1946 সালে প্রথমবার যখন আমার স্বামী ইউনাইটেড নেশানের স্ট্যাটিস্টিক্যাল কমিশনের আমন্ত্রণে নিউইয়র্ক যান, তার আগে বন্ধুকে বললেন 'সত্যেন, তুমি যদি ইনষ্টিটউটের ভার না নাও, তাহলে আর আমার আমেরিকা যাওয়া হয় না।'

সত্যেন্দ্রনাথ তখন ঢাকা থেকে চলে এসেছেন ও কলকাতায় নিজের বাড়ীতে রয়েছেন—বাড়ীতে অনেক লোক। 'আচ্ছা ভার নেবো যদি আমার বরানগরে একটা থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।' 'এতো খুবই সোজা; সারা আম্রপালিই তো তোমার থাকবে। আমরা তো দু-জনেই যাচ্ছি, কাজেই ঘরের ভাবনা কি?' আমরা নিশ্চিন্তমনে চলে গেলাম। অধ্যাপকের মন হাল্কা—সত্যেন আই, এস, আই-র কর্ণধার হয়ে রইলেন বলে।

কয়েক মাস পরে তিনি একবার দু-মাসের জন্যে দেশে ফিরে এসেছিলেন কেম্ব্রিজে আমাকে একা রেখে, কারণ আবার অক্টোবরে পপুলেশন কনফারেন্সে যোগ দিতে যেতে হবে। তখন জানতেন না যে, আমার বাড়ী ছেড়ে যাবার সময় কি রকম বিপদ ঘটবে। যেদিন সকালের প্লেনে রওনা হবেন, তার আগের দিন দুপুর বেলা আমার শ্বশুরমশাই প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশ মারা গেলেন। তিনি প্রায় দশ বছর বিছানায় শোয়া; তাঁর চিরকাল ভয় ছিল যে ছেলেকে সর্বদা এখানে-ওখানে কাজে যেতে হয়। এরই ফাঁকে তিনি একদিন চলে যাবেন, তখন ছেলে কাছে থাকবে না। আমার স্বামী যেন বাবার মৃত্যুর সময় কাছে থাকবেন বলেই দেশে ফিরেছিলেন—নিয়তির এমন খেলা। আমাকে 'তার' করে জানালেন—'বাবা চলে গেলেন। 1 সপ্তাহ পরে যাবো।' তখন কলকাতা ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা—রাস্তায় চলাচল বিপজ্জনক। যাই হোক কোনমতে শ্রাদ্ধ-শান্তি করে বিকেলে সহর থেকে আম্রপালি ফিরে এসে বসেছেন। ওঁদের কলকাতায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ীতে বাবা মারা গেলেন। দুটি অবিবাহিতা ছোট বোন, যারা বাবার কাছে থাকতো, তারা সেই খানেই আছে। ছোটভাই বুলা তার স্ত্রী ও মেয়ে শ্রীলাকে নিয়ে সেই বাড়ীতেই থাকে। বাবা চলে গেলেন, দাদা ছোটদের ফেলে চলে যাবে; তাতে মনটা বিমর্ষ ও উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে। সত্যেনবাবু সেটা বুঝতে পেরে কাছে এসে বসে বল্লেন 'প্রশান্ত তোমার বোনেদের জন্যে কিছু ভেবো না। আমি আছি, আমিই তাদের ভার নেবো দেখাশোনা করবার। তুমি খুব নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজে চলে যাও।' আমার স্বামী ফিরে গিয়ে বলেছিলেন 'সত্যেন আমাকে এমন করে আশ্বাস দিল আসবার সময় যে, আমার মনের বোঝা নেবে গেলো। সত্যিই তো, ও যখন আছে তখন আর ভাবনা কি?' এই হচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথ বোসের আসল চেহারা। শুধু উপর উপর বন্ধুত্ব নয়, বন্ধুত্বের সমস্ত দায় ঘাড়ে নিতেই সর্বদাই প্রস্তুত। যাঁরা বিদ্বান, জ্ঞানী লোক, তাঁরা সত্যেনবাবুর মনীষার কথা আলোচনা করবেন। কিন্তু যারা আমার মত সামান্য লোক, যাদের জ্ঞানের গরীমা নেই, বৈজ্ঞানিক সাধনার কথা আলোচনা করবার ক্ষমতা নেই, তারা সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহপূর্ণ হৃদয় ও যথার্থভাবে তার প্রকাশের কথাই স্মরণ করবে।

শেষের কটাদিনের স্মৃতিতে সর্বদা মন ভরে রয়েছে। হঠাৎ যেন একটা আনন্দের জোয়ার এসেছিল আর মুহূর্তের মধ্যে সেই জোয়ারে ভাটা পড়ে গেলো।

31শে ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সমাবর্তন উৎসবে সত্যেন্দ্রনাথ সভাপতি। তিনি তো আই, এস, আই-র প্রেসিডেন্ট, কাজেই তাঁরই তো অনুষ্ঠান। প্রশান্তচন্দ্র যাবার পর এই প্রথমবার সমাবর্তন উৎসব। তাই আমার শরীর সেদিন বিশেষ অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কষ্ট করেই সভায় গিয়েছিলাম। এই প্রথম সভায় বেদীর উপরে সত্যেন্দ্রনাথের পাশে প্রশান্তচন্দ্র উপস্থিত নেই সমাবর্তনের দিন। মনটা আমারও যেমন সত্যেনবাবুরও তেমনি প্রথমে একটু বিমর্ষ হয়েছিল, কিন্তু সে অল্পক্ষণ। সেদিন সভাপতি হাসিতে কৌতুকে সকলেরই মন প্রফুল্ল করে দিলেন। অমর্ত্য সেনের বক্তৃতার পর সত্যেনবাবু

তাঁর ভাষণে জবাব দিলেন সকলকে খুব হাসিয়ে। সেদিন সময় একটু বেশীই লেগেছিল; কারণ তিন বছর সমাবর্তন উৎসব হয় নি, কাজেই এতদিন ধরে অনেক স্নাতক জমা হয়ে গিয়েছিল, যাদের নাম পড়তে দীর্ঘ সময় লাগলো। আমার ভয় হচ্ছিল যে, এতক্ষণ বসে থাকবার ক্লান্তি পাছে সভাপতির পক্ষে বেশী হয়ে পড়ে। দেখলাম ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই, দিব্যি খোস মেজাজে বললেন 'অনেকক্ষণ হলো কিন্তু সেটা খারাপ লাগলো না।' এখন মনে হচ্ছে ভাগ্যি সেদিন বিছানায় শুয়ে না থেকে নীচে নেমে গিয়েছিলাম।

ডাঃ সি. আর. রাও সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আই. এস. আই-র তরফ থেকে একটা রূপার থালা উপহার দিলেন। সকলেরই মন তৃপ্ত হলো এই স্বীকৃতিতে। পরদিন সত্যেন্দ্রনাথের জন্মদিন—1লা জানুয়ারী 1974 সালে আশী বছর পূর্ণ হলো। গেলাম সকালবেলা ঈশ্বরমিল লেনে। গিয়ে দেখি ঘরভরা লোক, অনেক বন্ধুবান্ধব, ভক্ত, অনুগত সকলেরই সেদিন আনন্দ করবার দিন। কেউ ফুল, কেউ মিষ্টি, কেউবা আবার নিজের রচিত 'ছড়াকাটা' বই উপহার এনেছে। সত্যেনবাবুর খাটের উপর বসে স্মিতমুখে সবাইকে 'এসো, এসো, বলে অভ্যর্থনা করছেন। আনন্দে হাসিতে উজ্জ্বল মুখ। বড় মেয়ে নীলিমাকে ডেকে বলছেন 'ওরে, এদের সন্দেশ দে' ইত্যাদি। নিজে তো অসুখের জন্যে মিষ্টি খেতে পারতেন না, কিন্তু অন্য সকলকেই খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত। অত্যন্ত ভালবাসতেন লোকজন খাওয়াতে। সেদিন বাড়ীর কর্ত্রীর কি আনন্দময়ী মূর্তি। চওড়া লালপাড় শাড়ী পরা, মাথায় এতখানি ঘোমটা করে সিঁদুর—একগাল হাসি নিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াতেই 'দাও, দাও, এদের সবাইকে সন্দেশ খাওয়াও।' নিজে মিষ্টি খেতে পারবেন না, কিন্তু আগত সকলকে মিষ্টি না খাওয়ালে তৃপ্তি নেই। চিরদিনের বন্ধু গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, ভক্ত সুহৃৎ সিংহ, সহপাঠী জীবনতারা হালদার তাঁর 'ছড়াকাটা' বইখানি হাতে নিয়ে এবং আরো কত লোক এসেছেন। ঈশ্বরমিল লেনে সেদিন আনন্দের জোয়ার। আমি বাড়ী আসবার সময় একটা বাক্সভরে সন্দেশ বেঁধে দিলেন তখন অসময়ে কিছু খাবোনা বলে। চলে যখন আসছি বলে দিলেন পর দিন 10টার সময়ে যেন গাড়ী পাঠাই 'আম্রপালি'তে আসবার জন্যে। কারণ ইনষ্টিটিউটে বিদেশী ভিজিটিং প্রোফেসর যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে ভালকরে আলাপ করতে চান। আগের দিন সভার ভিড়ের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে কথা বলতে পারেন নি তাই।

2রা জানুয়ারী সকাল 10টায় এসে পৌঁছলেন। সেদিন বিদেশী পোষাক—গরম সুট পরে এসেছেন আর মাথায় সেই ফরাসী 'বেরে'। ঘন্টা দুই গল্প করা, দক্ষিণের বারান্দায় বসে কফি খাওয়া, বাইরে রোদে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা সবই হলো। একজন জার্মান, একজন হাঙ্গেরীয়ান, একজন জাপানী ইত্যাদি নানা দেশের লোক। সকলের সঙ্গেই আলাদা করে তাদের দেশের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন, আলোচনা সব চললো। তারপরে হাতধরে সিঁড়ি দিয়ে নাবিয়ে গাড়ীতে বসিয়ে দিলাম। খুশী মনে হাত নেড়ে সকলকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেলেন। একবারও সেদিন ভাবি নি এই ওঁর শেষ আম্রপালিতে আসা। এখানে আসতে বরাবরই অত্যন্ত ভালবাসতেন, কারণ বাগানের যে বেজায় নেশা। শীতকালে এলেই আগে কত বড় ডালিয়া আর কত ভাল চন্দ্রমল্লিকা ফুটেছে তাই দেখতেন। কোন ফুলটা বেশী পছন্দ হলে বাড়ী যাবার সময় আমি টবসুদ্ধ তুলে দিতাম গাড়ীতে—তাতে খুব খুশী।

কয়েক দিন পরে বোধ হয় 18ই বা 19শে জানুয়ারী হবে, সকালবেলা ওঁর সেই থালাটা আর ছবির অ্যালবাম দিয়ে আসবো বলে ফোন করলাম যে,

উনি বাড়ী থাকবেন কিনা। টেলিফোন ধরেই প্রথম কথা বললেন 'আমার থালা কি হলো ?' বললাম সেটাই নিয়ে যাবো বলেই তো জিজ্ঞাসা করছি বাড়ী থাকবেন কিনা। বল্লেন 'কি আনবে থালায় ?' বল্লাম 'জানেনই তো আমার থালা শূন্য হয়ে গিয়েছে। আমি আর কিইবা আনতে পারি এখন ?' বোধ হয় একটু অপ্রস্তুত হলেন। তাড়াতাড়ি বললেন 'এসো দিদি এসো। আমি বাড়ীতেই আছি।' দু-খানা ই-স্টিটিউটে তোলা অনেক ছবি দিয়ে ভরানো অ্যাল্বাম আর রূপার থালাটা নিয়ে গেলাম। থালার উপরে আপিসের সাততলা বাড়ীর ও আম্রপালির ছবি নক্সা করা, তার মাঝে আই, এস্. আই-র বটগাছ-র প্রতীক ও সত্যেন্দ্রনাথের নাম খোদাই করা হয়েছে। হাতে নিয়ে খুব খুশী হয়ে বললেন 'বাঃ; বাঃ, বেশ চমৎকার করেছে তো কারীগর। কিন্তু এটা তোমাদের ইনস্টিটিউটের মিউজিয়ামে রেখে দিলেই ভাল হতো।' বললাম 'মিউজিয়াম কোথায় ?' 'ওরা করে নি প্রশান্তের জন্যে মিউজিয়াম ?' বললাম 'না, করলে তো আমি বেঁচে যেতাম, সব বোঝা হাল্কা করে দিতাম।' আচ্ছা দাও তো ছবিগুলি দেখি। ঐ গুলিতেই আমার বেশী লোভ।' খুব মন দিয়ে দু-খানা বই উল্টেপাল্টে ছবিগুলি দেখলেন। সত্যেনবাবুরই ছবি আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ঘটনায় তোলা। ছবিগুলি দেখতে দেখতে মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন 'অপারেশনটা না করলেই হতো, না দিদি ? ঠিক মত করে নি।' বুঝলাম বন্ধুর বিরহটা নতুন করে মনের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। অবিশ্যি অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার সেই স্বাভাবিক হাসি-ঠাট্টা ও নিজমূর্তি। একটু পরেই একজন ভদ্রলোক—কে তা জানি না—দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লেন 'আসতে পারি ?' 'এসো, কে তুমি ?' 'আমি নেতাজীর জন্মোৎসব কমিটির সেক্রেটারী।' 'আমার কাছে কি দরকার ?' 'আপনি সেদিন সকালে যদি শ্যামবাজারের পাঁচমাথার নেতাজীর মূর্তির কাছে গিয়ে তিন-চার মিনিট একটু কিছু বলেন'—কথার মাঝখানেই থামিয়ে দিয়ে বললেন 'ছাখো বাপু, আমাকে নিয়ে তোমরা আর টানাটানি করো না। আমার আশী বছর বয়স হয়ে গেছে, এখন আমি আসি, এখন আর যাই না বলে হাসতে লাগলেন। তবু ভদ্রলোক ছাড়েন না, তখন বললেন 'কাছেই তো তুষারকান্তি থাকেন, তাঁকে নিয়ে যাও না।' 'না, আমরা চাচ্ছিলাম একটু' বলতেই বললেন 'তোমরা চাচ্ছো কোন নির্দলীয় লোককে ডাকতে, তাই তো ?' 'হ্যাঁ, আপনার মত কাউকে আমাদের নিতে ইচ্ছে।' হেসে বললেন 'আজকাল নির্দলীয় কাউকে তো পাবে না, দুটি তিনটি ছাড়া। এক আমি আছি, আর বড়জোর দু-তিনজন। নেতাজীর নিজের দল ফরওয়ার্ড ব্লকের কাউকে ডাকো না। আর ওখানেই বা কিছু করবার দরকার কি ? যাও না মহাজাতি সদনে বক্তৃতা শুনতে। সেখানে ফুজিওয়ারা টুজিওয়ারা আরো অনেক লোক এসেছে, তারা সবাই বক্তৃতা করবে, তাই শোন গিয়ে।' তবু যখন ভদ্রলোক আবার বললেন 'তিন-চার মিনিটের জন্যে আমরা আপনাকে পেতে চাই', তখন খুব জোর দিয়ে বললেন, 'ছাখো বাপু আমি এই আশী বছর বয়সে শ্যামবাজারে গিয়ে তোমার নেতাজীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে পারবো না। তিনি যেদিন ওখানে এসেছিলেন, সেদিন গিয়ে অনেক কথা বলেছিলুম, আর পারবো না। যাও, আমাকে আর বিরক্ত করো না। কিছু বাণীটানী দিতে বলো তো রাজী আছি ; কাল সকালে কাগজ পেন্সিল নিয়ে এসে লিখে নিয়ে যেও। আমি ভাল চোখে দেখছি না, কাজেই লিখতে পারবো না। মহাজাতি সদনের ওরা আমার কাছ থেকে লিখে নিয়ে গেছে। আর আমি কিছু করতে পারবো

না। এঁরা এসেছেন, একটু গল্পটল্প করছি, এবারে তুমি যাও'। অগত্যা ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি বললাম 'সত্যেন বাবু, আপনি এই রকম করে সকলের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেকে এত খরচ করবেন না। আপনি আমাদের সবেধন নীলমণি একটিমাত্র কুমীর ছানা রয়েছেন, কাজেই আপনাকে সাবধান হয়ে থাকতেই হবে।' হেসে বললেন "এতদিন তো ভাই ছিলুম গীরগিটি আর টিকটিকি হয়ে, আজকাল দেখছি হঠাৎ কুমীরছানা হয়ে উঠেছি' বলেই উচ্ছ্বসিত হাসি। আজ কেবল সেই প্রাণখোলা হাসির কথাই মনে পড়ছে।

সত্যেনবাবু 26শে জানুয়ারী আমাদের ইনস্টিটিউটের একজন কর্মীকে দিয়ে সকালে খবর পাঠালেন যে তিনি অসুস্থ, নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। শুনেই ছুটে গেলাম দুপুরবেলা। তখন খাটের উপর বসে আছেন, তখনি স্নান করবেন বলে আয়োজন হচ্ছে। ঘরে বড় মেয়ে দাঁড়িয়ে, বললাম 'আমি এই ভয়ই করছিলাম, প্রতি দিন যখন খবরের কাগজে দেখছি যে, ন্যাশানাল প্রোফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বোস অমুক জায়গায় ভাষণ দিচ্ছেন, অমুক জায়গায় অর্ঘ্য নিচ্ছেন, কখনও বা কোথায় নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছেন, দেখে দেখে আতঙ্ক হয়েছে আর ভেবেছি লোকে বলে 'কুডাক ডাকতে নেই', তাই কিছু না ভাবাই ভাল। কেন আপনি এ রকম করলেন?' হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বল্লেন 'তুই জানিস না, আমাকে যে কেউ ছাড়ে না তাই।' মেয়ে বললেন 'ছাড়েনা না, বাবা এ সব ভালবাসেন। মানুষজনের সঙ্গে দেখা হয়, কত বিদেশীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, আরো কতকি। আসলে শরীরটা একটু ভাল ছিল, তাই যে ডাকছে সেখানেই যাচ্ছেন। এখন আর বলে কি হবে?' বললেন 'আজ আমার সই নিতে এসেছিল নাদ্‌কারণী, তাই তাকে দিয়ে তোমাকে খবর দিলুম। অতি কষ্টে সই দিয়েছি, আজ চোখে আরো কম দেখছি।' বেশ কষ্টে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথাটুকু বললেন। আমি বললাম 'গতকাল মাঘোৎসব থেকে ফিরবার পথে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবার ইচ্ছে ছিল; 11ই মাঘের উপাসনা, একটু দেরীতেই মন্দির ভাঙলো। অত দেরীতে আর আপনাকে বিরক্ত করবো না বলে বাড়ী চলে গেলাম আজকে আসবো বলে, কিন্তু আজ তো আপনিই খবর পাঠিয়েছেন।' 'খুব ভাল করেছো দিদি কাল না এসে; কাল বড্ড কষ্ট গেছে। কাল এলে আমি একটা কথাও বল্‌তে পারতুম না এমন অবস্থা হয়েছিল। আজ তার চেয়ে একটু ভাল আছি।' ওঁকে কথা বলতে না দিয়ে আমি আর নীলিমা বাইরে বেরিয়ে এলাম। মেয়ে বললেন 'বাবা তো কখনও নিজের শরীরের কষ্টের কথা বলেন না, কিন্তু কাল ক্রমাগত বলেছেন ওরে তোরা শীগ্‌গীর বড় ডাক্তার ডাক আমি আর সহ্য করতে পারছি না নিঃশ্বাসের কষ্ট। যা কিছু খাওয়ানো হচ্ছে বমি করে ফেলছিলেন আর আমার উপর রাগ যে কেন খাওয়াতে চেষ্টা করছি। আজ তো অনেক ভাল।' মন খারাপ করে বাড়ী চলে এলাম। আগে একদিন কথা হয়েছিল মার্চে দিল্লী যাবার। বলেছিলেন 'তখন দিল্লীতে শীত কমে যাবে, আমি আর তুমি দু-জনেই একসঙ্গে যাবো, সেকথা দেশমুখকে লিখে দিও।' বাড়ী আসতে আসতে ভাবছিলাম মার্চের তো এখনও অনেক দেরী, ততদিনে হয়তো আবার কাটিয়ে উঠতে পারবেন, প্রত্যেক বারই যেমন উঠছেন। একবারও ভাবি নি যে, এই শেষ অসুখ। সেই 26শে জানুয়ারীর পরে আর আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। ওখানে গিয়ে গাড়ীতে বসে থেকে খবর নিয়ে এসেছি, ঘরে গেলে কথা বলবেন বলে। ডাক্তারের বারণ রুগীর ঘরে কাউকে যেতে দিতে। রোজই খবর নিতে নিতে একদিন খবর পেলাম একটু

ভাল, ডাক্তার যোগেশ ব্যানার্জি বলে গেছেন এই রকম ভাবে সাবধানে থাকলে আশা করা যায় সপ্তাহখানেক পরেই আবার স্বাভাবিকভাবে লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে দিতে পারা যাবে। কথাটাতে মন একেবারে হাল্কা হলো না, ভাবলাম প্রদীপ নিভে যাবার আগে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার মত নয়তো? আমার স্বামীরও এই রকম হয়েছিল। সেদিন 2রা ফেব্রুয়ারী, 3রা আর খবর নিই নি। 4ঠা ভোরবেলা ভগ্নীপতি ফোনে খবর দিলেন 'প্রোফেসর বোস এই 6টার চলে গেলেন।' নিভলো সকলের আশার প্রদীপ।

6ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী চলে গিয়ে 14ই ফিরে এসেছি ঈশ্বরমিল লেনে আবার যাব সত্যেন বাবুরই কাজে বলে। সে যাওয়া আর 1লা জানুয়ারীতে যাওয়ার মধ্যে কত তফাৎ।

দিল্লীতে 10ই ফেব্রুয়ারী ন্যাশানাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সে সত্যেন্দ্রনাথের জন্যে শোকসভা হলো। ডাঃ বি. এন. গাঙ্গুলী সত্যেন বাবুর সঙ্গে ঢাকায় থাকবার কথা বললেন। ডাঃ কোঠারী বললেন বোস-স্ট্যাটিসটিক্স-এর কথা, ডাঃ সি. আর. রাও আই. এস. আই-র তরফ থেকে বললেন, আরো অনেকে অনেক রকম ভাবে শ্রদ্ধা জানালেন। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বসু, যিনি হাওয়া আফিসের বড়কর্তা ছিলেন আগে, বললেন "আমি ওঁর ছাত্রও না, কিছুই না, তবে আমি পারিবারিক বন্ধু হিসাবে ওঁর যে রূপ দেখেছি, তা না বলে থাকতে পারছি না। একটি কম বয়সী চাকর ওঁর দুধ থেকে চুরি করে খেয়ে জল মিশিয়ে ওঁকে খাওয়াতো। একদিন ধরা পড়ে যাবার পর বাড়ীর লোকেরা যখন তাকে তাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ওঁর কাছে নালিশ করলেন, তখন তিনি বললেন—না, ওকে ছাড়াবো না। ওকে আমার সমান দুধের বরাদ্দ করে দিতে হবে, তাহলে আর ও দুধ খাবে না চুরি করে। চাকরটিকে প্রশ্ন করা হলো 'কিরে? আর চুরি করে খাবি না তো?' এইরকম গভীর করুণা ছেলেটার প্রতি। বেচারার এই তো দুধ খাবার বয়স। খেতে লোভ হয়েছে তাই চুরি করে খেয়েছে, খেতে দিলে আর চুরি করবে না।

একথা শোনবার পরে আমিও কয়েকটা কথা না বলে থাকতে পারলাম না। বললাম এতক্ষণ সকলে মানুষের প্রতি ভালবাসার কথাই বললেন। কিন্তু জানোয়ারের প্রতি ভালোবাসার কথা কেউই উল্লেখ করলেন না। আমি সম্প্রতি একটি ঘটনা যা দেখেছি, সেটা বলতে চাই। এই কয়েক দিন আগে যখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়েছিল, সেই সময় একদিন সত্যেনবাবুর বাড়ী গিয়ে দেখি গৃহকর্তার চমৎকার দামী লেপ, তার নতুন ওয়াড়সুদ্ধ্ মাটিতে খাটের কাছে পড়ে আছে। 'একি এত ভাল লেপটা মাটিতে কেন? বড় মেয়ে নীলিমা হেসে বললেন 'ওটাতে বাবার আদরে বেড়ালটা কাল রাত্রে বাচ্চা দিয়েছে, তাই বাচ্চাসুদ্ধ্ তাকে মাটিতে নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাত্রে ব্যথার কষ্ট হচ্ছিল, লাফ দিয়ে বাবার বিছানায় উঠে পড়ে ঐ লেপের উপরে বাচ্চা দিলো। জানে ঐ খাটের উপরটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।' আমি বললাম 'সত্যেনবাবুর একি রকমের আদর বেড়ালকে? অত ভাল লেপটা ওর জন্যে নষ্ট করলেন?' 'আহা বেচারা বেশ আরামে ওর মধ্যে আছে, ওকে আর বিরক্ত করবার দরকার কি? ওখানেই থাকুক না', কিন্তু এই প্রচণ্ড শীতে আপনি কি গায়ে দেবেন? বেড়ালকে তো লেপটা দেওয়া হলো। আরে আমার একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। ওরা দেবে আমাকে একটা কম্বলটম্বল কিছু। আশ্চর্য! অনেকেই ঘরে গিয়ে দেখেছে একটা বেড়াল কোলে, একটা পাশে আর একটা খাটের এক কোণে আরামে বসে আছে। এই দুর্মূল্য বাজারে যখন লোকে মাছ খেতে পাচ্ছে না,

একদিন গিয়ে দেখি তিনটে বেড়াল মাটিতে খাটের ধারে বসে তাদের জন্যে মস্ত মস্ত টুকরো পাকা রুইমাছ এনো, অন্ততঃ আধসের হবে। 'সত্যেনবাবু একি, আমরা যে দামের জন্যে এতবড় মাছ আজকাল খেতে পারি না।' 'আহা হিংসে করো কেন? ওরাও খায় আমিও খাই। শুধুই কি ওরা খায়?' বড় মেয়ে বললেন 'আসলে বাবা নিজের নাম করে আনিয়ে বেশীর ভাগটাই বেড়ালকে খাওয়ান—কাজেই কিছুই আর বলবার উপায় নেই।' আমার স্বামীরও ঠিক এইরকম ছিল—এ বিষয়ে দুই বন্ধু একেবারে সমান।

সেদিন শ্রাদ্ধ বাসরে যখন গিয়েছিলাম মেয়েরা বলছিল বাবা যখন ছিলেন, ঠিক দুপুর হলেই তিনটে বেড়ালই কি চীৎকার সুরু করতো খাবারের জন্যে। আজকাল বাড়ী একেবারে চুপ, একজনেরও গলা শোনা যায় না। খেতে না দিলেও চেচামেচি করে না। আমি বললাম—আমারও ঠিক এই অভিজ্ঞতা। আমার স্বামী মারা যাবার পর ওঁর সবচেয়ে প্রিয় বেড়ালটা যে সর্বদাই ওর কোলে বসে থাকতো যখন আপন মনে কাজ করে যেতেন, সে একেবারে খাওয়া ছেড়ে দিল। মুখে একটি শব্দ নেই, সমস্তক্ষণ ওঁর পড়বার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে শুয়ে পড়ে থাকতো। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে, ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ খাইয়ে কিছুতেই কিছু হলো না। একদিন সকালে দেখি মরে পড়ে রয়েছে। জানোয়াররা আশ্চর্য বুঝতে পারে। সত্যেনবাবুর যে গভীর দরদী মন, তা বেড়াল তিনটে বোধ হয় মানুষের চেয়েও বেশী বুঝতে পারতো। একটি পরিপূর্ণ মানুষকে আমরা হারিয়েছি। কেবল মনে হয় ওঁর প্রতিভার চেয়েও বড় ছিল ওঁর ব্যক্তিত্ব, সহজ অনুরাগে ভরা হৃদয়। ওঁর সম্বন্ধে সত্যই বলা চলে 'তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'।

আচার্য বোসের শেষ অঙ্ক

পরিমলকান্তি ঘোষ*

আচার্য বোস জীবন-সায়াহ্নে যে ফের্মা (Fermat) সংখ্যাগুলি কৃত্রিম অর্থাৎ মৌলিক নয়, সেগুলির গুণনীয়ক নির্ণয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। অপরের কষা অঙ্ক তাঁর ভাল লাগতো না—সেটা আবার নিজের মত করে নিজে না কষলে তাঁর পরিতৃপ্তি হতো না। তাই তিনি এই বিষয়টির আদি থেকে পুনরানুশীলন করছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় 4ঠা ফেব্রুয়ারী 1974 সোমবার প্রত্যুষে—তার আগের শনিবার (2রা ফেব্রুয়ারী) তিনি একটু সুস্থ বোধ করছিলেন বেশ কয়েক দিনের কষ্টের পর এবং সেদিন খাতা-কলম নিয়ে এই সমস্যায় আবার হাত দিয়েছিলেন। দুর্বলতার জন্যে তাঁর হাত চলছিল না—একটি দৌহিত্রকে দিয়ে নিজের কব্জিটি ধরিয়ে যা লিখেছিলেন, তার ফটো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

এখন এই ফের্মা সংখ্যার প্রসঙ্গে আসা যাক। সর্বকালের সৌখিন গণিতজ্ঞদের প্রধান ফের্মা (1601—65) লক্ষ্য করেন যে, 3, 5, 17, 257, 65537 এই সংখ্যাগুলি মৌলিক—এগুলি একটি পরম্পরার (Sequence) পদ। এই পরম্পরার

* ফলিত গণিত বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ কলিকাতা-700009.

(n+1)-তম পদ $F_n = 2^{2^n} + 1$, $(n = 0, 1, 2, \cdots)$। F_0, F_1, F_3, F_4 কে মৌলিক দেখে এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলি মৌলিক কিনা ঠিক করা সময় ও পরিশ্রমসাপেক্ষ বুঝে ফের্মা বলেন যে, এই পরম্পরার পরবর্তী সংখ্যাগুলিও মৌলিক হবে। তাঁর এই অনুমান প্রমাণ করতে পেরেছিলেন বলে তিনি দাবী করেন নি। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় তাঁর অনুমান সঠিক নয়—এমন কি ঠিক পরবর্তী দুটি পদ F_5, F_6ই মৌলিক নয়। তবে এদের গুণনীয়ক বের করতে ফের্মার পর বহু সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল। F_5 যে দুটি বিভিন্ন মৌলিক সংখ্যার গুণফল, তা বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অয়লার (Euler) আবিষ্কার করেন 1732 সালে। F_6-এর প্রথম মৌলিক গুণনীয়ক বের করেন ল্যাণ্ড্রি (Landry) 1880 সালে। এটা প্রমাণ করা যায় যে, F_6 ও F_5-এর মত দুটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল। 1905 সালে মোরহেড (Morehead) প্রমাণ করেন যে F_7 কৃত্রিম সংখ্যা এবং 1909 সালে মোরহেড ও ওয়েস্টার্ন (Westein) প্রমাণ করেন F_8ও যৌগিক। F_7-এর অঙ্ক সংখ্যা 39 ও F_8-এর অঙ্ক সংখ্যা 78।

66 বছর পরে 1971 সালে বড় কম্পিউটারের সাহায্যে F_7-এর গুণনীয়ক বের করা সম্ভব হয়েছে। F_8-এ গুণনীয়ক এইভাবে বের করবার চেষ্টা এখনও হয় নি। আরও অনেক ফের্মা সংখ্যা যে কৃত্রিম, তা প্রমাণিত হয়েছে। বিখ্যাত জার্মান গণিতজ্ঞ গাউস (Gauss 1777–1855) প্রমাণ করেন যে F_n যদি মৌলিক হয়, তবে রুলার ও কম্পাস-এর সাহায্যে F_n বাহুবিশিষ্ট সুষম বহুভুজ একটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত করা যায়। আচার্য বোস এক সময় এই বহুভুজের অঙ্কন নিয়ে চর্চা করেছিলেন।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে যেমন দেখেছি

জয়ন্ত বসু

গত দশ-বারো বছর ধরে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যদিও মূলতঃ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নানান কাজকর্ম উপলক্ষ্যে পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসবার আমার এই সুযোগ ঘটেছিল, তাহলেও তাঁর মত অমায়িক ও উদারচেতা মানুষের সঙ্গে পরিচয় স্বাভাবিক ভাবেই কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর ব্যক্তি-মানসে যেমন বিজ্ঞানের একটি শক্তিশালী ধারা প্রবাহিত ছিল, তেমনি আবার ছিল সাহিত্যের ধারা, সঙ্গীতের ধারা এবং সবচেয়ে বোধ হয় যা উল্লেখযোগ্য—মানবিকতার ধারা। এই সব ধারার মিলনে তাঁর ব্যক্তিত্বকে আমার মনে হতো এক মহাসাগরের মত—কী ব্যাপক তার প্রসার, কী অগাধ তার গভীরতা!

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জ্ঞানের প্রতি ছিল অপরিসীম ঔৎসুক্য, বিজ্ঞানের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা। আমার মত সাধারণ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনার সময়েও তিনি জানতে চাইতেন আমাদের গবেষণার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কি কি কাজ হচ্ছে, কি গুরুত্ব সেই সব কাজের, আমরা নিজেরা কে কি কাজ করছি। আর তাঁর নিষ্ঠার কথা। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বিজ্ঞানের কোন

সমস্যার কথা তাঁকে বললে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কি রকম মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন এবং কত যত্ন সহকারে তার সমাধান করে দিতেন।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ একদিকে যেমন কাজে একাগ্রচিত্ত ছিলেন, অন্যদিকে ছিলেন আবার তেমনি দিলখোলা, মজলিসী মানুষ। কেউ কেউ বলে থাকেন, তিনি যদি গল্প-আলোচনায় সময় নষ্ট না করে গবেষণাতেই সারাক্ষণ নিযুক্ত থাকতেন, তাহলে তিনি আরও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যেতে পারতেন। তাঁরা ভুলে যান, যে গাছে যেমন ফুল হয়, সেই গাছের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী তার আলো হাওয়ারও তেমনি প্রয়োজন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে মজলিসের খোলা হাওয়ার হয়তো আবশ্যক ছিল, গবেষণার মধ্যে তাকে সব সময় আবদ্ধ রাখলে হয়তো সেই প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটতো।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের যে গুণটি আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করতো, তা হলো তাঁর আড়ম্বর-হীনতা, তাঁর নিরহঙ্কার আচরণ। 'Careful carelessness'-এর মত এটা কোন পোষাকী আড়ম্বরহীনতা ছিল না—এটা ছিল তাঁর স্বচ্ছ সরল অন্তরের অমূল্য সম্পদ। অথচ আড়ম্বর করবার মত, গর্ব করার মত, বুক ফুলিয়ে বলবার মত কত কিছুই তো তাঁর ছিল—যার অংশ মাত্র থাকলেও আজকালকার বেশীর ভাগ মানুষ ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে যায়।

কয়েক বছর আগে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের একটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন এক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার সামান্য মতভেদ হয়েছিল। তখন আমি পরিষদের কর্মসচিব হলেও আচার্যদেব কেবল পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতিই ছিলেন না, দেশের বিজ্ঞানক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক 'বৃহদারণ্য বনস্পতি'। পরিষদের কার্যকরী সমিতির সভায় আমার মতকে তিনি অনায়াসেই নস্যাৎ করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি; আমার মত সামান্য মানুষের বক্তব্যের যৌক্তিকতাও তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম, এরপর তিনি হয়তো আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে থাকবেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ হওয়া তো দূরের কথা, এর পর থেকে আমার উপর তাঁর বিশ্বাস যেন বহুগুণ বেড়ে গেল। তিনি সত্যিকারের মহৎ ছিলেন বলেই তাঁর কোন আত্মাভিমান ছিল না।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক ও স্পষ্ট বক্তা। যে পথ তিনি সঠিক বলে মনে করতেন, হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি তা থেকে বিচ্যুত হতেন না। কোন রকম কপটতা তিনি পছন্দ করতেন না। যাঁরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের গুরুত্বের কথা বলে থাকেন, অথচ এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে কার্যতঃ কোন রকম সহযোগিতা করেন না, তাঁদের সম্পর্কে আচার্যের মন্তব্য ছিল অত্যন্ত কঠোর।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রের যে দিকটির কথা আমাদের সকলেরই জানা উচিত, তা হলো তাঁর স্বদেশের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর বিজ্ঞানচর্চার, তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার অনুপ্রেরণা কি ছিল? তিনি খুব সহজভাবে বলেছিলেন, যে বিজ্ঞানের জোরে সাহেবদের এত উন্নতি, এত প্রতিপত্তি, আমাদের দেশের মানুষও যে সেই বিজ্ঞানে সাহেবদের সমান হতে পারে, সাহেবদের চেয়ে তারা যে কোন অংশেই ছোট নয়—এটাই প্রমাণ করবার অদম্য ইচ্ছা ছিল তাঁর ও তাঁর সমসাময়িক অনেক বিজ্ঞানীর মনে। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসারের জন্যে সত্যেন্দ্রনাথের যে নিরলস প্রচেষ্টা, তা তাঁর স্বদেশপ্রেমেরই এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি বুঝেছিলেন, আমাদের

দেশকে জগৎ-সভায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেশকে সর্বতোভাবে বিজ্ঞানমুখী করতে হবে এবং এটা একমাত্র করা সম্ভব মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এ জন্যে তাঁর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে আমাদের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি বহুবার বলেছেন, যদি কোন দেশ বলতে দেশের উপরতলার লোকদেরই কেবল না বুঝায়, যদি দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষকেও বুঝায়, তাহলে সেই সব সাধারণ মানুষ উন্নত হলে তবেই তো দেশকে উন্নত বলা যাবে; আজকের দিনে সাধারণ মানুষের উন্নতি করতে হলে মাতৃভাষায় ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের প্রচার ছাড়া নান্যঃ পন্থা। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি ছিল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের বহু দিনের স্বপ্ন ও সাধনা। তাঁর অন্তরের আত্মীয় এই যে প্রতিষ্ঠান, এর উত্তরোত্তর উন্নতির জন্যে যদি আমরা যথাসাধ্য সচেষ্ট হই, তবে তাই হবে আচার্যদেবের প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

জীবনকথা

উনবিংশ শতকে বাংলা তথা ভারতের জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে যখন নবজাগরণের ভরা জোয়ার প্রবহমান, সেই গৌরবোজ্জল স্বর্ণযুগের শেষভাগে 1894 সালের পয়লা জানুয়ারী উত্তর কলকাতায় পৈতৃক বাড়ীতে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম। তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন রেলওয়ের হিসাবরক্ষক এবং তাঁর মাতা আমোদিনীদেবী ছিলেন আলিপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী মতিলাল রায়চৌধুরীর কন্যা।

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন খুব উদ্যোগী পুরুষ। চাকুরিতে লিপ্ত থাকলেও তিনি সতীশ ব্রহ্ম মশায়ের সহযোগিতায় অবিভক্ত বাংলায় সর্বপ্রথম রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন যেমন উদারচেতা ও বিবিধ মানবীয় গুণসম্পন্ন, তেমনি আমোদিনীদেবীও ছিলেন নানা গুণ-সম্পন্না। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পিতামাতার প্রথম ও একমাত্র পুত্রসন্তান এবং তাঁর ভগ্নী ছয় জন। 1939 সালে আমোদিনী দেবী এবং 1964 সালে সুরেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বাল্যকালে কিছু দিন নর্মাল স্কুলে (রবীন্দ্রনাথ একদা এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন) পড়েন এবং তারপর বাড়ীর কাছে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি হন। এণ্ট্রান্স ক্লাশে ওঠবার পর তিনি হিন্দু স্কুলে যোগদান করেন এবং এই স্কুল থেকেই 1909 সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এস-সি পড়া সুরু করেন। স্কুল ও কলেজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ প্রতিভা শিক্ষক ও সহপাঠী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 1911 সালে আই. এস-সি পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পর্যন্ত তাঁর এই স্থান অক্ষুণ্ণ ছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে মাধ্যমিক শ্রেণীতে সতীর্থ-রূপে তিনি পেয়েছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সরকারকে এবং বি. এস-সি শ্রেণীর প্রথম বর্ষে সতীর্থরূপে যোগ-দান করেন মেঘনাদ সাহা ও নিখিলরঞ্জন সেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এতগুলি কৃতী বিজ্ঞান-ছাত্রের সমাবেশ আর কখনও দেখা যায় নি। শিক্ষকরূপেও তাঁরা পেয়েছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, অধ্যাপক ডি. এন. মল্লিক, অধ্যাপক কালিস (Cullis) প্রমুখ যশস্বী শিক্ষাব্রতীদের। 1913 সালে বি. এস-সি পরীক্ষায় গণিত অনার্সে এবং 1915 সালে এম. এস-সি পরীক্ষায় মিশ্র গণিতে সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম.এস-সি পড়বার সময় 1914 সালে ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যা শ্রীমতী উষাবালাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

এম এস-সি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার অল্প কিছু কাল পরে 1916 সালে স্যার আশুতোষ নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে মিশ্র গণিত ও পদার্থবিদ্যা উভয় বিভাগে অধ্যাপনার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদকে আহ্বান জানান। 1920 সাল পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ এইখানেই উচ্চতর পদার্থবিদ্যা পঠন-পাঠন ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। 1921 সালে নব-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডারপদ গ্রহণের জন্যে তাঁর কাছে আহ্বান আসে এবং তিনি সে পদে যোগদান করেন। এইখানেই অধ্যাপনাকালে 1924 সালে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'বোস-সংখ্যায়ন' (Bose-Statistics) সম্পর্কিত সুবিখ্যাত গবেষণা-পত্রটি অধ্যাপক আইনষ্টাইনের কাছে তাঁর অভিমত জানবার জন্যে পাঠান। বোসের কাজের অভিনবত্বে আকৃষ্ট হয়ে আইনষ্টাইন নিজে এই পত্রটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সুপ্রসিদ্ধ 'ৎসাইটশিফট ফ্যুর ফিজিক্স' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-জগতে একটা আলোড়ন দেখা দেয়।

এর কিছুকাল পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্য লাভ করে তিনি দু-বছরের জন্যে ইউরোপ যাত্রা করেন। এই সময় জার্মেনীতে গিয়ে তিনি আইনষ্টাইনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ও আলোচনার এবং ফ্রান্সে মাদাম কুরীর গবেষণাগারে কাজ করবার সুযোগ পান।

ইউরোপ থেকে ফিরে আসবার পর 1927 সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকপদে যোগদান করেন এবং কিছু কাল পরে বিজ্ঞান বিভাগের ডীন নির্বাচিত হন। ঢাকায় অধ্যাপনাকালে 1929 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ-বিজ্ঞান শাখায় এবং 1944 সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের 31তম অধিবেশনে মূল সভাপতির পদে বৃত হন।

1945 সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে এসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। 1956 সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে আসীন ছিলেন এবং স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিও ছিলেন কয়েক বছর। পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এমারিটাস অধ্যাপকপদে নির্বাচিত করেন। ইতিমধ্যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদ গ্রহণের জন্যে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসে। প্রায় তিন বছর কাল উক্ত পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1959 সালে ভারত সরকার তাঁকে পদার্থ-বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই নিজের গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। 1953 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে সত্যেন্দ্রনাথের আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বীয় গবেষণা বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেটি হচ্ছে একক ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গবেষণা।

সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র ও কর্মজীবন যেমন নানা কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল, তেমনি দেশ-বিদেশের নানা সম্মাননায় তিনি সমাদৃত হয়েছিলেন। 1957

সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেন। 1961 সালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকীতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ছাড়া যাদবপুর, এলাহাবাদ, দিল্লী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দিরও (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট) তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেছেন। 1954 সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করেন এবং 1958 সালে তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন। 1974 সালে এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে সম্মানীয় সদস্য পদ প্রদান করেন। 1952-58 সালে তিনি রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। বিদেশী বৈজ্ঞানিক সংস্থার আমন্ত্রণক্রমে এবং ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি বহুবার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ প্রদানের জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 1973 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রদত্ত তাঁর বাংলা ভাষণ। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ দেবার দীর্ঘ 36 বছর পরে সত্যেন্দ্রনাথই আবার বাংলায় সমাবর্তন ভাষণ দিয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারী হয়েও তাঁর বিজ্ঞানসাধনা দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে ও দেশের জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্য মোচনের জন্যে নিয়োজিত করতে সমুৎসুক ছিলেন। আর এই কারণেই তিনি চেয়েছিলেন দেশের জনমানসে বিজ্ঞানচেতনায় প্রকৃত উন্মেষের জন্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে বিজ্ঞানচর্চা হোক। এই উদ্দেশ্যে ঢাকায় থাকাকালে সহকর্মী বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় তিনি বাংলা ভাষায় 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর তিনি তাঁর অন্তরাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে 1948 সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং তার মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ করেন। শেষ জীবনে এই বিজ্ঞান পরিষদই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান-স্বপ্ন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের কথা প্রচার ও প্রসারের জন্যে নিরন্তর প্রয়াস করে গেছেন।

1964 সালে সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিনে মহাজাতি সদনে পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে এক মহতী সভায় দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই উপলক্ষে তিন খণ্ডে বিশেষ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। প্রথম খণ্ডে আচার্য বসুর বোস-সংখ্যায়ন সম্পর্কিত দুটি বিখ্যাত গবেষণা-পত্রসমেত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-পত্রগুলির সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ্বের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের গবেষণা-পত্র এবং তৃতীয় খণ্ডে এই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা-চক্রের গবেষণা-পত্রসমূহ প্রকাশিত হয়।

আচার্য বসু মূলতঃ তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানী হলেও পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা ও জৈব রসায়নেও তাঁর অবদান বড় কম ছিল না। এছাড়া নৃতত্ত্ব, জীববিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল সুগভীর। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে সাহিত্যে, সঙ্গীত এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' আসর এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতুলনীয় বিজ্ঞান-

গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' সত্যেন্দ্রনাথের নামেই উৎসর্গ করেন। সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিতে 'বিজ্ঞানের সংকট ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থের জন্যে 1965 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী পদক প্রদান করেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তাঁর জ্ঞান ও অনুরাগ ছিল যেমন গভীর, তেমনি তিনি নিজেও ভাল এস্রাজ বাজাতে পারতেন।

এই বছর (1974) আচার্য বসুর অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পয়লা জানুয়ারী তাঁর জন্মদিনে বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে জন্মোৎসব কমিটি (স্থানীয় শাখা) ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের যৌথ উদ্যোগে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। বোস-সংখ্যায়নের 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে 4—11 জানুয়ারী বসু বিজ্ঞান মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ও অন্যান্য দিনে আচার্য বসু উপস্থিত ছিলেন। 1973 সালের 29 ও 31শে ডিসেম্বর কলিকাতা গণিত সমিতির উদ্যোগে এই উপলক্ষে আচার্য বসুকে সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা দু-দিনব্যাপী সেমিনারে যোগদান করেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের রজত জয়ন্তী ও আচার্য বসুর 80তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিজ্ঞান কলেজে যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, 22শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন, সেই অনুষ্ঠানে আচার্য বসু শেষ বারের মত বিজ্ঞান কলেজে এসেছিলেন। এর পর 24শে জানুয়ারী থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং 4ঠা ফেব্রুয়ারী সোমবার ভোরে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিজ্ঞানী হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্ব-বিশ্রুত। কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁর যে পরিচয়, তা তাঁকে আরও মহীয়ান ও গরীয়ান করেছে। সাজ-পোশাক, চালচলন, কথাবার্তায় তিনি ছিলেন সরল, অমায়িক ও আত্মউদাসীন। বোস-সংখ্যায়নের মত তিনি নিজেও ছিলেন 'অবারিত দ্বার'—পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড় যে কেউ তাঁর সঙ্গে যে কোন উপলক্ষে অবাধে দেখা করতে পারতেন এবং যিনি একবার তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তিনিই আচার্য বসুর স্নেহশীল দরদী-মনের স্পর্শ পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ আজ চলে গেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান জগতে অনন্যসাধারণ অবদানের দ্বারা তিনি যে নবদিগন্তের উন্মেষ করে গেছেন এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্বদেশ-বাসীর যে অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন, তাই তাঁর অক্ষয় কীর্তিস্বরূপ 'কালের কপোলতলে' সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরদিন।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

বলাইচাঁদ কুণ্ডু

আমাদের ছাত্রাবস্থাতে আচার্যদেবের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয় নি। আমরা সেই সময় চারজন খুব কৃতী বিজ্ঞানীর নাম শুনতাম—আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে বিশেষ ব্যাকুল ছিলাম। অবশ্য পরে এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয়েছিল ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

1939 সালে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপকরূপে যোগদান করি। এর আগে দুই বছর লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাট ও অন্যান্য তন্তু নিয়ে কিছু গবেষণা করি। সেই সব গবেষণার ফল কিছু কিছু প্রকাশিত হলে সেগুলি অধ্যাপক সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি একখানি চিঠি দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠান ও সেই সব গবেষণা সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তন্তুকোষের কোষাবরণের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এজন্যে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। সেই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল। বিদেশী যন্ত্রপাতি পাওয়া কঠিন ছিল, গবেষণার জন্য আমার একটি পোলারাইসিং মাইক্রস্কোপের বিশেষ আবশ্যক ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে তা ছিল না। অধ্যাপক সাহা আমাকে একটি অতি মূল্যবান Leitz পোলারাইসিং মাইক্রস্কোপ দিয়ে বললেন—তুমি নিয়ে যাও, কাজ শেষ হলে ফেরৎ দিও। তাঁর এই মহানুভবতায় আমি অভিভূত হয়েছিলাম এবং তাঁর এই সহৃদয়তার কথা কোন দিনই ভুলতে পারব না।

1945 সালের 2রা জানুয়ারী ঢাকাতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় পাট কৃষি গবেষণাগারের অধ্যক্ষরূপে যোগদান করি। কলকাতা থেকে খবর নিয়ে এসেছিলাম যে, শীঘ্রই আচার্য বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করবেন। ঢাকাতে গিয়ে খবর নিয়ে জানলাম যে, তখনও অধ্যাপক বসু ঢাকাতে আছেন। একদিন দেখা করতে গেলাম তাঁর ল্যাবোরেটারিতে। অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। বললেন—'আমি শুনেছি তুমি এখানে এসেছো। এতে আমি খুব খুশী হয়েছি।' আসবার সময় তাঁকে বলেছিলাম, আশীর্বাদ করুন, যেন কিছু ভাল কাজ করতে পারি। তিনি সহাস্য মুখে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন।

আমাদের পাট গবেষণাগারের কতকগুলি গবেষণামূলক সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়, এই নিয়ে আমাদের মধ্যে কয়েক দিন আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু সঠিক সমাধানের পথ আমরা পাই নি। ব্যাপারটি কৃষি-রসায়ন সম্পর্কীয়। আচার্য বসুর রসায়ন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের কথা আমাদের শোনা ছিল। তাই ভাবলাম, এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলে কেমন হয়। তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমস্যাটির কথা বললাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন—'পরশু এসো, কিছু ভেবে বলবো। যথাসময়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর অমূল্য উপদেশ পেয়ে আমরা খুবই উপকৃত হয়েছিলাম।

ভারত বিভাগের পর কলকাতার কাছে নতুন করে পাট কৃষি গবেষণাগার স্থাপিত হলো। গবেষণা ব্যতীত সারা ভারতে পাটের উন্নয়ন

ব্যাপারে আমাদের কার্যের ব্যাপকতা খুব বেড়ে গেল। এই সব কারণে আমাকে প্রায়ই দিল্লী যেতে হতো। সেই সময় দিল্লীতে আমার সহপাঠী বন্ধু বারীন পাল কেন্দ্রীয় explosives বিভাগের প্রধান ছিল। আমি প্রায়ই হাঁপানিতে ভুগতাম। তাই বারীন আমাকে বললো—তুই স্বচ্ছন্দে আবার বাসাতে উঠতে পারিস। Lytton Lane-এ বারীনের প্রশস্ত বাংলো বাড়ী। বহুদিন যাবত বারীনের ওখানেই উঠতাম। অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ শ্রীমতী পালের ভগনী-পতি, অধ্যাপক বসুর সঙ্গেও তাঁর নিকট সম্পর্ক ছিল। সেই সময় বারীনের বাড়ীতে এই দুই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো ও নানা বিষয়ে আলোচনা হতো।

অধ্যাপক বসু কিছু দিন রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন, এজন্যে দিল্লীতে Western Court-এ তাঁর একটি ফ্ল্যাট ছিল। কিন্তু শ্রীমতী পালের আগ্রহে অনেক সময় তাঁর বাড়ীতেও উঠতেন। একবার আমি একটা জরুরী কাজে হঠাৎ দিল্লী গেলাম; ঠিক ছিল, বারীনের ওখানেই উঠব—অবশ্য একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। বারীনের ওখানে গিয়ে দেখি অধ্যাপক বসু আছেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন; 'আরে এসো, এসো, তবে তোমার ঘর আমি অধিকার করে আছি।' আমি তাঁকে প্রণাম করে বললাম; 'ভাবনার কিছু নেই। জানি শ্রীমতী পাল আমার জন্যে অন্য ঘরের ব্যবস্থা করে রাখবেন। সাত দিন সেবার দিল্লীতে থাকতে হয়েছিল। কি আনন্দে কেটেছিল সেই কটা দিন অধ্যাপক বসু ও বারীনদের সকলের সঙ্গে। সে কথা কোন দিনই ভুলব না।

1960 সালে জুন মাসে আমি লক্ষ্ণৌতে কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগারে সহকারী অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করি। তৎকালে এঁদের ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় (আমাদের সকলের বিষ্ণুদা) ওখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন। বিষ্ণুদাও আচার্য দেবের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। আমাকে প্রায়ই কলকাতাতে আসতে হতো। প্রত্যেক বারই আচার্য বসুর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যাবার সুযোগ হতো। উনি আমাকে লক্ষ্ণৌ-এর বাঙালী বিজ্ঞানীদের নিকট 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রচার করবার জন্যে বলতেন। এজন্যে আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করতাম।

1965 সালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কাজ করবার জন্যে আহূত হয়ে জুলাই মাসে এখানে যোগদান করি। এখানে আসবার পর আচার্য বসুর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি আমাকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে বলতেন। তাঁকে স্বর্গীয় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাংলায় কৃষিবিষয়ক পুস্তকের কথা বলেছিলাম। উনি বলেছিলেন যে, তিনি রাজেশ্বর-বাবুর লেখা বই দেখেছেন। এখন দেশে কৃষি-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমরা সেই সব কথা বাংলায় লিখে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশ করি না কেন?

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কাজ করবার সময় কয়েকবার বিদেশে নিমন্ত্রিত হয়ে যাই। বিদেশে যাবার আগে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে যেতাম। 1966 সালে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এসে তাঁকে সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলাম। তিনি পেরু, ব্রেজিল, গুয়াটেমালা প্রভৃতি দেশের কাহিনী শুনে আমাকে বলেছিলেন: 'তুই এই সব কাহিনী বাংলাতে লেখ না কেন?' পরে দেখা হলেও তিনি ঐ সব কাহিনী লেখবার জন্যে উৎসাহ দিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার তা হয়ে ওঠে নি। কিন্তু আজ ভাবি, আর কেউ আমাকে বাংলা ভাষাতে প্রবন্ধ লিখতে অমন করে বলবেন না।

শোক-বার্তা

[আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মহাপ্রয়াণে দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান সংস্থা, শিক্ষায়তন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও অনুরাগীদের কাছ থেকে অনেক শোক-বার্তা এসেছে। স্থানাভাবে সব শোকবার্তা প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় কয়েকটি মাত্র এখানে সংকলন করা হয়েছে।]

অধ্যাপক বসু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব রেখে গিয়েছেন, তা অবিস্মরণীয়। তাঁরই কাজের জন্যে সারা বিশ্বে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শ্রী ভি. ভি. গিরি

ভারতের রাষ্ট্রপতি

*

দেশ মাত্র কয়েক দিন আগে অধ্যাপক বসুর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করেছিল। আজ তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমি গভীরভাবে দুঃখিত।

তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন শ্রুতকীর্তি পণ্ডিত এবং প্রথিতযশা নাগরিককে হারালো। অধ্যাপক বসু ছিলেন একজন মহান বিজ্ঞানী ও মনস্বী। তিনি মনে করতেন গবেষণাগার ও পাঠকক্ষের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা বিজ্ঞানীর একমাত্র কর্তব্য নয়। সমাজের প্রতি বিজ্ঞানীদের যে কর্তব্য রয়েছে, সে কথা তিনি কখনও ভুলে যান নি। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি তিনি অকৃপণভাবে বিতরণ করেছেন নানা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থায়।

সর্বোপরি তাঁর মধ্যে যে আন্তরিকতা ও সারল্য দেখেছি, তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরলোকগমনে তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 11ই ফেব্রুয়ারী, 1974 তারিখে যে শোক-সভার আয়োজন করছেন, তাতে যোগ দেওয়ার জন্যে পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু আমায় অনুরোধ করেছেন। এই সভায় উপস্থিত থাকবার আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় আমার পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

প্রায় 60 বছর ধরে অধ্যাপক বসুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ সম্পর্কেও তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা করবার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ আমাকে বহুবার মুগ্ধ করেছে।

অধ্যাপক বসুর মৃত্যুতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে একত্র হয়ে তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর পরিবারবর্গকে জ্ঞাপন করছি আমার আন্তরিক সহানুভূতি *

দেবেন্দ্রমোহন বসু

(বসু বিজ্ঞান মন্দির)

[* 11-2-74 তারিখে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শোক-সভায় পঠিত]

*

বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী এবং বাংলার মহান সন্তান ডক্টর সত্যেন বোসের প্রয়াণে আমি গভীর মর্মাহত হয়েছি। বিজ্ঞান ও মানবতার ক্ষেত্রে তাঁর মহান অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শেখ মুজিবুর রহমান

প্রধান মন্ত্রী, বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের উদ্যোগে 6ই ফেব্রুয়ারী 1974-এ অনুষ্ঠিত শোকসভায় এই বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোসের আকস্মিক তিরোধানে বিভাগীয় ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ শ্রদ্ধাবনতচিত্তে শোক প্রকাশ করছে। কোয়ান্টাম-সংখ্যায়নের জনক—বোস-সংখ্যায়নের প্রবক্তা অধ্যাপক বোসের বিজ্ঞান-জগতে অমর অবদানের কথা এবং এই বিভাগের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্কের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এই সভা স্মরণ করছে।

এই সভা প্রস্তাব করছে: (ক) অধ্যাপক বোসের স্মৃতি রক্ষার্থে ও তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের ক্ষুদ্র প্রতীকস্বরূপ তাঁর নামানুসারে একটি বিভাগীয় 'বোস চেয়ার' প্রতিষ্ঠা করা হোক। এবং (খ) তাঁর নামানুসারে বিজ্ঞান পাঠাগারের নাম 'বোস গ্রন্থাগার' রাখা হোক।

আ. খ. ম সিদ্দিক
বিভাগীয় অধ্যক্ষ, পদার্থবিদ্যা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

*

He was a great scientist and a human being of unequalled and almost transcendental character. His scientific intuition was such that he even sparked the mind of a genius like Einstein and my dear wife, Mimi and I were fortunate to witness several meetings of these great minds.

The world has lost an eminent scientist and a sage of superhuman proportions. We are mourning for a dear and unforgettable friend.

God bless you and give you the strength to follow his example.

Very sincerely youre,
Herman Mark

*

The consulate general of the USSR in Calcutta extends to you our sympathy and condolence on the occasion of passing away of your father, prominent Scientist National Professor Satyendranath Bose.

The Soviet Scientists know his outstanding contribution to quantum statistics and deeply grief his demise.

Consulate General
U. S. S. R. (Calcutta)

*

Shrimati Bose,

May I offer you and your family my sincere and heartfelt sympathy in your great sorrow, Professor Bose was an outstanding personality who I had the honour to meet several timest. I remember his lively interest in my country. His passing away will be greatly mourned through India and the whole scientific world.

Dr. H. F. Linsser
Consul General
The Federal Republic of Germany

শোক ও স্মরণ-সভা

[আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মহাপ্রয়াণে পশ্চিম বঙ্গ ও ভারতের নানা স্থানে এবং বাংলাদেশে বহু শোক ও স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি সভার বিবরণ এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।]

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর তিরোধানে 9ই ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির এবং 11ই ফেব্রুয়ারী সদস্যদের দুটি শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন আচার্য বসুর সহপাঠী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের সৌহার্দ ও অন্তরঙ্গতার স্মৃতিচারণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ ছাড়া এই সভায় আচার্য বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, জয়ন্ত বসু, রবীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীমদনমোহন সিংহানিয়া, স্বপন চ্যাটার্জী, সুধীর বসু, দিবাকর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। উভয় সভাতেই এক মিনিটকাল নীরবতা পালন করে দুটি শোক-প্রস্তাব গৃহীত হয়। (শোক-প্রস্তাব দুটি বর্তমান সংখ্যার প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ আছে)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

6ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে এক শোক-সভায় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়।

শোক প্রস্তাব উত্থাপন করে উপাচার্য ডক্টর সেন বলেন, আচার্য বসু ছিলেন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন, এটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব। কেবল বিজ্ঞানেই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকেও তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন। বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষারও মাধ্যম করবার জন্যে তিনি আজীবন চেষ্টা করে গিয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে জাতির এই ক্ষতি অপূরণীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের অধ্যাপক, ছাত্র ও কর্মীরা নত মস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে আচার্য বসুর মৃত্যুতে শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট

গত 6ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দিরের (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট) অধ্যাপক, গবেষক ও কর্মীদের এক সভায় আচার্য বসুর তিরোধানে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং এই গবেষণা কেন্দ্রের উন্নয়নে ও পরিচালনে তাঁর বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

17ই ফেব্রুয়ারী পরিষদের রমেশ ভবনে জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে একটি শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অধ্যাপক পরিমলকান্তি ঘোষ, ডক্টর মহাদেব দত্ত, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, ডক্টর মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, ডক্টর জয়ন্ত বসু, ডক্টর সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, অধ্যাপক মদনমোহন কুমার, শ্রীরমেশ ঘোষ প্রমুখ আচার্য বসুর স্মৃতিচারণ করেন।

বোস-সংখ্যায়ন-এর 50 বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি (স্থানীয় শাখা)

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়াণে তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকল্পে কমিটি বঙ্গীয় বিজ্ঞান

পরিষদের ভবনে 15ই ফেব্রুয়ারী—17ই ফেব্রুয়ারী তিন দিনব্যাপী স্মরণ-সভার আয়োজন করেন। 15ই ফেব্রুয়ারী আচার্যের আদ্যশ্রাদ্ধের দিন সকালে স্মরণ-সভায় পৌরোহিত্য করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু-কুমার বসু। এইদিন 'ছবিতে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি প্রদর্শনীর সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে আচার্য বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি। সভাপতি অধ্যাপক বসু ও অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন; বৈতানিক শিল্পী গোষ্ঠী আচার্যের প্রিয় কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং এই অনুষ্ঠানে আচার্যের ভাষণের টেপ-রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়। 17ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় তাঁর ছাত্রছাত্রীরা আচার্য বসুর প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীতগুলি পরিবেশন করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

কলিকাতা গণিত সমিতি

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ বিজ্ঞান কলেজে সমিতির হলে গত 13ই ফেব্রুয়ারী কার্যকরী সমিতি ও সাধারণ সদস্যদের সভায় দুটি শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করে আচার্য বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কলিকাতার নাগরিকদের স্মরণ-সভা

কলিকাতার শেরিফ শ্রীরুণী গিমির আহ্বানে গত 2রা মার্চ রবীন্দ্র সদনে নাগরিকদের এক স্মরণ-সভায় মুখ্য মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, শ্রীমতী রেণুকা রায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন আচার্য বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্স-এর পক্ষ থেকে আচার্যের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে পাঠ ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সভায় মুখ্য মন্ত্রী ঘোষণা করেন, আচার্য বসুর একটি প্রামাণ্য জীবনগ্রন্থ রচনার জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হবে।

গৌরীবাড়ী তরুণ পাঠাগার

অধ্যাপক পরিমলকান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে গত 17ই ফেব্রুয়ারী উল্টাডাঙ্গা ইউনাইটেড হাই স্কুলের ভবনে একটি শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, ডক্টর মহাদেব দত্ত, ডক্টর জয়ন্ত বসু, ডক্টর মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীলকুমার পাল, শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি আচার্য বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে বি. টি. রোডের নাম পরিবর্তন করে 'আচার্য সত্যেন বোস সরণি' রাখবার প্রস্তাব হয়।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন

গত 19শে ফেব্রুয়ারী রামমোহন লাইব্রেরী হলে শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে একটি শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডাঃ কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীজীবনতারা হালদার, অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর অজিত ঘোষ প্রভৃতি আচার্য বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কিশোর কল্যাণ পরিষদ

গত 23শে ফেব্রুয়ারী গিরিশ পার্কে ফ্রেণ্ডস ইউনাইটেড ক্লাবের হলে পরিষদের উদ্যোগে একটি স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক পরিমলকান্তি ঘোষ সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীজীবনতারা হালদার, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীরাধারমণ মিত্র, ডক্টর ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক এবং ডক্টর মহাদেব দত্ত আচার্য বসুর স্মৃতিচারণ করেন।

আচার্যের প্রিয় রবীন্দ্র ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীপ্রসাদকুমার সেন; শ্রীমতী বাণী দাশগুপ্তা, বিচিত্রিতা ও পরিষদের শিল্পীরা।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

গত 10ই ফেব্রুয়ারী বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ) 'যোগেন্দ্র-নারায়ণ মিলনী' হলে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্মরণে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার উদ্যোক্তারা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কল্লোল যুগের প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীমণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব)। ঢাকায় থাকাকালীন বিজ্ঞানাচার্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, বিজ্ঞানাচার্যের সাহিত্য-ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলি তিনি তাঁর সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মুক্তাগাছার (ময়মনসিংহ) রাজপরিবারের সন্তান বিজ্ঞানাচার্যের অন্যতম সুহৃদ শ্রীজীবেন্দ্র কিশোর আচার্যচৌধুরী। উক্ত সভায় সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক অবদান এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্যে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার বিষয় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও অমূল্যচরণ গুহ এবং 'বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার' সম্পাদকদ্বয়—শ্রীঅলোক সেন ও শ্রীবিমল বসু।

নর্থ ক্যালকাটা ইয়ুথ লীগ

নর্থ ক্যালকাটা ইয়ুথ লীগের উদ্যোগে গত 24শে ফেব্রুয়ারী রাণী ভবানী স্কুলে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরলোকগমনে এক স্মৃতি-সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র। ডক্টর জয়ন্ত বসু, শ্রীরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ডাঃ অসিত সাহা, শ্রীস্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিজ্ঞানাচার্য বসুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং একটি শোক-প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গত 6ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ এক শোক-সভায় মিলিত হয়ে আচার্য বসুর স্মৃতি রক্ষার্থে ও তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের ক্ষুদ্র প্রতীক-স্বরূপ একটি বিভাগীয় অধ্যাপকের পদ ('বোস চেয়ার') প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর নামানুসারে বিজ্ঞান পাঠাগারের নাম 'বোস গ্রন্থাগার' রাখবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান সমিতির উদ্যোগে গত 11ই ফেব্রুয়ারী অধ্যাপক আহমদ হোসেনের সভাপতিত্বে এক শোক-সভায় আচার্য বসুর অমূল্য অবদান এবং তাঁর উন্নত চরিত্র ও বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞপ্তি

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 8নং ফর্ম

অনুযায়ী বিবৃতি ঃ—

1. যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়, তাহার ঠিকানা ঃ—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
2. প্রকাশনের কাল—মাসিক
3. মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
4. প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয় পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
5. সম্পাদকের নাম

সম্পাদকের নাম	জাতি ও ঠিকানা
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রধান সম্পাদক)	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাককৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীজয়ন্ত বসু	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6

6. স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান), পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

আমি, শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে

তাং 7-3-74

প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা

স-ব-চে-য়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তবিংশতিতম বর্ষ — এপ্রিল, 1974 — চতুর্থ সংখ্যা

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ যা চেয়েছিলেন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু সারা জীবনব্যাপী যে সাধনা তিনি করে গেছেন এবং যে স্বপ্নকে রূপায়িত করবার জন্যে শেষ দিন পর্যন্ত প্রয়াস করেছেন, তা আমাদের সামনে রয়েছে। আচার্য বসুর বিজ্ঞান সাধনার মূলে ছিল একটি বিশেষ প্রেরণা—তাঁর দেশপ্রেম। ছোটবেলা থেকেই স্বদেশী যুগের আবহাওয়ায় তিনি লালিতপালিত ও বর্ধিত হয়েছেন। তাঁর যখন ছাত্রাবস্থা, তখন বাংলার সমাজ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আলোড়িত। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে—'স্কুলের পড়া তখনও শেষ হয় নি, এলো দেশে স্বদেশীয়ানার জোয়ার। কিশোর বয়সে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি—রাখীবন্ধনের গান গেয়ে অনুভব করতে চেয়েছি ভাই ভাই আমরা সকলে, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই ভারতমাতার সন্তান। দীন ভারতমাতার দুঃখ দূর করতে হবে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে হবে—বিদেশীর নিষ্করুণ শাসন ও শোষণনীতি থেকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে পুরাতন ঐতিহ্যসম্পন্ন একটা মহাজাতিকে।'

এই স্বদেশীয়ানার আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ প্রমুখেরা বিজ্ঞান-চর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। যে যুগে কৃতবিদ্য প্রায় সকল ছাত্রই আইন শিক্ষা ও আইনবিদ্যাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করতেন, সে যুগে কেন তাঁরা দুঃসাহসিক পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন—'আমরা ভেবেছিলাম গতানুগতিকের পথে পা না বাড়িয়ে বিজ্ঞান-চর্চার মধ্য দিয়েই আমরা দেশসেবা এবং দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করতে পারবো।'

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনন্ত বৈজ্ঞানিক অবদানের

যাঁরা দেশমাতৃকার মুখ সত্যই উজ্জ্বল করেছিলেন এবং বিশ্বের বিজ্ঞান মানচিত্রে ভারতের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তিনি আত্মমগ্ন থাকেন নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বিজ্ঞানের যে সুফল, তা দেশবাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে এবং জনসাধারণের মনে বিজ্ঞান-চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে, নইলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রগতি কখনও সম্ভব হবে না। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচারের দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে—এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তাই তাঁর অন্তরাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্তে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে 1948 সালে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশ করেন।

আজ 27 বছর ধরে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তার নানা কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে দেশের জনসাধারণের মনে বিজ্ঞান-চেতনা জাগিয়ে তোলবার জন্তে চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ যা চেয়েছিলেন, তা আমরা এখনও পূর্ণ করতে পারি নি। বিজ্ঞান পরিষদের বর্তমান যা কিছু কর্মপ্রয়াস, তা প্রধানতঃ শহরাঞ্চলের মধ্যে সীমিত। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছেও বিজ্ঞানের কথা প্রচার করতে হবে এবং বিজ্ঞানের সুফল পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা আজ পর্যন্ত কতটুকু করতে পেরেছি? 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় যে ধরণের নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে তিনি বহুবার আমাদের প্রশ্ন করেছেন—তোমরা কাদের জন্তে লিখেছ?

বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা ও জটিল বিষয় আলোচনা করবার অপেক্ষা তিনি চাইতেন সাধারণ মানুষের যে সব বিষয় জানলে উপকার হয়, যেমন চাষাবাদ, ছোটখাটো শিল্প ইত্যাদিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, সে সম্বন্ধে আলোচনা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ বিশেষভাবে প্রকাশ করা উচিত। এ জন্তে তিনি প্রায়ই আমাদের বলতেন—দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছে, তার কথা লেখ। চাষাবাদে যাঁরা ব্যাপৃত আছেন, তাঁরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন, সে বিষয়েও তিনি লিখতে বলতেন; অর্থাৎ তিনি চাইতেন—বিজ্ঞান-শিক্ষায় শিক্ষিত বা বিশেষজ্ঞদের কথা না ভেবে দেশের সাধারণ মানুষের (যাঁরা বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণের সুযোগ পান নি) কথা মনে রেখেই আমাদের লেখা উচিত। তাঁর এই অন্তরাকাঙ্ক্ষাকে আমরা যে এখনও পূর্ণ করতে পারি নি—একথা অনস্বীকার্য।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ প্রবন্ধ প্রকাশকালে এই দিকটির প্রতি আমাদের যেমন বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, অপর দিকে তেমনি গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের কথা প্রচারের জন্তে আমাদের বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে। শুধু শহরের বুকে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন না করে, মাঝে মাঝে যাতে গ্রামাঞ্চলেও এই ধরণের প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায়, তার চেষ্টাও আমাদের করতে হবে। এর জন্তে প্রয়োজন সরকার ও জনসাধারণের অর্থসাহায্য ও সহযোগিতা। আমরা আশা করবো, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই বিষয়ে সরকার ও দেশবাসীর যথোচিত সাহায্য ও সহযোগিতা পাবে।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নক্ষত্রে তেজের সৃষ্টি

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ

বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে সূর্যের আনুমানিক পরমায়ু 1500 কোটি বছরের মধ্যে 500 কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বিগত এই দীর্ঘ কালে তার তেজ বিকিরণের মাত্রা কোন দিনই হ্রাস পেল না। সূর্য এক সেকেণ্ড সময়ে যে তেজ বিকিরণ করে, মানবেতিহাসের সম্পূর্ণ কালের মধ্যেও ততটুকু মাত্র তেজ মানুষ ব্যবহার করে উঠতে পারে নি। সূর্যের এই অমিত তেজের উৎস কি? এই অফুরন্ত ভাণ্ডার তার কোথা থেকে আসে? এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীরা অনেক কাল ধরে খুঁজছেন। কখনও কখনও নানাবিধ তত্ত্বও প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু গ্রহণযোগ্য সমাধানের ইঙ্গিত পেতে বিংশ শতাব্দীর তিনটি দশক কেটে গেছে। চতুর্থ দশকের প্রারম্ভে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন-তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, পরবর্তী বিজ্ঞানীরা তার সাহায্যেই সূর্যের অভ্যন্তরে পারমাণবিক বিক্রিয়া (Nuclear reaction) দ্বারা তেজ সৃষ্টির সম্ভাব্যতা নির্ণয় করেন। শুধু সূর্যের নয়, অন্যান্য নক্ষত্র যে তেজ বিকিরণ করে চলেছে, তাও তাদের অভ্যন্তরে পারমাণবিক বিক্রিয়ার দ্বারা প্রসূত। এই তথ্য আবিষ্কৃত হলো 1938 সালে দুটি পৃথক পৃথক পারমাণবিক বিক্রিয়া শৃঙ্খল উদ্ভাবনের ফলে।

বিক্রিয়াদ্বয়ের একটির নাম প্রোটন শৃঙ্খল (Proton chain), অপরটির নাম কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র (Carbon-Nitrogen cycle) বা সংক্ষেপে শুধু কার্বন চক্র (Carbon cycle)।

প্রোটন শৃঙ্খল খণ্ড খণ্ড ভাবে হান্‌স্ বেথে (H. Bethe), সি, ক্রিচফিল্ড (C. Critchfield) ও সি, লরিটসেন (C. Lauritsen) নামক তিন বিজ্ঞানীর অবদান। কার্বন চক্রের উদ্ভাবক হান্‌স্ বেথে এবং কার্ল ফন ভাইসসেকার (Carl Von Weizsacker)। এই দুই বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা চালিয়ে ঐ একই কার্বন চক্র উদ্ভাবন করেন।

পরমাণু

সর্বাগ্রে পরমাণুর গঠন-বিন্যাস ও তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা আবশ্যক। পদার্থ কতকগুলি অণুর সমষ্টি। অণু গঠিত হয় এক বা একাধিক পরমাণুর সমবায়ে। পক্ষান্তরে পরমাণু আবার কতকগুলি কণার দ্বারা সৃষ্ট। পরমাণুর প্রধান তিনটি কণার নাম প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন (Proton, Electron & Nutron)। যে সকল পদার্থের অণু একজাতীয় একটি বা একাধিক পরমাণুর দ্বারা গঠিত, তাদের বলে মৌলিক পদার্থ বা মৌল (Element) এবং যে সকল পদার্থের অণু দুই বা ততোধিক জাতীয় পরমাণুর দ্বারা গঠিত তাদের বলে যৌগিক পদার্থ (Compound)।

রাদারফোর্ড (Rutherford) বলেন, পরমাণু বলতে বুঝায়—ঘন সন্নিবিষ্ট প্রোটন ও নিউট্রন কণার একটি কেন্দ্রীনের (Nucleus) চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন কণা। এক্ষেত্রে হাইড্রোজেন শুধু ব্যতিক্রম। হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীনে কোন নিউট্রন নেই, আছে কেবলমাত্র একটি প্রোটন ও তার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান একটি মাত্র ইলেকট্রন। অন্য সকল পরমাণুর কেন্দ্রীনে কয়েকটি প্রোটন ও কয়েকটি

নিউট্রন ঘন সন্নিবিষ্টভাবে অবস্থান করে এবং তার চারদিকে বিভিন্ন কক্ষে কেন্দ্রীনস্থ প্রোটনের সমসংখ্যক ইলেকট্রন প্রদক্ষিণ করে, ঠিক যেমন সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহগণ আপন আপন কক্ষে প্রদক্ষিণ করে।

ইলেকট্রন ঋণাত্মক বিদ্যুৎ কণা, প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা, নিউট্রনের কোন বিদ্যুৎ-আধান (Charge) নেই। একটি প্রোটন কণায় যতটুকু বিদ্যুৎ-শক্তি, একটি ইলেকট্রন কণায়ও ঠিক তাই, কিন্তু তারা বিপরীত-ধর্মী; অর্থাৎ একটি প্রোটন কণার বিদ্যুৎ-আধান যদি হয় +1 একটি ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ-আধান হবে −1, এরা দুয়ে একত্রিত হলে উভয়েরই বিদ্যুৎ-শক্তি লুপ্ত হয়ে একটি বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন কণার সৃষ্টি হয়। পরমাণুর কেন্দ্রীনের প্রোটনের সংখ্যার সঙ্গে তার বহির্কক্ষের ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান বলে পরমাণুটিরও কোন বিদ্যুৎ-শক্তি নেই। কিন্তু বহির্কক্ষের ইলেকট্রন সহজেই স্থানচ্যুত হয়ে যেতে পারে। এভাবে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বহির্কক্ষ থেকে বিতাড়িত হলে পরমাণুটিকে আয়নিত (Ionised) হওয়া বলে। এরূপ হলে পরমাণুট অবশ্যই ধনাত্মক বিদ্যুৎ-আধানসম্পন্ন হয়ে পড়বে। অতএব ঋণাত্মক বিদ্যুতের প্রতি তার একটা আকর্ষণ উৎপন্ন হবে। আয়নিত হওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে পরমাণু থেকে কতগুলি ইলেকট্রন বেরিয়ে গেল— তার উপর। আয়নিত পরমাণু আবার নিকটস্থ উৎস থেকে ইলেকট্রন কণা আকর্ষণ করে নিয়ে পলাতক কণা কয়টির স্থান পূরণ করে নেয় এবং সাম্যাবস্থায় ফিরে আসে। ঘর্ষণ, আলোকরশ্মির আঘাত প্রভৃতি সামান্য কারণেই পরমাণু আয়নিত হতে পারে। দুই খণ্ড রেশম বা দুই খণ্ড নাইলনের পরস্পর ঘর্ষণে তাদের পরমাণু আয়নিত অর্থাৎ বিদ্যুতান্বিত হয় বলে একটা খর্ খর্ আওয়াজ ওঠে। শুক্‌নো চুল আঁচড়াবার সময়ে কোন কোন চিরুণীর পরমাণু আয়নিত হয়ে আশে-পাশের চুলের ইলেকট্রন আকর্ষণ করে। আলোক-রশ্মির আঘাতেও পরমাণু আয়নিত—ভাষান্তরে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বহিষ্কৃত হয়। আলোক সম্পাতে পরমাণুর ইলেকট্রনের নিষ্ক্রমণকে ফটো-ইলেকট্রিক (Photo-Electric) প্রক্রিয়া বলে। প্রক্রিয়াটি নক্ষত্রে যেমন প্রবল, তেমন আর কোথাও নয়। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে পরমাণুসমূহ প্রায় সামগ্রিকভাবে ইলেকট্রন বঞ্চিত অবস্থায় আছে।

উপরে বলা হয়েছে পরমাণুর কেন্দ্রীনে আছে ঘনসন্নিবিষ্ট কয়েকটি প্রোটন ও নিউট্রন কণা। আমাদের জানা আছে বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুৎ-কণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সমধর্মী বিদ্যুৎ কণা পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। তাহলে ধনাত্মক বিদ্যুৎ-যুক্ত একাধিক প্রোটন কণা কিভাবে পরমাণুর কেন্দ্রীনে সহাবস্থান করে? উত্তরে বলা যায়, কেন্দ্রীন শক্তির (Nuclear force) প্রভাবে প্রোটনগুলি একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, সংলগ্ন থেকে যায়। কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা যদি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, তাহলে তাদের সম্মিলিত বিদ্যুৎ-শক্তিও তদনুপাতে বাড়বে। সেক্ষেত্রে ক্রমে এমন অবস্থা আসবে যে, সেই সম্মিলিত বিদ্যুৎ-শক্তি উল্লিখিত কেন্দ্রীন শক্তিকে অতিক্রম করে যাবে। এরূপ হলে কেন্দ্রীন থেকে অতিরিক্ত প্রোটন কণা পালিয়ে গিয়ে পরমাণুটিকে সাম্যাবস্থায় আনতে চেষ্টা করবে। এজন্যেই নৈসর্গিক জগতে ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারী পরমাণুর অস্তিত্ব নেই। ইউরেনিয়ামে আছে 92টি প্রোটন কণা, এর চেয়ে ভারী পরমাণু অর্থাৎ 92 অপেক্ষা বেশী প্রোটনযুক্ত পরমাণু যদি কোন দিন থেকেও থাকে, এখন আর তার কোন অস্তিত্ব নেই। এমন কি, ভারী পরমাণুগুলিও অস্থায়ী—সেগুলি ক্রমে ভেঙ্গে ভেঙ্গে হাল্কা স্থায়ী পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন, ইউরেনিয়াম স্বতঃই ভেঙ্গে ধীরে ধীরে সীসায় পরিণত হচ্ছে।

বিদ্যুৎ-আধানহীন পরমাণুতে যে কয়টি

ইলেকট্রন প্রদক্ষিণরত থাকে, তাকে বলে সংশ্লিষ্ট মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic number)। বস্তুতঃ আয়নিত নয় এমন পরমাণুতে যে কয়টি ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান, ঠিক সেই কয়টি প্রোটনই পরমাণুর কেন্দ্রীনে অবস্থিত। সুতরাং কেন্দ্রীনের প্রোটনের সংখ্যাই সংশ্লিষ্ট মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা। কেন্দ্রীনের প্রোটন ও নিউট্রন একযোগে যে সংখ্যা, তাকে বলে সংশ্লিষ্ট মৌলের-পারমাণবিক ভর (Atomic mass)। একটি প্রোটন কণার যে ভর, একটি নিউট্রন কণারও প্রায় সেই ভর। কিন্তু একটি ইলেকট্রন কণার ভর এত সামান্য যে, তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। একটি ইলেকট্রন কণার ভর $9{\cdot}1091 \times 10^{-28}$ গ্র্যাম, একটি প্রোটন কণার ভর একটি ইলেকট্রনের ভরের 1836·12 গুণ এবং একটি নিউট্রন কণার ভর একটি ইলেকট্রনের ভরের 1835·65 গুণ। এজন্যে ইলেকট্রনকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যা যোগ করে সংশ্লিষ্ট মৌলের পারমাণবিক ভর নির্ণীত হয়।

অক্সিজেনের পরমাণু-কেন্দ্রীনে 8টি প্রোটন, 8টি নিউট্রন আছে বলে তার সাংকেতিক ভাষ্য $_{8}O^{16}$ বা $^{16}_{8}O$ বা শুধু O^{16}। তেমনি লোহের পরমাণু কেন্দ্রীনে 26টি প্রোটন ও 30টি নিউট্রন থাকায় তার সংকেত $_{26}Fe^{56}$ বা $^{56}_{26}Fe$ বা Fe^{56}। অর্থাৎ সাংকেতিক ভাষ্য হচ্ছে

$$^{\text{পাঃ ভর}}_{\text{পাঃ সংখ্যা}}\text{মৌল} \quad \text{বা} \quad \frac{\text{পাঃ ভর}}{\text{পাঃ সংখ্যা}}\,\text{মৌল} \quad \text{বা} \quad \text{মৌল}^{\text{পাঃ ভর}}$$

আইসোটোপ (Isotope)

মৌল পদার্থের রাসায়নিক ধর্মাবলী নির্ভর করে তার পরমাণু-কেন্দ্রীনে অবস্থিত প্রোটন-সংখ্যার উপর। দুটি পরমাণু-কেন্দ্রীনের একটিতে যদি থাকে 8টি প্রোটন ও 8টি নিউট্রন এবং অপরটিতে থাকে 8টি প্রোটন ও 9টি নিউট্রন, তাহলে তাদের উভয়ের সংকেত যথাক্রমে O^{16} এবং O^{17}; কিন্তু এরা উভয়েই রাসায়নিক ধর্মে অক্সিজেন; কারণ ওদের প্রোটন-সংখ্যা সমান। এইরূপ কেন্দ্রীনে প্রোটন-সংখ্যা সমান থাকলেও নিউট্রন-সংখ্যা বদলে যেতে পারে। রাসায়নিক ধর্মে পার্থক্য নেই অথচ ভর বিভিন্ন হলে সেই সেই পদার্থগুলিকে পরস্পরের আইসোটোপ বা সমস্থানিক মৌল বলে। যেমন, $^{16}_{8}O$, $^{17}_{8}O$, $^{18}_{8}O$ অক্সিজেনের আইসোটোপ; আবার $^{238}_{92}U$ এবং $^{235}_{92}U$ ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ।

আইসোটোপ গঠনে পরমাণুর কেন্দ্রীনে প্রোটন কণার সংখ্যা ও নিউট্রন কণার সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী হতে পারে না। ব্যবধানটি সীমিত। প্রোটনের তুলনায় নিউট্রনের সংখ্যা সেই সীমার উপরে বা নীচে গেলে কেন্দ্রীনটির গঠনতন্ত্র বদলে গিয়ে নূতন একটি মৌলের পরমাণু সৃষ্টি হয়। O^{16} বা অক্সিজেনের আইসোটোপ O^{17} ও O^{18} নিসর্গ প্রকৃতিতে সামান্য পরিমাণে থাকলেও $^{19}_{8}O$ অর্থাৎ O^{19}-এর অস্তিত্ব নেই। গবেষণাগার O^{19} প্রস্তুত করা যেতে পারে, কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীনটি বদলে বা ভেঙে যায়। এর একটি নিউট্রন পরিবর্তিত হয়ে যায় প্রোটনে। এভাবে কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় একটি নূতন মৌলের সৃষ্টি হলো। মৌলটির নাম ফ্লোরিন, যার সংকেত $^{19}_{9}Fl$ বা Fl^{19}। আবার অক্সি-জেনের অন্য একটি আইসোটোপ $^{15}_{8}O$ বা O^{15}ও স্থায়ী নয়। গবেষণাগারে প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে এর একটি প্রোটন পরিবর্তিত হয়ে যায় নিউট্রনে, ফলে নূতন কেন্দ্রীনে থাকে 7টি প্রোটন ও 8টি নিউট্রন। এই নূতন মৌলটির নাম নাইট্রো-জেন, যার সংকেত $^{15}_{7}N$ বা N^{15}।

কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রনের পারস্পরিক তুলনামূলক সংখ্যায় অতিরিক্ত অসাম্য ঘটলে, কিংবা কেন্দ্রীনে প্রচণ্ড আঘাত দিলে অথবা কেন্দ্রীনে অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করলে, কেন্দ্রীন

ঐরূপ নূতন পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়, ফলে একটি নূতন যৌগের সৃষ্টি হয়। একে পারমাণবিক বিক্রিয়া বলে।

যৌগিক পদার্থ গঠনে কিন্তু কেন্দ্রীনের কোন ভূমিকা নেই; অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রোটন এবং নিউট্রনের বিন্যাস অপরিবর্তিত থাকে। যৌগিক পদার্থের সৃষ্টিতে দুই বা ততোধিক পরমাণু-কেন্দ্রীনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রনসমূহের নবতর বিন্যাসের দ্বারা সংযোজন ঘটে এবং এই সংযোজনের ফলে সংশ্লিষ্ট পদার্থগুলি নিজেরাই উত্তপ্ত হয়ে তাপ পরিত্যাগ করে কিংবা তাদের সংযোজনের জন্তে উত্তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ইলেকট্রনের নূতন বিন্যাসে নূতন পদার্থ গঠিত হলে তাকে রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical reaction) বলে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, পারমাণবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্র হচ্ছে কেন্দ্রীন, এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্র হচ্ছে কেন্দ্রীনসমূহের চতুর্দিকস্থ ভ্রমণরত ইলেকট্রন পুঞ্জ।

পর্যায়-সারণী (Periodic Table)

নৈসর্গিক পরমাণুগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন সবচেয়ে হাল্কা, যার চতুর্দিকের কক্ষে ভ্রাম্যমান মাত্র একটি ইলেকট্রন এবং সবচেয়ে ভারী পরমাণু ইউরেনিয়াম, যার কক্ষে আছে 92টি ভ্রাম্যমান ইলেকট্রন। সর্বাপেক্ষা হাল্কা থেকে সর্বাপেক্ষা ভারী পর্যন্ত পরমাণুগুলিকে তাদের সঙ্গী ইলেকট্রনগুলির ক্রমবর্ধমান সংখ্যানুযায়ী একটি একটি করে সাজিয়ে মেণ্ডেলিফ (Mendeleev) 1869 সালে যে তালিকা প্রস্তুত করেন তার নাম দেওয়া হয়েছে পর্যায়-সারণী। সে সময়ে পুরা 92টি পরমাণু জানা ছিল না, কাজেই এক থেকে 92 পর্যন্ত সবগুলি ঘর পূর্ণ হলো না, এখানে ওখানে কয়েকটি ঘর ফাঁকা থেকে গেল। কিন্তু শূন্য স্থানের সম্ভাব্য পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম অনুমান করা সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে নূতন নূতন আবিষ্কারের দ্বারা সে সকল ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—ঐ 92টি ছাড়া অন্য পরমাণু কি নেই? এর উত্তর হচ্ছে, প্রকৃতিতে ওদেরই কিছু আইসোটোপ আছে এবং গবেষণাগারে কৃত্রিম পরমাণু গঠিত হতে পারে ও বহু সংখ্যক হয়েছেও। গবেষণাগারে প্রস্তুত কৃত্রিম পরমাণুগুলির অধিকাংশই নৈসর্গিক হাল্কা পরমাণুর আইসোটোপ। অন্যগুলি ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারী এবং সেগুলির অস্তিত্ব প্রকৃতিতে নেই। বর্তমানে ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারী কৃত্রিম পরমাণুর সংখ্যা দশ-বারোটি, সেগুলির নাম নেপচুনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, আমেরিসিয়াম, ক্যালিফোর্ণিয়াম, ফের্মিয়াম ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে 91 সংখ্যক প্লুটোনিয়াম পরমাণুটি তো শিল্পজগতে বিশেষ মূল্যবান বলে সমাদৃত।

পর্যায়-সারণীর প্রথমার্ধের অর্থাৎ রৌপ্যের ($^{107}_{47}Ag$) পূর্ব পর্যন্ত পরমাণুগুলিকে হাল্কা পরমাণু বলা যেতে পারে। এগুলির যে কোন দুটির পারমাণবিক সংখ্যা যদি একযোগে রৌপ্যের পারমাণবিক সংখ্যা অপেক্ষা কম হয়, তাহলে সে দুটিকে উত্তাপাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট পরমাণু দুটি থেকে পৃথক অপর একটি পরমাণুর আইসোটোপ সৃষ্টি হয়। এরূপ পারমাণবিক বিক্রিয়াকে সংযোজন (Fusion) বলে; যেমন—দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোজনে একটি ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্ট হয়; অথবা কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের সংযোজনে নাইট্রোজেনের আইসোটোপ গঠিত হয়।

পর্যায়-সারণীর দ্বিতীয়ার্ধের পরমাণুগুলিকে ভারী পরমাণু বলে। ভারী পরমাণুগুলির দুটির মধ্যে সংযোজন সম্ভব নয়। কিন্তু সেগুলির কোনটিকে প্রচণ্ড আঘাত প্রভৃতি যে কোন উপযুক্ত

প্রক্রিয়ায় ভেঙে ফেলা যায়, যার ফলে দ্বিতীয় অপর একটি বা দুটি পরমাণুর উদ্ভব হতে পারে। এরূপ পারমাণবিক বিক্রিয়াকে বিভাজন (Fission) বলে।

ইউরেনিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি ভারী পরমাণুর কেন্দ্রীন থেকে নিজে নিজেই অবিরাম তেজ বিচ্ছুরিত হয়ে যাচ্ছে। তেজ স্বতঃই উৎসারিত হয়ে যায় বলে এগুলিকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ (Radio-active) বলে।

একটি কেন্দ্রীনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত এক ঝাঁক ইলেকট্রন দিয়ে প্রতিটি পরমাণু গঠিত। পরমাণুর গঠন-বিন্যাসের এই বিবরণ শুনে মনে হয় পরমাণু আয়তনে যেন কতই বৃহৎ। প্রকৃত-পক্ষে পরমাণু এত কল্পনাতীত ক্ষুদ্র যে, একটি পেরেকের ছুঁচালো ডগায়ও অনেক কোটি লৌহ-পরমাণু স্বচ্ছন্দে অবস্থান করছে। একটি পরমাণুর ব্যাস 10^{-8} সেন্টিমিটার, একটি কেন্দ্রীনের ব্যাস 10^{-12} সেন্টিমিটার, একটি ইলেকট্রনের ব্যাস 10^{-13} সেন্টিমিটার।

তেজোরশ্মি ও তেজস্কণা

পদার্থ থেকে তেজোরশ্মি বা তেজস্কণার বিচ্ছুরণকে তেজের বিকিরণ বলে। উপরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের কথা বলা হয়েছে। এগুলি থেকে স্বতঃই পারমাণবিক বিক্রিয়ায় অবিরাম তেজের বিকিরণ হয়ে চলেছে। কৃত্রিম প্রণালীতেও পদার্থে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটানো যায় এবং তাতেও পরমাণুর সংযোজন বা বিভাজনকালে তেজের বিকিরণ হয়। স্বাভাবিক হোক কিংবা কৃত্রিম হোক, পরমাণু থেকে বিকিরিত তেজঃকণা ও তেজোরশ্মি সর্বত্রই একই প্রকার।

এগুলির নাম—(1) আলফা রশ্মি (Alpha rays) বা আলফা কণা (Alphe particles)

(2) বিটা রশ্মি (Beta rays) বা বিটা কণা (Beta particles)

(3) গামা রশ্মি (Gamma rays)

(1) হিলিয়াম মৌলের পরমাণু-কেন্দ্রীনকে বলা হয় আলফা কণা বা আলফা রশ্মি। হিলিয়াম-কেন্দ্রীন গঠিত হয় দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনের সমবায়ে অর্থাৎ ${}^{4}_{2}He$। সুতরাং এতে দুটি ধনাত্মক বিদ্যুতের আধান বর্তমান। যদি কোন মৌল পরমাণু থেকে আলফা কণা বিকিরিত হয়ে যায়, তবে সেই মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা দুই কম হয়ে পড়ে, কিন্তু পারমাণবিক ভর কমে চার। আলফা কণার বিকিরণে প্রভূত তেজ উৎপন্ন হয় ও তার গতিবেগ আলোর গতিবেগের 5 থেকে 7 শতাংশ।

(2) কোন মৌলের আইসোটোপের কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার সীমিত ব্যবধানে ব্যতিক্রম উপস্থিত হলে; অর্থাৎ ঐ ব্যবধানের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটলে কেন্দ্রীনটি অস্থায়ী হয়ে পড়ে। নিউট্রন বা প্রোটন—যেটির আধিক্য ঘটে, সেটি থেকে কেন্দ্রীন শক্তির প্রভাবে একটি বিটা কণা বহির্গত হয়ে যায় এবং একটি নূতন মৌল-পরমাণুর সৃষ্টি হয়। বিটা বিকিরণে একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-কণা বা একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎ-কণা উৎসারিত হয়ে প্রচুর তেজ উৎপন্ন হয়। বিটা কণার গতিবেগ আলোকের গতিবেগের প্রায় 98 শতাংশ। নিম্নোক্ত (ক) এবং (খ) বিটা কণার পরিচায়ক।

(ক) বিটা কণা মানে অতি দ্রুত গতিশীল একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-কণা অর্থাৎ ইলেকট্রন (e^-)। এটি বিচ্ছুরিত হয় পরমাণু-কেন্দ্রীনের নিউট্রন থেকে। ফলে নিউট্রনটি একটি প্রোটনে পরিণত হয়ে যায়, কিন্তু কেন্দ্রীনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে সেই প্রোটনটি। এভাবে পরমাণুটিতে প্রোটনের সংখ্যা 'এক' বৃদ্ধি পেয়ে কেন্দ্রীনেই যুক্ত থাকলো বলে তার পারমাণবিক সংখ্যা 'এক' বৃদ্ধির ফলে একটি নূতন পরমাণুর সৃষ্টি হলো, কিন্তু তার পূর্বেকার নিউট্রনের সংখ্যা 'এক' হ্রাস

গেল। অতএব কেন্দ্রীনটির পূর্বেকার ভর সমানই রইলো, কারণ বহির্গত ইলেকট্রনটির ভর এত সামান্য যে, তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। যেমন, অক্সিজেনের আইসোটোপ $^{19}_{8}O$ বিটা বিকিরণের পর পরিবর্তিত হয় ফ্লোরিনে $^{19}_{9}Fl$।

(খ) অথবা বিটা কণা বলতে বুঝায় ঐরূপ দ্রুতগতিসম্পন্ন একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত ইলেকট্রন কণা (e^+), যার নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন (Positron)। এটি বিচ্ছুরিত হয় পরমাণু-কেন্দ্রীনের প্রোটন থেকে। ফলে প্রোটনটি একটি নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং সেটি ঐ কেন্দ্রীনেই যুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে মৌলটির পারমাণবিক সংখ্যা '1' হ্রাস পেয়ে একটি নূতন পরমাণুর উদ্ভব হয়, কিন্তু তার পারমাণবিক ভরে কোন পরিবর্তন হলো না, কারণ পজিট্রনের ভর এত সামান্য যে, তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। যেমন, অক্সিজেনের অপর এক আইসোটোপ $^{15}_{8}O$ বিটা বিকিরণের পর পরিণত হয় নাইট্রোজেনে $^{15}_{7}N$।

(3) গামা রশ্মি কোন কণা নয়। এক্স-রশ্মির মতই গামা রশ্মি বিদ্যুচ্চুম্বক তরঙ্গ। গামা রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক্স-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর, যার ফলে বিকিরিত তেজও অতি প্রচণ্ড। পরমাণু-কেন্দ্রীন থেকে আলফা কণা বা বিটা কণা বেরিয়ে গেলে ঐ কেন্দ্রীন নবতর বিন্যাসে সাম্যাবস্থায় আসবার সময়ে গামা রশ্মি বিকিরিত হয়।

আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি ও গামা রশ্মি—প্রতিটি বিকিরণেই কেন্দ্রীন থেকে প্রচুর পরিমাণে তেজ উৎপন্ন হয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

নিউট্রিনো (Nutrino)

কোন তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে যে সকল আলফা কণা নির্গত হয়, সেগুলি প্রত্যেকেই সম-পরিমাণ তেজের আধার। কিন্তু বিটা কণার ক্ষেত্রে এই সমতা নেই। তাদের তেজ কারও কম, কারও বেশী। এই অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন বিটা বিকিরণে ইলেকট্রনের সঙ্গে অপর কোন কণার কম বা বেশী কিছু তেজ নিয়ে পলায়নই হয়তো ঐ বিশৃঙ্খলার জন্যে দায়ী।

এই অনুমানের স্বপক্ষে দিন দিন বহু পরোক্ষ নিদর্শন জমা হয়ে উঠলো, কিন্তু প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। অবশেষে 1955 সালে একটি বিশেষ প্রণালীতে এই কণার অস্তিত্ব ধরা পড়ল। কণাটির ভর তুচ্ছাতিতুচ্ছ, কিন্তু নিদারুণ গতিবেগসম্পন্ন। কোন বাধাই এর গতিরোধ করতে পারে না, অনায়াসে ভেদ করে চলে যায়। এজন্যেই এই কণা এতদিন রহস্যের অন্তরালে ছিল। কণাটির কোন বিদ্যুৎ-আধান নেই বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে নিউট্রিনো। মানুষের শরীর ভেদ করে এর স্বচ্ছন্দ গতি, কিন্তু মানুষ তা টেরও পায় না কিংবা তাতে তার কোন ক্ষতির আশঙ্কাও নেই।

নক্ষত্রের তেজ

আকাশের প্রতিটি নক্ষত্রই এক একটি গ্যাস-পিণ্ড। নক্ষত্রের বহির্ভাগ অপেক্ষা অভ্যন্তরের চাপ ও তাপ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বেশী। নক্ষত্রদের পৃষ্ঠদেশের তাপ সকলের সমান নয়, কারও পৃষ্ঠদেশের তাপ হয়তো মাত্র তিন-চার হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, আবার অন্য কারও পৃষ্ঠদেশের তাপ পনেরো-কুড়ি হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেরও বেশী। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা প্রায় দুই কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তাদের কেন্দ্রের ঘনত্বও তেমনি বিরাট।

পার্থিব মৌলের পরমাণু ও নাক্ষত্র গ্যাসের পরমাণু অভিন্ন। পার্থিব মৌল পদার্থগুলি কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় থাকতে পারে, কিন্তু

নক্ষত্রের পৃষ্ঠদেশের ও অভ্যন্তরের প্রচণ্ড তাপমাত্রায় তারা প্রত্যেকেই গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সূর্যের পৃষ্ঠদেশের তাপ ছয় হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং সূর্যের কেন্দ্রীয় তাপ ইদানীংকালে নির্ধারিত হয়েছে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। স্বর্গীয় বিজ্ঞানী ডক্টর মেঘনাদ সাহা সূর্যালোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, আয়তন হিসাবে সূর্যের গঠন-উপাদানের 81·76 ভাগ হাইড্রোজেন, 18·17 ভাগ হিলিয়াম এবং অবশিষ্ট মাত্র 0 07 ভাগ হচ্ছে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ, নিকেল, তামা, দস্তা ইত্যাদি যাবতীয় মৌলিক পদার্থের গ্যাস। অন্য সকল নক্ষত্রেরও এই সব মৌলই গ্যাসীয় অবস্থায় আছে, কিন্তু তাদের পারস্পরিক পরিমাণের মাত্রা ঠিক সূর্যের মত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ নক্ষত্রদের নিজেদের মধ্যেই নানান রকম বৈষম্য বর্তমান। তারা আকারে কেউ বৃহৎ, কেউ ক্ষুদ্র, বয়সে কেউ প্রাচীন কেউ তরুণ, দীপ্তিতে কেউ অত্যুজ্জ্বল, কেউ স্বল্পোজ্জ্বল। তবে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, জন্মের আদিতে সকল নক্ষত্রেই হাইড্রোজেনের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক এবং হিলিয়ামের স্থান দ্বিতীয়।

নক্ষত্রদের কেন্দ্রের ঐ প্রচণ্ড তাপমাত্রায় পরমাণুগুলি তাদের গঠনতন্ত্র ঠিক রাখতে পারে না, পারমাণবিক বিক্রিয়া চলতে থাকে। এতে নানাবিধ বিবর্তনের ধারায় হাইড্রোজেন শেষ পর্যন্ত হিলিয়ামে পরিণত হয়ে যায়। এই রূপান্তরণ প্রক্রিয়ারই আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির সৃষ্টি হয় এবং সে জন্যেই নক্ষত্রে অমিত তেজের উৎপত্তি হয়, যা বহির্বিশ্বে বিকিরিত হয়ে যায়। অতএব পারমাণবিক বিক্রিয়াই নক্ষত্রের তেজের উৎস। ঐ বিক্রিয়ার পর হিলিয়ামের আর কোন পরিণতি নেই, সুতরাং হিলিয়ামই হাইড্রোজেন জ্বালানীর ছাই।

পারমাণবিক বিক্রিয়ার প্রভাবে নক্ষত্র থেকে উৎকীর্ণ বিদ্যুৎ-কণার প্রবাহ এবং বিদ্যুচ্চুম্বক তরঙ্গই নাক্ষত্র তেজের প্রতীক। স্বাভাবিক বা কৃত্রিম যে কোন উপায়েই হোক, এক প্রকার তেজ অন্য প্রকার তেজে রূপান্তরিত হতে পারে। ভূপৃষ্ঠে মানুষ নাক্ষত্র তেজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করে মাত্র আলোক ও তাপ-রশ্মির মাধ্যমে।

সূর্যের কেন্দ্রস্থলে প্রতি সেকেণ্ডে 56 কোটি টনেরও বেশী হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে যে বিরাট পরিমাণ তেজ উৎপন্ন হয়, সেই তেজ ক্রমান্বয়ে পরিবহনাদি সূত্রে সূর্যের উপর তলে চলে আসে ও সেখান থেকে বহির্বিশ্বে বিকিরিত হয়ে যায়। বিগত 500 কোটি বছর অথবা তারও বেশী কাল ধরে সূর্য এই হারে তেজ বিকিরণ করে আসছে, আরো 500 কোটি বছর বা ততোধিক সময় সূর্য স্বচ্ছন্দে এই হারে তেজ বিকিরণ করতে পারবে, কিন্তু পরে তার হাইড্রোজেন ভাণ্ডার যত নিঃশেষিত হবে, ততই তার জরা ও বার্ধক্য আসতে থাকবে। তার অমিত তেজ কমে আসবে, তার দেহেরও নানা পরিবর্তন ঘটবে। সূর্যের মত অন্য সকল নক্ষত্রেরও স্বাভাবিক জীবনেতিহাস ও পরিণতি ঐ একই প্রকার অনুমিত হয়। কিন্তু কখনও কখনও এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কোন কোন নক্ষত্র অকস্মাৎ নোভা বা অতিনোভায় পরিণত হয়ে যায়।

নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পারমাণবিক বিক্রিয়া

প্রোটন-শৃঙ্খল—হান্স্ বেথে (H. Bethe), সি, ক্রিচফিল্ড (C. Critchfield) এবং সি, লরিটসেন (C. Lauritsen) নামক তিন বিজ্ঞানীর প্রত্যেকের আংশিক অবদানে একটি পারমাণবিক বিক্রিয়ার ধারা উদ্ভাবিত হয়েছে। তিনটি

ধাপসমন্বিত ধারাটির নাম প্রোটন-শৃঙ্খল (Proton chain)।

বর্তমানের বিজ্ঞানী সমাজ বলেন, যে সকল নক্ষত্রের দীপ্তি সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের দশ গুণের বেশী নয়, সেই সব নক্ষত্রের গভীর অভ্যন্তরে প্রধানতঃ প্রোটন-শৃঙ্খল বিক্রিয়ার দ্বারা প্রচুর তেজের বিকিরণসহ হিলিয়াম উৎপন্ন হয়।

নক্ষত্রের হাইড্রোজেন ভাণ্ডার হিলিয়াম সৃষ্টির ফলে বিশেষ একটি নিম্নসীমায় না যাওয়া পর্যন্ত বিক্রিয়াধারার শেষ নেই।

বিক্রিয়ার নিম্নোক্ত ধাপগুলিতে, গামা রশ্মি বিকিরণকে γ, বিটা কণার বিকিরণকে β এবং হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন বা প্রোটন কণাকে P, অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত করা হলো।

প্রথম ধাপ—${}^{1}_{1}H\ (P, \beta)\ {}^{2}_{1}H$

একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একটি প্রোটন কণার বিক্রিয়াজনিত সংযোজনে একটি ভারী হাইড্রোজেন অর্থাৎ ডয়টেরিয়াম (H^2 বা D^2) উৎপন্ন হয়। উৎপাদনকালে একটি প্রোটন একটি নিউট্রনে পরিণত হয় এবং বিটা রশ্মি (e^+) বিকিরিত হয়; অর্থাৎ $H^1 + H^1 \rightarrow H^2 + e^+$

দ্বিতীয় ধাপ—${}^{2}_{1}H\ (P, \gamma)\ {}^{3}_{2}He$

প্রথম ধাপের ঐ ভারী হাইড্রোজেনের সঙ্গে একটি প্রোটন কণার সংযোজনে সৃষ্ট হয় একটি হিলিয়াম আইসোটোপ (He^3) এবং গামা রশ্মি বিকিরিত হয়; অর্থাৎ $H^2 + H^1 \rightarrow He^3 + \gamma$

তৃতীয় ধাপ—${}^{3}_{2}He({}^{3}_{2}He, 2H^1)\ {}^{4}_{2}He$

দ্বিতীয় ধাপের ঐরূপ দুটি হিলিয়ামের সংযোজনে একটি স্বাভাবিক হিলিয়াম ও দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর উৎপত্তি হয়; অর্থাৎ $He^3 + He^3 \rightarrow He^4 + 2H^1$

কার্বন-নাইট্রোজেন চক্র বা কার্বন চক্র

হ্যান্‌স্ বেথে (H. Bethe) এবং কার্ল ফন ভাইৎসেকার (Carl Von Weizsacker) এই দুই বিজ্ঞানী পৃথক পৃথক স্থানে স্বতন্ত্রভাবে একই পারমাণবিক বিক্রিয়া সূত্র উদ্ভাবন করেন। ছয়টি ধাপসমন্বিত এই বিক্রিয়া ধারাটির নাম কার্বন নাইট্রোজেন চক্র (Carbon-Nitrogen cycle) অথবা শুধু কার্বন চক্র (Carbon cycle)। এতে প্রথম পাঁচটির প্রতি ধাপে প্রচুর তেজ বিকিরণ হয় এবং ষষ্ঠ ধাপে উৎপন্ন হয় হিলিয়াম পরমাণু। বিজ্ঞানী সমাজ বলেন, যে সব নক্ষত্রের দীপ্তি সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের দশ গুণ অপেক্ষা বেশী, সেই সব নক্ষত্রের গভীর অভ্যন্তরে প্রধানতঃ এই বিক্রিয়ার ধারা সংঘটিত হয়। শেষ ধাপে হিলিয়াম উৎপাদনের পর আবার ধারাটির পুনরাবর্তন শুরু হয় প্রথম ধাপ থেকে। ছয়টি ধাপের পৌনঃপুনিক আবর্তনেই নক্ষত্রের তেজ ও দীপ্তির মাত্রা অক্ষুণ্ণ থেকে যায় যত দিন না তার হাইড্রোজেন ভাণ্ডার হিলিয়াম সৃষ্টির দ্বারা একটা নিম্নসীমায় পৌঁছায়।

এই বিক্রিয়ার নিম্নোক্ত ছয়টি ধাপে, গামা রশ্মি বিকিরণকে γ, বিটা প্রক্রিয়াকে β, হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন বা প্রোটনকে P অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হলো।

প্রথম ধাপ। ${}^{12}_{6}C\ (P, \gamma)\ {}^{13}_{7}N$ অথবা $C^{12}\ (P, \gamma)\ N^{13}$

6টি প্রোটন ও 6টি নিউট্রনযুক্ত একটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে একটি প্রোটন সংযোজনে একটি নাইট্রোজেনের (7টি প্রোটন ও 6টি নিউট্রন) উদ্ভব হয় এবং এই বিক্রিয়ায় গামা রশ্মি বিকিরিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ধাপ। ${}^{13}_{7}N\ (\beta)\ {}^{13}_{6}C$ অথবা $N^{13}\ (\beta)\ C^{13}$

প্রথম ধাপের ঐ নাইট্রোজেন বিটা প্রক্রিয়ায় কার্বনে (6টি প্রোটন ও 7টি নিউট্রন) রূপান্তরিত হয় এবং বিটা রশ্মি (e^+) বিচ্ছুরিত হয়।

তৃতীয় ধাপ। ${}^{13}_{6}C\ (P,\ \gamma)\ {}^{14}_{7}N$ অথবা $C^{13}\ (P, \gamma)\ N^{14}$

দ্বিতীয় ধাপে সৃষ্ট কার্বনটি প্রোটনের সঙ্গে সংযোজনে নাইট্রোজেনে (7টি প্রোটন ও 7টি নিউট্রন) পরিণত হয় এবং গামা রশ্মি বিকিরিত হয়।

চতুর্থ ধাপ। ${}^{14}_{7}N\ (P,\ \gamma)\ {}^{15}_{8}O$ অথবা $N^{14}\ (P, \gamma)\ O^{15}$

তৃতীয় ধাপের নাইট্রোজেনের সঙ্গে একটি প্রোটন সংযোজনে একটি অক্সিজেন (8টি প্রোটন ও 7টি নিউট্রন) সৃষ্ট হয় এবং গামা রশ্মির বিকিরণ ঘটে।

পঞ্চম ধাপ। ${}^{15}_{8}O\ (\beta)\ {}^{15}_{7}N$ অথবা $O^{15}\ (\beta)\ N^{15}$

চতুর্থ ধাপের অক্সিজেনটি বিটা বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেনের (7টি প্রোটন ও 8টি নিউট্রন) পরিণত হয় এবং বিটা রশ্মি (e^{+}) বিকিরিত হয়।

ষষ্ঠ ধাপ। ${}^{15}_{7}N\ (P,\ {}^{4}_{2}He)\ {}^{12}_{6}C$ অথবা $N^{15}\ (P,\ He^{4})\ C^{12}$

পঞ্চম ধাপের নাইট্রোজেনের সঙ্গে একটি প্রোটনের সংযোজনে একটি কার্বন (6টি প্রোটন ও 6টি নিউট্রন) উৎপন্ন হয় এবং একটি হিলিয়াম পরমাণু (2টি প্রোটন ও 2টি নিউট্রন) বিচ্ছুরিত হয় অর্থাৎ আলফা কণা নির্গত হয়।

এখানে দেখা যাচ্ছে পারমাণবিক বিক্রিয়ার ধারায় প্রথম ধাপে যাত্রা সুরু হয়েছিল একটি কার্বন পরমাণুর রূপান্তরণ নিয়ে, আবার ষষ্ঠ ধাপের সমাপ্তিও হলো একটি কার্বন পরমাণুর গঠন দিয়ে। সুতরাং বিক্রিয়ায় কার্বন অংশ-গ্রহণ করেছে শুধু একটি অনুঘটক (Catalyst) হিসাবে। অর্থাৎ বিক্রিয়ায় কেবলমাত্র নক্ষত্রের হাইড্রোজেন ভাণ্ডারই ক্ষয় পাচ্ছে হিলিয়াম সৃষ্টিতে, কার্বন ভাণ্ডারের কোন ক্ষয়-ক্ষতি নেই। নক্ষত্রের হাইড্রোজেনের পরিমাণের তুলনায় কার্বনের পরিমাণ নিতান্তই স্বল্প। এই কারণে বিক্রিয়ায় যদি কার্বনের ক্ষয় হতো, তা হলে কোন নক্ষত্রই এভাবে সুদীর্ঘ কাল ধরে তেজ বিকিরণ করতে পারতো না।

নক্ষত্রের অভ্যন্তরে প্রায় দুই কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হিলিয়ামই হাইড্রোজেন জ্বালানীর ছাই, কিন্তু কোন নক্ষত্র যদি নোভা বা অতিনোভায় পরিণত হয়ে যায়, তাহলে যে কল্পনাতীত উচ্চ তাপমাত্রার উদ্ভব হয়, তাতে হিলিয়ামও লৌহ প্রভৃতি ভারী পরমাণুতে রূপান্তর গ্রহণ করে।

ধানের জমির আগাছার কথা

রতিকান্ত মাইতি*

আগাছা ফসলের পরম শত্রু। এখন প্রশ্ন আগাছা কাকে বলবো? কোন ফসলের জমিতে যদি কোন অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ জন্মায়, তাকে আগাছা বলা হয়। ধানের জমিতে যদি গম বা ভুট্টা হয়, তখন গম বা ভুট্টাকে আমরা আগাছাই বলবো। মোটের উপর একটা জমিতে যদি আমরা পাট চাষ করি, তবে ঐ জমিতে পাট ছাড়া অন্য কোন উদ্ভিদ, তা উপকারী বা অপকারী—যাই হোক কেন, তা আগাছারই সামিল। কৃষি-বিজ্ঞানীরা আজকাল মিশ্রণ বা সঙ্কর পদ্ধতিতে একই জমিতে দুটি ফসল জন্মান, যেমন ধানের সঙ্গে ছোলা, মুগ, সরষের সঙ্গে খেসারী প্রভৃতির চাষ করেন। এখন আমরা এগুলির কাউকে আগাছা বলবো না। উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত কোন উদ্ভিদ কোন জমিতে জন্মালে তাকে আমরা আগাছা শ্রেণীভুক্ত করবো।

আদিম যুগে যখন গুহামানব চাষ করতে শিখলো, তখনও আগাছা সম্বন্ধে তাদের সম্যক জ্ঞান ছিল। ফসলের জমিতে যাতে আগাছা না হয়, সেদিকে তাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকতো। তাই আগাছা হলেই তা জমি থেকে তুলে ফেলতো। সুতরাং সর্বকালের মানুষের আগাছা সম্বন্ধে একটা ভীতি আছে। তারা সবাই জানে, আগাছা জল, বায়ু, আলো ও খাদ্যের জন্যে সমানভাবে ফসলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। প্রথমাবস্থায় ছোট চারাগাছগুলি যখন আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, দেখা যায় নানাপ্রকার আগাছা ঐ সময় জমিতে জন্মে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে ও জমিকে ছেয়ে ফেলে। এমন কি অনেক সময় ফসলের চারার থেকে আগাছার উচ্চতা অনেক বেশী হয়। তাছাড়া ফসলের থেকে আগাছার শিকড় ও ডালপালা অনেক দূর বিস্তারলাভ করায় অতি সহজেই আগাছা মাটি থেকে ফসলের জন্যে যোগান দেওয়া খাদ্য শোষণ করে নেয়। তার ফলে চারাগাছগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যায়। তাই চাষীভাইদের সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ফসলের জমি আগাছামুক্ত হয়। নানা উপায়ে আগাছা শস্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যেমন—

1. শিকড়ের প্রাচুর্য ও শাখা-প্রশাখা অনেক গভীরে ও মাটির উপরের স্তরে চার দিকে বিস্তৃত হওয়ায় আগাছা মাটি থেকে ফসলের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে খাদ্যবস্তু শোষণ করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, আগাছা তার শিকড় ফসলের শিকড়ের ফাঁকে চালিয়ে দেয়।

2. আগাছা অনেক সময় প্রচুর শাখা-প্রশাখাসমন্বিত হওয়ায় ডালপালা দিয়ে ফসলকে ঢেকে ফেলে, ফলে আলোর অভাবে ফসলের ডালপালা ক্রমশঃ সরু হয়ে যায়।

3. সব সময় দেখা যায় ফসলের বৃদ্ধি আগাছার বৃদ্ধির গতি থেকে অনেক কম।

4. অনেক আগাছা শস্যের কাণ্ডকে জড়িয়ে উপরে উঠতে থাকে, তার ফলে ওদের ভারে ফসল নুয়ে পড়ে, আর বাড়তে দেয় না;

5. অনেক আগাছা আবার ফসলের শত্রু ছত্রাক, জীবাণু ও ভাইরাসের আবাসস্থল হয়, যার থেকে অতি সহজে রোগ ফসলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

---

* পাট কৃষি গবেষণাগার, ব্যারাকপুর, 24 পরগণা।

আসানা, সুথ্য; পানিকার প্রভৃতি আগাছা-বিশেষজ্ঞেরা ফসলের উপর আগাছার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন। মুরেনচার বলেছেন, অনেক আগাছা রয়েছে, যা খেয়ে গবাদিপশুর মৃত্যু ঘটে।

সুতরাং চাষীভাইকে আগাছা সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বিশেষ করে তাঁদের দেখতে হবে, যাতে প্রথমাবস্থায় ফসলের চারা আগাছার হাত থেকে মুক্ত থাকে। অনেক সময় চাষের প্রথমাবস্থায় আমরা ঐ দিকে লক্ষ্য না রাখায় গাছগুলি দুর্বল হয়ে যায়, পরে অনেক চেষ্টা করেও গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি আনা যায় না।

বিভিন্ন উপায়ে আগাছার বিনাস ঘটানো যায়, তার মধ্যে কয়েকটি উপায় আলোচনা করা যাক. যাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি; (1) যান্ত্রিক উপায়; (2) জৈবনিক উপায়, (3) রাসায়নিক উপায়।

(1) যান্ত্রিক উপায়—হাত দিয়ে তুলে ফেলা, হস্তকর্ষণ যন্ত্র (Wheel hoe), বিন্দা বা নিড়ানির ব্যবহার, ক্রমান্বয়ে কর্ষণ, কর্ষণের পর ছাকুনি বা আঁচড়ার সাহায্যে মাটি থেকে আগাছা বেছে ফেলে দেওয়া, শক্ত কাঠ দিয়ে আগাছাগুলিকে পিটিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া ও তারপর লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা, পুড়িয়ে ফেলা ইত্যাদি এই প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে।

সাধারণ চাষীরা নিড়ানি দিয়ে শিকড়শুদ্ধ আগাছা জমি থেকে তুলে ফেলেন। এই সময় তাঁদের বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে, ভুলক্রমে শিকড় না তুলে শুধু মাটির উপর থেকে আগাছা কেটে না ফেলেন। তা হলে ঐ কাটা গোড়া থেকে আবার নূতন আগাছা বেরোয়। বিশেষ করে মুথা (Cyperus rotundus) গাছের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যাতে মাটির গভীরে যে কন্দাকার গুটি থাকে, তা তুলে ফেলা হয়। সাধারণতঃ ফসল যখন সারিতে লাগানো হয়, তখন আমরা ঘূর্ণন-যন্ত্রের সাহায্যে দুই সারির মধ্যবর্তী অংশের মাটি চষে ফেলবো। তাতে আগাছা কিছুটা উপড়ে যায় ও তাদের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। জমি তৈরী করবার সময় বার বার লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা হয়, ফলে আগাছা-গুলি উপড়ে যায়, পরে বিদা বা আঁকড়ার সাহায্যে মাটি থেকে আগাছাগুলি বেছে দূরে ফেলে দেওয়া হয়। একটা ফসল জন্মাবার পর পোড়ো জমিতে যখন আগাছাগুলি বেশী পরিমাণে জন্মায়, তার ফলে একদিকে যেমন আগাছার বিনাস ঘটে, অন্যদিকে আগাছার ছাইতে জমিতে সার হয়।

(2) জৈবনিক উপায়—একই জমিতে একই ফসল বছরের পর বছর জন্মালে আগাছার আক্রমণ বেশী হয়, কিন্তু দেখা গেছে একই জমিতে একটা ফসলের পর অন্য ফসলের চাষ করলে (যেমন ধানের পর পাট বা আলু) স্বভাবতঃই আগাছার প্রাদুর্ভাব কম হয়। কারণ ধানের জমিতে যে সব আগাছা পরম শত্রু, গমের জমিতে তা না হওয়ায় পরের বছর তা জন্মায় না বা কম জন্মায়। ফলে তৃতীয় বছর আবার যখন ধান লাগানো হয়, তখন ঐ সব আগাছা কমই জন্মায়। তাই আবর্তন প্রথায় (Rotation) চাষ করলে আগাছার আক্রমণ কম হওয়া স্বাভাবিক।

(3) রাসায়নিক উপায়—আগাছা বিশেষজ্ঞেরা বিভিন্ন আগাছা ধ্বংসকারী ওষুধ (Weedicides) আবিষ্কার করেছেন, যা নির্দিষ্ট পরিমাণে ফসলের জমিতে ছিটিয়ে দিলে আগাছা নষ্ট হয়, কিন্তু ফসলের কোন ক্ষতি করে না। অনেক ওষুধ আছে, যেগুলি শুধু বড় পত্রযুক্ত দ্বিবীজপত্রী আগাছাকে ধ্বংস করে, আবার অনেক ওষুধ আছে, যা সরু পত্রযুক্ত ঘাস জাতীয় উদ্ভিদকে ধ্বংস করে ফেলে। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ না পেলে চাষীভাইদের পক্ষে এই তৃতীয় উপায় অবলম্বন করা উচিৎ নয়। কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণের সামান্য বেশী পরিমাণ হলেই

ঐ ওষুধ আগাছা ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফসলেরও ক্ষতি করবে। তবে কিছু কিছু ওষুধ আছে, যা সাধারণ চাষীভাইরা অতি সহজে জমিতে ব্যবহার করতে পারেন, যেমন ধানের জমিতে রাম্না (Chara) ধ্বংস করতে চাষীভাইদের তুঁতে (Copper sulphate) ব্যবহার করতে দেখা যায়। অঞ্চল উন্নয়ন আধিকারিকের (Block Development Officer) সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে আগাছা ধ্বংসকারী বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষ উপদেশ লাভ করবেন।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা এই জ্ঞান লাভ করলাম, ফসলের পরম শত্রু আগাছার বিনাশ সাধন করে ফসলের জমিকে আমাদের আগাছামুক্ত রাখতে হবে। তা না হলে জমিতে দেওয়া ফসলের সার আগাছা খেয়ে ফেলবে। ফলে ফসলের ভাগ্যে জুটবে অনেক কম। তাছাড়া জমি যদি আগাছার দ্বারা ঢাকা থাকে, জমিতে সার দেওয়ার পক্ষেও অসুবিধা।

বর্তমান পর্যায়ে আমরা ধানের জমির আগাছা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ধানের জমির আগাছা মোটামুটি একই রকম। আমাদের বর্তমান আলোচনা অনেকটা মেদিনীপুর ও কিছুটা 24 পরগণা জেলার আগাছা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ধানের জমির আগাছা সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রেন (1905) হুগলী জেলায় 33টি, চক্রবর্তী (1938-40) চুঁচুড়া, বাঁকুড়া ও সিউড়ি সরকারী কৃষিক্ষেত্রে 87টি, পাল ও ভট্টাচার্য চুচুড়ার কৃষিক্ষেত্রে 57টি, দত্ত ও মাইতি (1962) মেদিনীপুর জেলায় আমন ও বোরো ধানের জমি থেকে 104 জাতীয় আগাছার প্রজাতির উল্লেখ করেছেন।

মেদিনীপুর জেলার আগাছার উপর কাজ করে দত্ত ও মাইতি বলেছেন—ঐ জেলার বিভিন্ন মহকুমায় মাটির প্রকারভেদ অনুযায়ী আগাছার পরিমাণ ও প্রকারভেদ হয়, যেমন—মেদিনীপুর সদর মহকুমার লালমাটিতে যে সব আগাছা জন্মায়, জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের দোঁয়াশ মাটিতে, কাঁথি ও তমলুকের দোঁয়াশ মাটিতে ঐ সব আগাছার প্রাদুর্ভাবের তারতম্য ঘটে। বিভিন্ন প্রকার মাটিতে দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী আগাছার সংখ্যার অনুপাতের পরিমাণ কম-বেশী হয়। জল, বায়ু যেমন—উষ্ণতা, বায়ুর আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপরও আগাছার তারতম্য ঘটে।

পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আমন, বোরো ও আউসের চাষ হয়, তার মধ্যে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও 24 পরগণায় আমন ধানের চাষ বেশী হয়। আউস, আমন ও বোরো ধানের জমিতে বিভিন্ন প্রকার আগাছা ও তাদের প্রকারভেদ ঘটে। তার মধ্যে আমন ধানের জমিতে আগাছা সবচেয়ে বেশী হয়। কারণ সাধারণতঃ বর্ষাকালে আমন ধান হওয়ায় আগাছার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী হয়।

ধান রোপণের পর বছরের বিভিন্ন সময় আগাছার আগমন ও প্রাদুর্ভাব বিভিন্ন হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আগাছার ফুল ধরে ও ফল থেকে বীজের বিস্তার ঘটে। আমন ধানের জমিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—উঁচু জমি, মাঝারি জমি ও নীচু জমি, যাতে আগাছার প্রকারভেদ বিভিন্ন হয়।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে ধানের চারা জমিতে রোপণের পর থেকে বিভিন্ন আগাছার ফুল ধরে বিভিন্ন সময় এবং ফুল থেকে ফল ও বীজের বিস্তারলাভ ঘটে বিভিন্ন সময়। 14 দিন পর পর সপুষ্পক আগাছা তুলে দেখা গেছে, অগাষ্ট মাসের পর থেকে সপুষ্পক আগাছার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, সেপ্টেম্বরের 15 তারিখ থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি তাদের সংখ্যা

সবচেয়ে বেশী হয়, তারপর সপুষ্পক আগাছার সংখ্যা ক্রমে কমতে কমতে শীতের দিকে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে একেবারে কমে যায়। দেখা গেছে ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা ও আর্দ্রতা যখন কমতে আরম্ভ করে, তখন সপুষ্পক উদ্ভিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, পরে শীতের আগমনে আরও আর্দ্রতা ও উষ্ণতা কমে যেতে থাকে ও সপুষ্পক উদ্ভিদের সংখ্যা আরও কমে যায়।

দেখা গেছে, দিন ও রাত্রির পরিমাণ যখন প্রায় সমান সমান, তখনই বেশীর ভাগ আগাছার ফুল ধরে, পরে শীতের দিকে রাত্রি বড় হতে থাকে ও আগাছায় ফুলও কম ধরে।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন ধানের তলা ফেলা হয়, সেই সময় ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ, যেমন—দূর্বা, শ্যামা ও মুথা গোষ্ঠীর আগাছার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী হয়। ঐ সময় বিশেষ করে মাটির নীচে মুথার যে কন্দ বা কুণ্ডলী থাকে, তা থেকে মুথা তাড়াতাড়ি ধানের তলায় বাড়তে থাকে। এ ছাড়া মুথাজাতীয় গাছ যেমন বিভিন্ন জাতের Scirpus মৌসুমী বায়ুর প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি মাথা গজিয়ে দাঁড়ায়, ফলে তলা তৈরী করবার সময় তাদের সহজে নির্মূল করা যায় না। বার বার লাঙল দিয়ে কর্ষণের ফলে মাটির নীচে ঐ সব আগাছার শিকড়গুলি উপড়ে যায় ও তারপর কাদা-করা জমি থেকে হাতের আঙুল দিয়ে আগাছার শিকড়গুলি ছেঁকে ফেলে দেওয়া হয়।

ধানের তলা থেকে আগাছা মাঝে মাঝে তুলে ফেলতে হবে, তা না হলে চারাগুলি সরু ও ক্ষীণ হয়ে যাবে। জমিতে ধানের চারা রোপণের পর চারাগাছে নূতন শিকড় গজায় ও নতুন পাতা গজিয়ে গাছ আস্তে আস্তে সবুজ হতে থাকে। এই সময় মাঝে মাঝে লক্ষ্য রাখতে হবে—জমিতে আগাছা জন্মে ছোট চারাগাছের যেন ক্ষতি না করে। তারপর দেখা যায়, ধানের চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিতে নানা জাতের আগাছার আগমন হয়, তারা ধানগাছের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় নামে খাদ্য, পানীয় ও বায়ুর জন্যে। তাই অন্ততঃ 15 দিন অন্তর ধানের জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলে দিতে হবে। এই সময় বিশেষ করে মুথাজাতীয়, চোঁচড়াজাতীয় (Scirpus maretimus; S. supinus, S. articulatus), হেসাতীজাতীয় (Cyperus haspan, Cyperus sp.) প্রভৃতি আগাছার উপদ্রব বেশী করে হয়। এসব আগাছা তাদের শিকড় ধানের শিকড়ের মধ্যে চালিয়ে দেয়, কাজেই ঐ আগাছা জমি থেকে না তুলে ফেললে ধানগাছ দুর্বল হয়ে পড়বে। চারাগাছের প্রথমাবস্থায় গাছ যদি আগাছার সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করে দুর্বল হয়ে যায়, তবে পরে অনেক চেষ্টা করলেও গাছের বৃদ্ধি ভাল করা যায় না। তাই দক্ষ চাষী এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আগাছার সংখ্যাও বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী হয়। এই সময় ধানগাছ তাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সবল হয়ে উঠে। ধানগাছ ও আগাছা উভয়ের বৃদ্ধির গতি শীর্ষস্থানে গিয়ে পৌঁছয়। এই সময় ঘাঁওয়া ঘাস (Echinochloa colona), ছেঁচি ঘাস (Alternanthera sessilis), Fimbristylis miliacea, Eragrostis sp. ক্ষেত-পাঁপড়া (Oldenlandia corymbosa), হোগল (Typha), শুসদো (Cyperus haspan হেসাতি), Ludwigia parviflora প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে। অক্টোবরের মাঝামাঝি সপুষ্পক আগাছার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হয়। এই সময় শালুক (Nymphaea), বাবুবা বা বাকৃজামা (Cardanthera triflora), Utricularia, Myriophyllum, Eriocaulon, ঝাঁঝি প্রভৃতি আগাছার আগমন ঘটে। দ্বিবীজ-পত্রী উদ্ভিদের আগাছা অক্টোবরের শেষ থেকে

জমি থেকে আস্তে আস্তে লোপ পায়। তার কারণ হলো—এই সময় প্রায় সব কয়টি আগাছার ফুল থেকে ফল হয় ও ফল পেকে বীজ মাটিতে পড়ে যায়।

ধানগাছের উপর আগাছার প্রভাব অনুযায়ী কয়েকটি আগাছাকে ক্রমান্বয়ে সাজানো যেতে পারে; Cyperus sp., Scirpus sp., Fimbristylis sp., Alteranthera sessilis, Eriocaulon sp., Ammania sp., Sporobolus diander. Erogrostis sp., Oldenlandia corymbosa, Panicum, Chara, Ludwigia, Utricularia, Myriophyllum, Limnophila, Cardanthera.

নীচে কয়েকটি আগাছা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আসা যাক।

ঝাঝা—এটি শ্যাওলাজাতীয় নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ। ঝাঝা ধানগাছের পরম শত্রু। এরা দেখতে প্রায় পাতাঝাঁঝির মত। কোন জমিতে একবার ঝাঝা দেখা দিলে অল্প দিনের মধ্যে জমিকে ছেয়ে ফেলে এবং দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন সবুজ রঙের সুতা কুণ্ডলী পাকিয়ে ধান জমি ছেয়ে ফেলেছে। সাধারণতঃ অক্টোবর মাসে ধানের জমিতে এদের আগমন হয় ও নভেম্বরের শেষাশেষি জল শুকাবার সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলি শুকিয়ে মারা যায়। এদের গা থেকে এক প্রকার ঝাঁঝালো ও দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরোয়, যা ধানগাছগুলিকে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর করে ফেলে। তাই দেখা যায়, যে জমিতে একবার ঝাঝার আক্রমণ হয়, তা যদি বিনাশ না করা হয়, তবে ধানের ফলন $\frac{1}{2}$ অংশেরও কম হয়।

শুশনিশাক—এর প্রাদুর্ভাব খুব বেশী হয় না। সাধারণতঃ এদের গোড়া আলে থাকে আর সরু শাখা-প্রশাখাগুলি জলের উপর ভেসে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। Azolla ও Salvinea এক প্রকার পানা, যা কোন কোন জায়গায় ধানের জমিতে জলের উপর ভেসে কিছু দূর বিস্তৃত হয়। Ottelia alismoides, যাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় রামকলা। ধানের জমিতে অল্প জলে ও গভীর জলে এরা জন্মায়। চারা অবস্থায় উপড়ে দিলে সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।

Lagarosiphon roxburghii ও Hydrilla verticillata, যাদের বলা হয় পাতাঝাঁঝি—সাধারণতঃ কাছাকাছি পুকুর থেকে জলের সাহায্যে ধানের জমিতে প্রবেশ করে।

ঘাসজাতীয় আগাছা, যা Gramineae ও Cyperaceae গোষ্ঠীভুক্ত, ধানের জমিতে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। Gramineae-র মধ্যে দূর্বা (Cynodon dactylon), Dactyloctenium aegyptium, শ্যামা (Panicum repens), ঘঁওয়া ঘাস (Echinochloa colona), ও Eragrostis sp. সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ধানের জমিতে প্রভাব বিস্তার করে। Gramineae গোষ্ঠীর কয়েকটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

Ishaemum rugosum-এর গাছ দেখতে প্রায় ধানগাছের মত। তাই ফুল ফোটবার আগে আগাছা পরিষ্কার করবার সময় তারা ধরা পড়ে না। ফুল ফুটলেই তার মঞ্জরী দণ্ডে চ্যাপ্টা কাছাকাছি সন্নিবিষ্ট শুকনো ফুল দেখে সহজেই ধানগাছ থেকে পৃথক করা যায়।

Setaria glauca-র গাছও ছোট অবস্থায় ধানের চারা থেকে পৃথক করা যায় না। কারণ তারাও দেখতে ধানের চারার মত।

সুতরাং Ishaemum rugosum ও Setaria glauca থেকে আমরা এটুকু জানতে পারি যে, আগাছা তার আকৃতি ফসলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে (Mimicry) আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে। এদের ফুল ও ফল ধরে ঠিক ধানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, ফলে ধান ঝাড়বার সময় তারা ধানের সঙ্গে মিশে যায় ও পরের বছর

বীজ ধানের সঙ্গে আবার ধানের জমিতে চলে আসে। কাজেই প্রকৃতি সব সময় চেষ্টা করে আগাছাকে রক্ষা করতে আর আমরা চেষ্টা করি আগাছার হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে। তাই প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা। কার্যতঃ প্রকৃতির কাছে আমরা অনেক সময় হার স্বীকার করি।

Echinochloa colona (ঘাওয়া ঘাস), Dactyloctenium ও Sporobolus diander ধানচারার সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে যায় যে, আগাছা পরিষ্কার করবার সময় কখন কখন ধানের চারাও উপড়ে ফেলা হয়। Gramineae গোষ্ঠীর অধিকাংশ আগাছায় ধানের ফুলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ফুল ধরে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

Chloris inflata-কে তার তুলার মত মঞ্জরী দণ্ড নিয়ে আলের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। Eragrostis-এর গোড়া এক দিকে থাকে, কিন্তু অসংখ্য সরু কাণ্ড ধানগাছের ভিতর দিয়ে কিছু দূর অগ্রসর হয়। এদের চ্যাপ্টা মঞ্জরী পাতলা শল্কপত্র দিয়ে ঢাকা, দেখতে প্রায় চিরুণীর খাঁজকাটার মত, মঞ্জরীদণ্ডের উভয় পার্শ্বে শাখা-প্রশাখায় সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকে। এদের সাধারণতঃ উঁচু ও মাঝারী জমিতে দেখা যায়। বিশেষ করে উঁচু জমিতে বেশী দেখা যায়। এছাড়া হোগলাজাতীয় গাছ Typha গভীর জমিতে দেখা যায়।

Cyperaceae-র আগাছা ধানের জমিতে একটা ভীতির সঞ্চার করে। এদের Cyper বা Sedge বলা হয়। এই গোষ্ঠীর মধ্যে মুথা (Cyperus rotundus), হেলাঞ্চি বা ভাদো (Cyperus haspan), চৌচড়াজাতীয় Sedge (যেমন Scirpus articulatus, Cyperus pumilus, Scirpus maritimus) ও Fimbristylis miliacea, F. ferruginea, F. schoenoides উল্লেখযোগ্য। ধানজমিতে এদের প্রাচুর্য অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। যথা, Fimbristylis miliacea, Cyperus haspan ও অন্যান্য Fimbristylis-এর প্রজাতি ধানের জমিতে খুব বেশী দেখা যায়, যা নির্মূল করা বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে।

Cyperus haspan একবার কোন জমিতে দেখা দিলে তা বিনাশ করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে ওঠে। এর শিকড় ধানের শিকড়ের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে, ঐ আগাছাকে ধানগাছ থেকে পৃথক করা যায় না। প্রায়ই দেখা যায় এরা ধান কাটবার সঙ্গে সঙ্গে ধানগাছের সঙ্গে মিশে খামারে চলে যায় ও পরে ধান মাড়াবার সময় এর ছোট বীজধানের সঙ্গে মিশে যায় এরা Cyperus pumilus-কে তার গোলাকার মঞ্জরী নিয়ে সাধারণতঃ উঁচু জমিতে দেখা যায়। এদের শিকড়ও ধানের শিকড়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। Scirpus articulatus (চৌচড়া) গভীর জমিতে দেখা যায়। এদের মঞ্জরীদণ্ড শোলার মত ফাঁপা, বায়ুপূর্ণ কুঠরীযুক্ত ও নলাকার। এই নলাকার মঞ্জরীদণ্ডের গাঁটের চারদিকে বা এক পার্শ্বে এক থোকা শুকনো হাল্কা মঞ্জরী থাকে। মাটির নীচে এর কাণ্ড কন্দাকার, যার থেকে গোছা গোছা গুচ্ছ মূল বেরোয়। যেখানে এরা জন্মায়, প্রায় মাঠ ছেয়ে ফেলে। Scirpus maritimus অপেক্ষাকৃত কম গভীর জমিতে Scirpus articulatus-এর মত জমি ছেয়ে ফেলে। এদের মঞ্জরীদণ্ড তিন চার কোণযুক্ত ও শীর্ষে ছোট শূঁয়ার মত ফুল ধারণ করে। এরা উঁচু ও মাঝারী জমিতে বেশী হয়। Fimbristylts miliacea-কে ধানের জমিতে প্রচুর দেখা-যায়। এক গুচ্ছ মঞ্জরীদণ্ড মাটির গুচ্ছ মূল থেকে বেরিয়ে শীর্ষে আঙুলের বা ছাতার মত শাখা বিস্তার করে ও প্রতি শাখার শীর্ষে শুকনো শল্কপত্রে ঢাকা গোলাকার ও ছোট মঞ্জরী ধারণ করে। Fimbristylis ferruginea-কে

সাধারণ কৃষকেরা 'ধানী' বলেন, কারণ এরা ধানগাছেরই মত দেখতে ও ধানের সঙ্গে সঙ্গে ফুল ফোটে, ফলে ধানের সঙ্গে সঙ্গে মিশে যায়। ঘেঁচু (Sagittaria sagitallis) শুধু অল্প জলের মধ্যে হয়। জল শুকিয়ে গেলে আপনা থেকে মরে যায়। এর পাতাগুলি বর্শার ফলার মত, গাত্র মসৃণ ও চামড়ার মত, বড় ডাঁটাযুক্ত পাতা জলের উপর ভেসে থাকে। শিকড় প্রচুর, মাটির মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

টকোপানা (Pistia) ধানের জমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সাধারণতঃ পাশাপাশি পুকুর থেকে এরা ধানের জমিতে চলে আসে। যেখানে একবার হয়, অল্প দিনের মধ্যে সেখানকার জলের উপরিভাগ এমনভাবে ছেয়ে ফেলে যে, একটা মাঝারি ধরণের পাথরের নুড়ি ছুঁড়ে দিলেও তা ভেদ করে জলের মধ্যে যেতে পারবে না। এর ফলে তারা ধানগাছের স্বাভাবিক গতিকে বাধা দেয়। Lemna ও Wolffia এক ধরণের ছোট পানা, যা ধানের জমিতে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

Eriocaulon এক প্রকার মজার আগাছা, যা সাধারণতঃ অক্টোবর মাসে মাঝারী ও গভীর জলে দেখা যায়। এদের উৎপত্তি খুব মজার। জমিতে এদের আগমনের প্রথমাবস্থায় জলের নীচে মাটির দিকে তাকালে দেখা যায় যেন এক-গুচ্ছ সবুজ সূঁচ গোলাকার গম্বুজ তৈরী করে আছে। মনে হয় যেন সবুজ তারা জলের নীচে মাটির উপর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে, পরে ঐ নলকার মঞ্জরীগুচ্ছ বড় হতে থাকে; ইতিমধ্যে ধানের জমিতে জল কমতে থাকে, পরে ধান কাটবার সময় এরা ফুলধারণ করে। এমনকি ধান কাটবার সময় শুকনো জমিতে মঞ্জরীদণ্ডের অগ্রভাগে গোলাকার শুভ্র মঞ্জরী ধারণ করে, পরে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে বীজ পেকে মাটিতে পড়ে যায়।

Commelina benghalensis, যাকে বলা হয় কচুরীপানা, ধানের জমিতে ভীতির সঞ্চার করে। যেখানে জন্মায়, সেখানে এত প্রচুর হয় যে, জলের উপরিভাগ ঢেকে ফেলে ও পরস্পর কাছা-কাছি এসে ধানগাছগুলিকে চেপে দেয়।

চিকনি শাক (Polygonum plebejum), যার শাখা-প্রশাখা প্রচুর ও মাটির উপর একটা চাকের মত ছড়িয়ে পড়ে, ধান কাটবার পর পোড়ো জমিতে প্রচুর জন্মায়।

Amarantaceae গোষ্ঠীর আগাছার মধ্যে ছেঁচি ঘাস বা ছাঁচি (Alternanthera sessilis) ধানের জমিতে প্রচুর দেখা যায়। এর শিকড় জলের নীচে মাটিতে থাকে, আর শাখা-প্রশাখা জলের উপরে এসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণতঃ উঁচু জমিতে প্রচুর পরিমাণে ও মাঝারী জমিতে কম দেখা যায়। মালঞ্চ (Allmannia nodiflora) খুব বেশী ধানের জমিতে হয়।

Caryophyllaceae গোষ্ঠীর গিমে শাক (Polycarpon loeflingae) সাধারণতঃ ধান কাটবার পর পোড়ো জমিতে বেশী জন্মায়, অবশ্য ধানজমিতেও দেখা যায়।

শালুক (Nymphaea) ফুল সাদা, নীল, লাল, বিভিন্ন রঙের হয়, সাধারণতঃ গভীর জমিতে দেখা যায়। প্রায় পানের পাতার মত বেশ বড় এর পাতাগুলি জলের ঠিক উপরে ভেসে থাকে। এর কাণ্ড কন্দাকার, প্রচুর রসালো শিকড়যুক্ত ও কাদার মধ্যে থাকে। এরা সাধারণতঃ অক্টোবর মাসের প্রথমে ধানের জমিতে জন্মায়, ফুল থেকে ফল হয় ডিসেম্বর মাসে।

Leguminosae গোষ্ঠীর ঢৈঞ্চাজাতীয় (Sesbania aculeata), Aeschynomene indica গভীর জমিতে কম পরিমাণে জন্মায়।

Euphorbiaceae গোষ্ঠীর Euphorbia hirta (বড় দুধেলুই) সাধারণতঃ উঁচু জমিতে প্রচুর দেখা যায়। Euphorbia microphylla কম পরিমাণে শুকনো জমিতে দেখা যায়।

Elatinaceae-র Bergia capensis সাধারণতঃ মাঝারী গভীর জলে দেখা যায়, এর কাণ্ড সোজা, নীচের দিকে শোলার মত বায়ুপূর্ণ, গোড়া থেকে গোছায় গোছায় জন্মায়।

বাগমারি (Ammannia baccifera), চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলা হয় বৈনাড়ী, উঁচু ও মাঝারী জমিতে প্রচুর দেখা যায়। এছাড়া Ammannia-র প্রজাতিও ধানের জমিতে জন্মায়, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এদের ফুল হয়, ডিসেম্বর মাসে ফল থেকে বীজ পেকে নীচে পড়ে যায়।

Oenotheraceae গোষ্ঠীর Ludwigia parviflora প্রচুর ডালপালাসমন্বিত ও লবঙ্গের মত ফুল ও ফলধারণ করে। এরা সাধারণতঃ মাঝারী ও উঁচু জমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। Jussieua repens ভাসমান কাণ্ডের উপর শোলা ও কচুরিপানার মত বায়ুপূর্ণ ফোলা বোঁটা ও পাটলবর্ণের ফুল নিয়ে জলের উপর ভেসে থাকে ও গভীর জমিতে দেখা যায়।

Halorrhagaceae গোষ্ঠীর Myriophyllum indicum মাঝারী গভীর জমিতে দেখা যায়। জলের নীচে এদের কাণ্ড ফোলা ও বায়ুপূর্ণ থাকে আর ঝাঁউপাতার মত খাঁজকাটা পাতা ধারণ করে। জলের উপরিভাগে পাতা সম্পূর্ণ, খাঁজকাটা নয়। কাণ্ডের শীর্ষে পাটল বর্ণের ফুল ধরে।

থানকুনি (Centella asiatica) সাধারণতঃ উঁচু জমিতে দেখা যায়।

কলমীশাক (Ipomoea aquatica) ধানের জমিতে প্রচুর দেখা যায়। এদের শিকড় এক জায়গায় থাকে আর কাণ্ডগুলি জলের উপরে ভেসে ভেসে ধানের জমির মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

Hydrophyllaceae-এর Hydrolea zeylanica (ঈশলাঙ্গুলা) ও Verbenaceae-র Phyla nodiflora সাধারণতঃ উঁচু জমিতে দেখা যায়।

Scrophulariaceae-র Limnophila micrantha ও L. heterophylla, যাদের চব্বিশ পরগণা জেলায় 'জলবোন' বলে, ধানের জমিতে প্রায় দেখা যায়।

ব্রাহ্মী (Bacopa monnieri) সাধারণতঃ উঁচু জমিতে অল্প জলে বা শুকনো জমিতে জন্মে।

Lentibulariaceae-র Utricularia-কে মাঝারী জমিতে জলের উপর ঘনভাবে ভাসতে দেখা যায়।

বাঘুয়া বা বাকৃজামা, কাথলা (Cardenthera triflora) মাঝারী গভীর জমিতে যেখানে জল দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। জলের নীচে এর পাতা ঝাঁউগাছের পাতার মত খাঁজকাটা ও জলের উপরের পাতা সম্পূর্ণ, কিন্তু কিনারা দাঁতের মত খাঁজকাটা ও খসখসে, কাণ্ড রসালো—যেখানে জন্মায় জঙ্গল হয়ে যায়। কুলেখাড়া (Asteracantha longefolia) মাঝারী গভীর জলে কম দেখা যায়। সাধারণতঃ আলের কাছে এরা প্রচুর জন্মায়। এদের ফুলের রং পাটল বর্ণের ও কাণ্ডে প্রচুর কাঁটা থাকে। Rungia সাধারণতঃ উঁচু জমিতে গুল্মাকারে জন্মায়, তবে কম দেখা যায়।

ক্ষেতপাঁপড়া (Oldenlandia corymbosa) (Rubiaceae) সাধারণতঃ মাঝারী গভীর জলে ও উঁচু জমিতে হয়, এদের কাণ্ডগুলি সরু ও পাতা বিপরীতমুখী, সাধারণতঃ জলের উপরিভাগে কাণ্ডগুলি ভেসে থাকে।

Campanulaceae-এর Sphenoclea zeylanica মাঝারী গভীর জলে ডালপালা বিস্তার করে ও প্রধান কাণ্ডের শীর্ষে মঞ্জরীধারণ করে। গোড়ার দিকে কাণ্ড শোলার মত বায়ুপূর্ণ ও ফোলা থাকে।

কেশুতে (Eclipta prostrata)-কে ধান-

জমিতে প্রায় দেখা যায়। খারমুন্ডিয়া (Sphaeranthus indicus) সাধারণতঃ ধান কাটবার পর পোড়ো জমিতে চক্রাকারে জন্মাতে দেখা যায়।

আমরা ধানের জমিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আগাছা সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। ধানের জমির আগাছাকে আমরা নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করতে পারি।

1. ভাসমান—Pistia, Lemma, Azolla, Jussieua ইত্যাদি।

2. ভাসমান কিন্তু শিকড় মাটিতে—Alternanthera, Ipomoea, Oldenlandia ইত্যাদি।

3. কাণ্ড কন্দাকার, মাটির নীচে থাকে—Nymphaea, Monochoria ইত্যাদি।

4. কাণ্ড প্রচুর শাখাযুক্ত—Ludwigia, Ammannia, Sphenoclea ইত্যাদি।

5. মাটির উপর লতানো—Evolvulus, Centella, Bacopa, Polycarpon ইত্যাদি।

অ্যালুমিনিয়ামের উপর ফটোগ্রাফি

পার্থসারথি চক্রবর্তী

অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর উপর ফটোগ্রাফি তোলবার ব্যাপারটা খুবই আধুনিক। এজন্যে অবশ্য বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ামে কাজ হয় না—অ্যানোডিক অক্সিডেসন বা ধনাত্মক তড়িদ্দ্বারে জারণ-প্রক্রিয়ার সাহায্যে অ্যালুমিনিয়ামের উপর পাতলা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের একটা পর্দা তৈরী করে নিতে হয়। এই পর্দা কতটা পুরু ও ঝাঁঝরা হবে, তা নির্ভর করে তড়িৎ-বিশ্লেষণের সময়, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ-ঘনত্ব এবং তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের উপর। পর্দার প্রকৃতি এবং রং কি হবে, সেটাও নির্ভর করে অ্যালুমিনিয়াম অথবা তার সঙ্করের সংযুক্তির উপর।

সাধারণতঃ বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম বাতাসের সংস্পর্শে আসলে তার গায়ে অক্সাইডের একটা পর্দা পড়ে। এটার ঘনত্ব হচ্ছে 40—50 A° (1A°=10^{-8} সে. মি.)। এই পর্দা পড়ে বলে অ্যালুমিনিয়াম কিছুটা নিষ্ক্রিয় ধাতুতে পরিণত হয়। কিন্তু এই আস্তরণটা এত পাতলা হয় যে, এটা ধাতুকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না। শুধু তাই নয়, বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর উপর রং ও বার্নিশ খুব ভাল করে লাগানোও মুস্কিল।

তাই আজকাল অ্যালুমিনিয়ামের উপর কৃত্রিম উপায়ে একটা অক্সাইডের পর্দা তৈরী করা হয়—যাতে সেটা ধাতুর ক্ষয়রোধ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে তার যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক এবং আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ধর্মকে আরও উন্নত করতে পারে। অ্যালুমিনিয়াম ও সীসাকে যথাক্রমে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক তড়িদ্দ্বার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তড়িৎ-বিশ্লেষ্য হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড। এই তড়িৎ-বিশ্লেষণের কালে যে অক্সিজেন বেরোয়, তা অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের একটা পর্দা তৈরী করে। এই অক্সাইডের পর্দার তিনটি স্তর থাকে। প্রথম স্তর, যেটা ধাতুর খুব কাছাকাছি থাকে, সেটা বেশ শক্ত হয়। এটার নাম বেরিয়ার (Barrier) স্তর। মাঝের স্তর কিছুটা ঝাঁঝরা এবং তৃতীয় স্তর—যেটা সবচেয়ে উপরে থাকে, তাকে বলে ব্লুম (Bloom)। এই স্তরটা অবশ্য একটু ঘষেই তুলে ফেলা যায়।

তড়িৎ-বিশ্লেষণের সময় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই তৃতীয় স্তর অর্থাৎ ব্লুম তৈরী হতে পারে না।

অক্সাইডের এই ঝাঁঝরা পর্দায় রং এবং অন্যান্য অনেক জৈব রাসায়নিক বস্তু অতি সুন্দরভাবে শোষিত হয়। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড কতটা রং শোষণ করবে, তা নির্ভর করে ঝাঁঝরার আকৃতি এবং রঙের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর।

অক্সাইড পর্দাকে আলোক-অনুভূতিশীল বস্তু দিয়ে অনুষিক্ত করতে হলে সেই পর্দাকে অবশ্যই বর্ণহীন পুরু ও সচ্ছিদ্র হতে হবে। খুব ভাল অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পর্দা তৈরী করতে 99.4 থেকে 99.9 শতাংশ বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম দরকার।

ধনাত্মক তড়িদ্বার হিসাবে (6×9 সে. মি.) 0.5—0.7 মিলিমিটার পুরু একটা শক্ত অ্যালুমিনিয়ামের পাত নেওয়া হয়। এই 99.5 শতাংশ বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম পাত পাশাপাশি বসানো দুটি সীসার পাতের তৈরী ঋণাত্মক তড়িদ্বারের ঠিক মাঝখানে বসানো হয়। অ্যানোডিক অক্সিডেশন বা ধনাত্মক তড়িদ্বারে জারণ-প্রক্রিয়ার কাজটা সারা হয় কাচের তৈরী 5 লিটারের একটা তড়িৎ-কোষে। তড়িৎ-কোষের উষ্ণতা এই সময় 27° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি রাখা হয়। অ্যালুমিনিয়ামের পাতটিও খুব পরিষ্কার থাকা বাঞ্ছনীয়। এর জন্যে আগে থেকে পালিশ করে নিয়ে এটাকে 46 গ্র্যাম ডাই-সোডিয়াম ফস্‌ফেট, 8 গ্র্যাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং 26 গ্র্যাম সোডিয়াম সিলিকেট মিশ্রণের এক লিটার জলীয় দ্রবণে ডুবানো হয়। এর পর পাতটা 5% নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবণের মধ্যে মিনিটখানেক রেখে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিয়ে ধনাত্মক তড়িদ্বারে জারিত করা হয়। অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম-সঙ্করের জন্যে খুব ভাল তড়িৎ-বিশ্লেষ্য হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড ও ক্রোমিক অ্যাসিড। এগুলির মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রচলন সবচেয়ে বেশী। জারণ-প্রক্রিয়া সাধারণ উষ্ণতায় 15 থেকে 20% সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণে 2 থেকে 3.5 বিদ্যুৎ-ঘনত্বে করা হয়। এর জন্যে সময় লাগে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট।

অ্যালুমিনিয়ামের জারণ-কার্য সম্পূর্ণ হলে সেটাকে আলোক-অনুভূতিশীল করা হয়। আলোক-অনুভূতিশীল করবার জন্যে অবশ্য অনেক রকম পদ্ধতি আছে। যেমন—(1) সিলভার হ্যালাইড (2) ব্লু প্রিন্টিং, (3) ক্রোড ম্যান ও লেভিটান, (4) জিলেটিন ইমালসান, (5) ডায়াজো পদ্ধতি।

সিলভার ব্রোমাইড পদ্ধতিতে জারিত অ্যালুমিনিয়ামের পাতকে 10% KBr দ্রবণে অনুষিক্ত করে জলে ধুয়ে নিয়ে পুনরায় 10% $AgNO_3$ দ্রবণে অনুষিক্ত করতে হয়। 15 থেকে 20 বার এটার পুনরাবৃত্তি করলে অ্যালুমিনিয়ামের গায়ে বেশ সুন্দরভাবে AgBr শোষিত হয়ে থাকে। এই ভাবে অ্যালুমিনিয়ামের পাত আলোক-অনুভূতিশীল হয়ে যাবার পর 50 গ্র্যাম/লিটার $K_3Fe(CN)_6$ এবং 50 গ্র্যাম/লিটার KBr দ্রবণে বিরঞ্জিত করা দরকার।

এবার পাতটিকে একটি নেগেটিভের মাধ্যমে আলোকিত করে ডেভেলপ করা হয়। ডেভেলপ করবার জন্যে প্রয়োজন—অ্যামিডল—5 গ্র্যাম; সোডিয়াম সালফাইট—50 গ্র্যাম, পটাসিয়াম ব্রোমাইড—10 থেকে 15 গ্র্যাম, জল—এক লিটার। এর সঙ্গে 3 থেকে 5 সি. সি. 40% ল্যাকটিক অ্যাসিডও কখন কখন যোগ করা হয়। আর fixing করা হয় হাইপো দ্রবণের সাহায্যে।

সিলভার ক্লোরাইড পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়ামের পাতকে ঋণাত্মক তড়িদ্বারে জারিত করবার পর সেটাকে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর এটাকে 2—3% NH_4Cl এবং 2% টারটারিক অ্যাসিডের দ্রবণে চুবিয়ে নিয়ে পরে আবার শুকানো প্রয়োজন। সব শেষে পাতটি

2% $AgNO_3$ এবং 0·005% নাইট্রিক অ্যাসিডে ডুবানো হয়। সমস্ত কাজটা সারা হয় অন্ধকার ঘরে। এইভাবে পাতের অক্সাইড পর্দায় অদ্রবণীয় AgCl থিতিয়ে পড়ে। এবার যথারীতি একটা নেগেটিভের মাধ্যমে প্লেটকে আলোকিত করে ডেভেলপ করা হয়। fixing করা হয় অন্ধকার ঘরে ও তারপর seal করা হয়। সিলভার ক্লোরাইড পদ্ধতির অসুবিধাও আছে। সিলভার ক্লোরাইডের অধঃক্ষেপ ফেলবার জন্যে এই অধঃক্ষেপ বিক্রিয়াটি বহুবার করবার প্রয়োজন। আর অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করলে ছবি প্রায়ই ঝাপসা হয়ে যায়।

ব্লু-প্রিন্টিং পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়ামের পাতে ছবি ওঠে চমৎকার। এই জন্যে প্লেটটি আলোক-অনুভূতিশীল ফেরিক লবণের দ্রবণে অনুষিক্ত করা হয়। এই লবণের দ্রবণে থাকে, ফেরিক অ্যামোনিয়াম সাইট্রেট—125 গ্র্যাম, পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড—100 গ্র্যাম, জল—এক লিটার।

অনুষিক্ত করতে সময় লাগে 30-40 মিনিট। এর পর প্লেটটি জলে ধুয়ে, শুকিয়ে একটি নেগেটিভের মাধ্যমে আলোকিত করা হয়। আলোর সংস্পর্শে এসে কিছুটা ফেরিক লবণ ফেরাসে রূপান্তরিত হয়। পরে এই ফেরাস লবণ $K_3Fe(CN)_6$-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে প্রুসিয়ান ব্লু—ফেরিক ফেরোসায়ানাইড উৎপন্ন করে। এর পর ডেভেলপের কাজ সারা হয় 1% নাইট্রিক অ্যাসিড অথবা 5% হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে পাতটিকে ডুবিয়ে। এবার ওটাকে জলে ধুয়ে, শুকিয়ে নিতে হবে। শেষ অবস্থায় নীল রং থাকবার জন্যে এটাকে আর হাইপো ফিক্সিং করা হয় না। এই নীল রংকে অবশ্য পুনরায় বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর সঙ্গে ক্রিয়া করিয়ে সবুজ, কালো অথবা ধূসর বর্ণের করা যায়।

Freeman-Leviton প্রণালীতে অ্যানোডিক অক্সিডেসনের দ্বারা প্রস্তুত অ্যালুমিনিয়াম-পাতকে খুব শক্তিশালী জারণ পদার্থ, যেমন ক্রোমিক অ্যাসিডের দ্বারা জারিত করা হয়। তার পর পাতটা সিলভার নাইট্রেট, জিলেটিন ও পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট-এর একটা জলীয় দ্রবণে ডুবিয়ে, পরে শুকিয়ে নিয়ে আবার KBr ও K_2Cr_2O-এর দ্রবণে ডুবানো হয়। এই ভাবে আলোক-অনুভূতিশীল সিলভার হ্যালাইড পাতের উপর জমা পড়ে। এর পরের কাজগুলি AgBr পদ্ধতির মতন—নতুন বিশেষ কিছু করবার দরকার হয় না। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফ্রিম্যান-লেভিটোন পদ্ধতিতেই আজকাল জারিত অ্যালুমিনিয়াম-পাতের উপর ফটোগ্রাফি তোলা হয়।

অ্যালুমিনিয়ামকে ধনাত্মক তড়িদ্দ্বারে জারিত করে ধাতুকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বেশ ভাল করে রক্ষা করা যায়। এটি তখন ফটোগ্রাফি পুনর্মুদ্রণের কাঠামো এবং ছাপাখানার প্লেট উৎপাদনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। শুধু তাই নয়, এই জারিত অ্যালুমিনিয়ামের তাপ রোধ করবার শক্তিও জন্মায় খুব বেশী। স্লাইড-রুল, নেম প্লেট, সাইনবোর্ড, ক্যালেণ্ডার কার্ড এবং আরও অনেক সুদৃশ্য সৌখীন সামগ্রী সাজাবার কাজে এই জাতীয় অ্যালুমিনিয়ামের পাত খুবই উপযোগী। ছবি আঁকা প্লেটটি নিউক্লিয়ার বিকিরণের সংস্পর্শে আসলে অথবা 600° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ পেলেও এর কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। সম্প্রতি অতিমাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করে অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইডের উপরকার ছবি অবিকৃত রেখে অ্যালুমিনিয়াম ধাতুকে আস্তে গলিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে আনাও সম্ভব হয়েছে।

সঞ্চয়ন

প্লাষ্টিকের যুগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সব শিল্প খুব দ্রুত গতিতে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে প্লাষ্টিক-শিল্প অন্যতম। ঘর-সংসারের কাজে, অফিসের কাজে, খেলার মাঠে আমেরিকার লোকেরা যা কিছু করে, তাতেই প্লাস্টিক ব্যবহার করে। বছর বছর প্লাস্টিকের ব্যবহার কেবল বেড়েই চলছে।

অপরিশোধিত তেল থেকে উৎপন্ন প্লাষ্টিক আমেরিকায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পায়ে হাঁটবার রাস্তা, নর্দমার নালার মুখ, বিমানের পাখা সবই প্লাষ্টিকের তৈরী। শুধু কি তাই, ফুটবল খেলার মাঠ তাও প্লাষ্টিকের। প্লাষ্টিকের তৈরী বাড়ী পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় আমেরিকায়। মার্কিন মহাকাশচারীরা পৃথিবী ও চাঁদের কক্ষ পরিক্রমার কালে প্লাষ্টিকের শক্তি ও নমনীয়তার উপরই নির্ভর করেন। কাজেই প্রকারান্তরে প্লাষ্টিকই তাদের জীবন রক্ষা করে। প্লাষ্টিকের হৃৎপিণ্ড, প্লাষ্টিকের অস্থি ও রক্তনালী ব্যবহার করে হাজার হাজার লোক প্রাণে বেঁচে আছে।

ঘোড়ার পায়ে এখন দেখা যায় প্লাষ্টিকের খুর। জর্জিয়ার গোশালার গরুর পাল রাত-দিন প্লাস্টিকের কার্পেট বিছানো মেঝের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জলে নিমজ্জিত জাহাজকে জল থেকে তুলতে হলে প্লাষ্টিকের সাহায্যে তাড়াতাড়ি তোলা সম্ভব হবে। রাসায়নিক ইউরিথেন ফেনাকে অতি উচ্চ-চাপে ডুবন্ত জাহাজের খোলের মধ্যে ফেলতে হবে। প্লাস্টিকের ফেনা সম্প্রসারিত হয়ে খুব জোরদার এক প্লবতার সৃষ্টি করবে, ফলে ডোবা জাহাজটি জলের উপরে ভেসে উঠবে।

বিগত দুই দশক যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্লাষ্টিকের উৎপাদন বেড়ে গেছে। 1950 সালে 210 কোটি পাউণ্ড (প্রায় 95 কোটি কিলোগ্র্যাম) প্লাষ্টিক উৎপন্ন হয়েছে। 1967 সালে এই উৎপাদন সাতগুণ বেড়ে গিয়ে 1450 কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় 650 কোটি কিলোগ্র্যাম হয়।

আমেরিকায় বর্তমানে প্রায় 6 হাজারটি প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে প্লাষ্টিক-শিল্পের শুভযাত্রা হয়। হাতির দাঁত দিয়ে আগে বিলিয়ার্ড খেলবার বল তৈরী করা হতো। 1868 সালে জন ওয়েসলি হায়াট ঐ বল তৈরীর জন্যে সেলুলয়েড আবিষ্কার করেন। তুলা, কর্পূর আর নাইট্রিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে এই সেলুলয়েড তৈরী হয়েছিল। এ থেকে খুব সুন্দর বিলিয়ার্ড বল তৈরী হলো। তাছাড়া, সেলুলয়েড থেকে প্রস্তুত হতো ভাল ভাল নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী। যেমন, জামার কলার, কৃত্রিম দাঁত আর চলচ্চিত্রের ফিল্ম। গোড়ার দিকে এ দিয়ে মোটরগাড়ীর জানালার পর্দাও তৈরী হতো। 1909 সালে ডক্টর লিও. এইচ বীকল্যাণ্ড ফেনল ও ফর্মালডিহাইডের সঙ্গে একটা নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রথম ফেনলিক প্লাষ্টিক তৈরী করেন। এটা একটা কঠিন, অনমনীয় আর মজবুত পদার্থ। তিনি এর নাম দেন বেকলাইট। টেলিফোন, দেয়ালঘড়ি, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির হাতল আর রেঁস্তোরার টেবিলের উপরে এর ব্যাপক ব্যবহার হতে থাকে।

আধুনিক প্লাষ্টিক-শিল্পের কাজ আসলে সুরু হয় 1930 সাল থেকে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসে যে হাজারো রকমের হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ প্রভৃতি রয়েছে, সেগুলি দিয়ে অনেক নতুন নতুন পদার্থ

তৈরী করা যায়। এইভাবে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের জন্ম হলো। বর্তমানে প্রতি এক-শ' পিপা তেল থেকে প্রায় চার পিপা পেট্রোকেমিক্যাল উৎপন্ন হয়। আর 30 শতাংশ পেট্রোকেমিক্যাল প্লাষ্টিকে রূপান্তরিত হয়। আজকাল অবশ্য কিছু কিছু প্লাষ্টিক সেলুলোজ থেকে অথবা কয়লাঘটিত রাসায়নিক দ্রব্য থেকেও উৎপন্ন হয়, তবে 89 শতাংশ প্লাষ্টিকই পাওয়া যায় পেট্রোকেমিক্যাল থেকে।

হাম্বল ওয়েল অ্যাণ্ড রিফাইনারি কোম্পানীর পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থগুলি প্লাষ্টিক হবারই কথা ছিল, কিন্তু অ্যান্‌জে কেমিক্যাল কোম্পানী প্রভৃতি নানা কোম্পানীর দৌলতে সেগুলি পর্যবসিত হয়ে যায় পেট্রোকেমিক্যালে। অ্যান্‌জে কোম্পানীর তৈরী প্লাষ্টিকের বাজার বিরাট ও ব্যাপক। ওদের উৎপন্ন জিনিসের মধ্যে পলি-থিলিনও রয়েছে। আমেরিকার তৈরী প্লাষ্টিকের মধ্যে পলিথিলিন হচ্ছে সবচেয়ে সেরা। ভিনিল হচ্ছে দ্বিতীয়, আর পলিপ্রোপাইলিন হচ্ছে নতুন-তম প্লাষ্টিক, যার অগ্রগতি সবচেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

আজকাল প্লাষ্টিকের সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যবহার হচ্ছে চিকিৎসার ক্ষেত্র। পলিপ্রোপাইলিনের তৈরী হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ব বছরে চার কোটি বার স্পন্দিত হচ্ছে। অথচ অবক্ষয়ের কোন নামগন্ধই চোখে পড়ে না। যে যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন হৃৎপিণ্ড বসানো সম্ভব নয় প্লাষ্টিকের তৈরী টিউব তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পলিপ্রোপাইলিনের সেলাইয়ের জোড় দিয়ে ক্ষতস্থান জুড়বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কুকুরের ভাঙা হাঁটু সারাবার জন্যে প্লাষ্টিকের সন্ধি-বন্ধনী পরীক্ষামূলকভাবে শীঘ্রই বসানো হচ্ছে। মানুষের বিকল হাঁটু সারাবার জন্যে এই ধরণের কৃত্রিম সন্ধি-বন্ধনীর ব্যাপক প্রয়োগ হবে বলে মিশিগান রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু শল্যচিকিৎসকেরা আশা পোষণ করেন।

মানুষের দৃষ্টিশক্তির অমূল্য সম্পদ কর্ণিয়া আজকাল প্লাষ্টিকের তৈরী হচ্ছে। কৃত্রিম কর্ণিয়ার এই ব্যবহার চিকিৎসা-বিজ্ঞান মেনে নিয়েছে। একজন প্রখ্যাত চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এই ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন হলে বিশ্বের অন্ধত্ব 15 শতাংশ বিদূরিত হবে।

প্লাষ্টিকের এই চমকপ্রদ প্রয়োগ কেবলমাত্র চিকিৎসার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রেও এর অবদান অপরিসীম। চন্দ্রলোকে ঐতিহাসিক বিজয়যাত্রার পর অ্যাপোলো -8-এর মহাকাশচারীরা পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, তাঁদের মহাকাশযানটি 20 হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট (11 হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) তাপমাত্রা থেকে রক্ষা পেল একটি তাপরোধকারী বর্মের সাহায্যে। এই বর্মটি ফেনোলিকপূর্ণ মৌচাক-আকৃতির একটি বস্তুর দ্বারা আবৃত।

অন্তহীন গভীর সাগরেও প্লাষ্টিকের রাজত্ব। গভীর সমুদ্রে জলমগ্ন জাহাজের উদ্ধারকারী জল-যানের বহির্ভাগের কাঠামো তৈরী হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের প্লাষ্টিকের সাহায্যে।

স্থলে প্রচলিত হয়েছে প্লাষ্টিকের তৈরী গাড়ীর কাঠামো। 1969 সালে ওল্ডসমোবিল টরোণ্টো গাড়ী বেরোয়। এর প্রথম ক্রোমপ্লেটেড গ্রিল পলিপ্রোপাইলিন দিয়ে তৈরী। 1969 সালের অন্য আর একটি গাড়ী হচ্ছে পনটিয়াক ফায়ার্ড। এর সম্মুখ ভাগ আর কেন্দ্রের বাম্পার প্লাষ্টিকের। 'মর্ডার্ণ প্লাষ্টিক' নামক সাময়িক পত্রে বলা হয়েছে যে, এবারে গাড়ীর ছাদ আর দরজা হবে প্লাষ্টিকের।

বিমানের খোল তৈরীর জন্যেও এখন প্লাষ্টিক ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে বিমান যেমন মজবুত হয়, ওজনেও তেমনি হয় হাল্কা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বোইং-737 জেট বিমানের অগ্রভাগ, আড়াআড়ি ডানাগুলি, পিছনের দিক প্রভৃতি নানা অংশ এখন প্লাষ্টিকের তৈরী হচ্ছে। অদূর

ভবিষ্যতে পুরাপুরি প্লাষ্টিকের বিমান দেখতে পাওয়া যাবে।

নির্মাণের কাজে প্লাষ্টিকের উপযোগিতা ক্রমবিকাশের পথে চলেছে। তাছাড়া অসংখ্য ব্যাপারে একে কাজে লাগানো যায়। এতে মনে হয়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের জীবনযাত্রা ও কাজকর্মের ধারায় প্লাষ্টিক এক যুগান্তর নিয়ে আসবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র প্লাষ্টিকের এক-চতুর্থাংশ এর মধ্যেই নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্লাষ্টিক শিল্পসমিতির কার্যকরী সহ-সভাপতি আর. এল. হার্ডিং বলেন, আগামী 10 থেকে 15 বছরের মধ্যে নির্মাণের কাজে প্লাষ্টিকের ব্যবহার চারগুণ বেড়ে যাবে। এই সম্ভাবনা এখনই যে বাস্তব রূপ নিয়েছে তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মেক্সিকো উপসাগরের উকাটান পেনিনসুলার উপকূলবর্তী ইস্‌লামুজাসে 1968 সালের অগাস্ট মাসে সর্বপ্রথম 3-শ' প্লাষ্টিকের কুটীর নির্মিত হয়েছে।

স্নানের ঘরে প্লাষ্টিকের প্রবেশ সুরু হয় কয়েক বছর আগেই। আর এখন পুরা বাসগৃহই প্লাষ্টিক দখল করে বসেছে। প্লাষ্টিকের তৈরী এমন সব বাড়ী পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলির দেয়াল, মেঝে আর ছাদ একটি মাত্র চাদরে তৈরী। কোথাও কোন জোড় লাগানো নেই। গৃহ-সমস্যার সমাধান আর স্থানান্তরযোগ্য বাড়ীর জন্যে এই সব ব্যবস্থা। একটি প্লাষ্টিক কোম্পানী একই চাদরে গড়া স্নানঘরের মেঝে আর প্রসাধন ঘরের আশ্বাস দিয়েছে।

রান্নাঘরের প্লাষ্টিকের তৈরী সব সাজসরঞ্জাম শীঘ্রই দেখা যাবে। রেফ্রিজারেটরে অন্তরক হিসাবে প্লাষ্টিকের ব্যবহার ইতিপূর্বেই সুরু হয়ে গেছে। রেফ্রিজারেটরে ভিতরের দেয়াল ও দরজাও প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরী হচ্ছে। আসবাব-পত্র নির্মাণেও প্লাষ্টিক ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে কোচের অংশ বিশেষ, চেয়ারের পায়ার ওজন 12 পাউণ্ড 65 কিলো 40 গ্র্যাম হবে। আর এগুলি আড়াই টন ভার বহন করতে পারবে। কাঠের মতই প্লাষ্টিকেরও সুন্দর আসবাবপত্র তৈরী হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত আমরা কত কাজে যে প্লাষ্টিক ব্যবহার করবো তার কোন লেখাজোখা নেই। দিন দিনই নানা নতুন নতুন ধারণা নানা জনের মাথা থেকে বেরুচ্ছে। 1968-69 সালে নিউইয়র্ক শহরে যে প্লাষ্টিকের প্রদর্শনী হয়েছে, তাতে এসব অনেক কিছু দেখানো হয়েছিল। বাতাস দিয়ে ফোলানো যায় এরকম চেয়ার-টেবিল, পরীক্ষামূলক ফোমের বাড়ী পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি নানা জিনিষ ঐ প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল।

প্লাষ্টিকের ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্বন্ধে অনেক আশাব্যঞ্জক কথা বলা হয়েছে। এই শিল্পের মুখপাত্রেরা বলেছেন মানব-সভ্যতা প্লাষ্টিক যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। আগামী দিনের পূর্বাভাসে বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন—প্রস্তর, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের মত প্লাষ্টিক যুগও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

বেদনা-নাশক

প্রীতিসাধন বসু*

বহুকাল পূর্বেই মানুষ আফিমের বিভিন্ন গুণের কথা জানতো। মিশর এবং ব্যাবিলনের তৎকালীন রচনায় বহু জায়গায় আফিমের বেদনা নাশ করবার গুণের কথার উল্লেখ আছে। হিপোক্রেটিস, ডায়োকোরিডিস, গ্যালেন প্রমুখ প্রথম যুগের চিকিৎসকগণ আফিমের গুণের কথা বলতে গিয়ে একে অলৌকিক বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, জিনিষটি সমস্ত রকম রোগ, দুঃখ এবং বেদনা দূর করতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসাবিদ্ টমাস সীডেনহাম লিখেছেন, সব রকম রোগ দূর করতে আফিমের মত এমন কার্যকর এবং ব্যাপক ওষুধ আর নেই। বর্তমান যুগে অবশ্য একে 'সর্বরোগের শান্তি' বলে মনে করা হয় না, কিন্তু আফিমের কার্যকারিতা যার জন্যে, সেই মরফিন এখন ডাক্তারেরা সাধারণতঃ অসহ্য ব্যথা-বেদনা দূর করতে প্রয়োগ করে থাকেন।

অবশ্য আফিমের কুফলগুলির কথাও বহু দিন থেকেই জানা ছিল। অভ্যস্ত হয়ে পড়া (Addiction) হচ্ছে এর মধ্যে সর্বপ্রথম। বেশ কিছু দিন ধরে আফিং খাওয়া চালিয়ে গেলে শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে এর উপর একটা নির্ভরতা জন্মায়, ফলে আফিং খাওয়া বন্ধ করে দিলে অত্যন্ত বিরক্তিকর, এমন কি অত্যন্ত বিপজ্জনক সব লক্ষণ (Symptom) দেখা দেয়। এছাড়া আফিং শ্বাসকার্যকে দমিয়ে দেয়। তাই এমন একটা ওষুধ সব সময়েই খোঁজা হয়েছে, যা মরফিনের মত বেদনা দূর করতে পারে অথচ তার ঐ ধরণের কোন কুফল নেই।

Papaveraceae পরিবারের গাছ Papaver somniforum-এর কাঁচা ফলগুলিকে উপর থেকে একটু চেঁচে দিলে তাথেকে যে রস বের হয়, সেটাকে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর সেই শুকনো রসকে চাপ দিয়ে ডেলা পাকালেই হলো আফিং। বাজারের আফিমের মধ্যে কম করে কুড়ি রকমের উপক্ষার (Alkaloid) থাকে। আফিমের মধ্যে শতকরা দশ ভাগ হচ্ছে মরফিন (একটি উপক্ষার)।

আফিম খাওয়ার শারীরিক প্রতিক্রিয়ার জন্যে মরফিনই দায়ী। 1805 সালে জার্মেনীর এক ওষুধপ্রস্তুতকারীর সহকারী Friedrich Sertürner সর্বপ্রথম আফিম থেকে মরফিন পৃথক করেন। এথেকেই বর্তমান উপক্ষার রসায়নবিদ্যার সুরু—যার ফলে বহু উপক্ষার ওষুধের আবিষ্কার হয়েছে। যেমন, উপক্ষার রিসার্পিন উত্তেজনা ও রক্তের চাপ কমাবার এমনি একটি ওষুধ, যা Rouwolfia serpentina (ভারতীয় সর্পগন্ধা) গাছ থেকে পাওয়া যায়।

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জন. এম. গাল্যাণ্ড এবং রবার্ট রবিনসন 1925 সালে সর্বপ্রথম মরফিনের রাসায়নিক গঠনের সঠিক ধারণা দেন। পরে রাসায়নিক গঠনে মরফিনের সঙ্গে মিল আছে, এমন অনেকগুলি পদার্থ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কোডিন (আফিমে পাওয়া যায়, হেরোনিন, ডাইলুডিড এবং Bentley's compound শরীরের উপর মরফিনের মত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নীচু স্তরের জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে Bentley's compound মরফিনের থেকে দশ হাজার গুণ বেশী কার্যকর।

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9।

এদিক দিয়ে খুবই আশাপ্রদ হলেও এটা মরফিনের মত শ্বাসকার্য কমিয়ে দেয় এবং এতেও অত্যন্ত 'অভ্যাস-দোষ' দেখা যায়। বিভিন্ন রকমের বেদনা-নাশক ওষুধের রাসায়নিক গঠন পরীক্ষা করে একটা ধারণা করা গেছে যে, কোন পদার্থের বেদনা-নাশক গুণ থাকতে হলে তার গঠনে কি থাকা দরকার। তার ফলে অনেক নতুন নতুন বেদনা-নাশক পদার্থের সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পেথিডিন। জার্মেনীর অটো ইস্লেব (Eisleb) 1939 সালে পেথিডিন সংশ্লেষণ করেন। মরফিনের থেকে কম কার্যকরী হলেও এখন পেথিডিন শল্যচিকিৎসা এবং ধাত্রীবিদ্যায় বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এতেও যথেষ্ট 'অভ্যাস-দোষ' দেখা দেয়। পরে পেথিডিনের সঙ্গে মিল আছে এমন কম-বেশী বেদনা-নাশক অনেকগুলি ওষুধের সংশ্লেষণ করা হলেও পেথিডিনই বেশী ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

রাসায়নিক গঠনে মরফিনের সঙ্গে কম মিল আছে, এমন আর কয়েকটি সংশ্লেষিত বেদনা-নাশক দ্রব্যের মধ্যে পড়ে মেথাডোন, বেজোমরমান এবং ফেনাজোসিন। এর মধ্যে ফেনাজোসিন বেদনা নাশ করবার দিকে মরফিনের চেয়ে সাত থেকে দশগুণ বেশী কার্যকরী হলেও মরফিনের মতই আসক্তি-দোষে দুষ্ট।

বেদনা নাশ করবার ক্ষমতার সঙ্গে তার রাসায়নিক গঠনের সম্বন্ধ কত বেশী, তা খুব ভালভাবে বোঝা যায় লিভোর্ফান থেকে। এর গঠন প্রায় মরফিনের মত, কিন্তু মরফিনের চেয়ে বেশী কার্যকরী এবং এতে বেশী 'আসক্তি' দেখা দেয়। কিন্তু লিভোর্ফানের রাসায়নিক গঠনকে আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখলে যেমন উল্টো দেখা যায়, সেই রকম রাসায়নিক গঠনবিশিষ্ট (Dextrorotatory বা Right-handed form) পদার্থের কোন বেদনা-নাশক গুণ নেই বা এতে আসক্তিও দেখা দেয় না।

সংশ্লেষিত বেদনা-নাশক ওষুধের মধ্যে এখানে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হলেও এগুলি সংখ্যায় অনেক। কিন্তু এগুলির সবই গুণের দিক দিয়ে মরফিনের তুলনায় নিকৃষ্টতর হওয়ায় অসহ্য যন্ত্রণা কমাবার জন্যে ডাক্তারেরা সাধারণতঃ মরফিন দিয়ে থাকেন। আগেই বলা হয়েছে যে, বেদনা-নাশক গুণের সঙ্গে শ্বাসকার্য কমে যাওয়া এবং আসক্তি—এই দোষ দুটি এক সঙ্গে থাকে। দোষের কোন একটি কমাতে গেলে অন্যগুলিও কমে যায়। কিছু দিন আগে পর্যন্ত এদের কোনটিকে আলাদা করা যেত না।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জুলিয়াস পল দেখালেন, তিনি একটা ওষুধ আবিষ্কার করেছেন, যেটা মরফিনের এই শ্বাসকার্য দমিয়ে দেওয়াকে রোধ করতে পারে। এটা ছিল কোডিন-এর একটা বিশেষ রূপান্তর। জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেল ব্যাপারটা সত্য। কিন্তু তখন এদিকে কেউ নজর দেন নি। এর বহু বছর পর, 1942 সালে John Weijlard এবং A. E. Erickson কোডিনের মত মরফিনের সেই একই রূপান্তর ঘটিয়ে দেখলেন—সেটা মরফিনের সমস্ত শারীরিক প্রতিক্রিয়ার একটা প্রতিষেধক রূপে কাজ করে—এমন কি, মরফিন-জনিত সাংঘাতিক বিষক্রিয়ায় এটা একটা খুব ভাল প্রতিষেধক। এর নাম দেওয়া হলো নালরফিন। কিন্তু জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, নালরফিনের কোন বেদনা-নাশক গুণ নেই।

জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করে নালরফিনের কোন বেদনা-নাশক গুণ নেই দেখে সবাই খুব হতাশ হলেন। তাই আরও বারো বছর কেটে গেল। 1954 সালে Henry K. Beecher এবং Louis Lasagna ভাবলেন, মরফিন এবং নালরফিন এক সঙ্গে মানুষের উপর প্রয়োগ করলে হয়তো দুটির ফলই এক সঙ্গে পাওয়া যাবে। ম্যাসাচুসেট্‌ জেনারেল হাসপাতালে দু-দল রোগীর

মধ্যে একদলকে শুধু নালরফিন এবং অন্যদের মরফিন এবং নালরফিন এক সঙ্গে দেওয়া হলো। অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে দেখা গেল যে, দু-দল রোগীর উপরে একই রকম কাজ হচ্ছে। মানুষের উপর নালরফিনের অন্যান্য গুণের সঙ্গে বেদনা-নাশক গুণটিও রয়েছে। এরপর আরও অনেকে এর সত্যতা পরীক্ষা করে দেখেন। আরও দেখা গেল যে, নালরফিনে কোন আসক্তি-দোষ দেখা দেয় না।

এই প্রথম বেদনা-নাশক থেকে আসক্তিদোষকে পৃথক করা গেল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, নালরফিনের বেদনানাশ করবার মত পরিমাণ থেকে দিবাস্বপ্ন দেখবার মত (Hallucination) ভাব হয়। এই কারণে এই আবিষ্কার বিশেষ কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলো না।

1958 সালে ডক্টর সিডনী আর্চার এবং তাঁর সহকর্মীরা Benzomorphan জাতীয় পদার্থ-গুলির মধ্যে মরফিনের প্রতিষেধক ও আসক্তি দোষমুক্ত কোন বেদনা-নাশক ওষুধ খুঁজতে সুরু করেন এবং Cyclazocine এবং আরও অনেক-গুলি ওষুধের খোঁজ পান। 1959 সালের জানুয়ারী নাগাদ ডক্টর মার্শাল গেট্স্ এবং তাঁর সহকর্মীরা ঐ একই রকমের পদার্থের খোঁজ সুরু করেন। তাঁরা অবশ্য মরফিনের কোন রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন ঘটিয়ে কিছু করা সম্ভব কিনা—প্রথম তাই দেখতে থাকেন। এইভাবে তাঁরা বেশ কয়েকটি ওষুধের সৃষ্টি করেন, যেগুলি অতিমাত্রায় মরফিন এবং পেথিডিনের প্রতিক্রিয়া বিরোধী এর মধ্যে সাইক্লোরফ্যান মরফিনের প্রতিক্রিয়া নাশকারী ক্ষমতায় নালরফিনের চেয়ে বেশী কার্যকরী। এর অন্যান্য গুণ প্রায় Cyclozocine-এর মত। উইলিয়াম আর মার্টিন পরীক্ষা করে দেখেছেন Cyclozocine-এর সামান্য আসক্তি-দোষ আছে, যেটা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে।

সাইক্লোজোসিন এবং সাইক্লোরফ্যান বেদনা-নাশক হিসাবে ওজনের দিক দিয়ে মরফিনের চেয়ে প্রায় 30 থেকে 50 গুণ বেশী কার্যকরী। অবশ্য দুটিতে দিবাস্বপ্নের মত ভাব হয়। অবশ্য এটা মরফিনের চেয়ে অনেক কম, কিন্তু তাও উপেক্ষা করবার মত নয়।

এপর্যন্ত যত বেদনা-নাশক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে Pentazocine খুবই আশাপ্রদ। এটা Benzomorphan গোষ্ঠীর পদার্থ থেকে তৈরী করা হয়েছে। যদিও মরফিনের প্রতিক্রিয়া নাশকারী ক্ষমতা Pentazocine-এর খুবই কম, কিন্তু বহু পরীক্ষিত সত্য হচ্ছে—এর কোন আসক্তি-দোষ নেই। এটি অস্ত্রোপচারের বেদনা, প্রসব-বেদনা ইত্যাদি অবিলম্বে দূর করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে Pentazocine-ই হচ্ছে সর্বপ্রথম এমন ওষুধ, যার বেদনা-নাশক ক্ষমতা আছে অথচ কোন আসক্তি-দোষ নেই। তবে এটাই এই বিষয়ে শেষ নয়। কারণ এতেও শ্বাস-কার্য দমিত হয়। আমরা আশা করবো, কিছু-দিনের মধ্যেই এমন ওষুধ আবিষ্কৃত হবে, যা অসহ্য বেদনাও দূর করবে অথচ এর আসক্তি-দোষ থাকবে না, এতে দিবাস্বপ্নের মত ভাব হবে না এবং শ্বাসকার্যের গতি কমিয়ে দেবে না।

অধ্যাপক বোস

রতনলাল ব্রহ্মচারী*

ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মাধ্যমে অধ্যাপক বোসের চরিত্রের দু-একটি দিক তুলে ধরতে চাই।

অধ্যাপক বোসের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঢাকায়। তখন স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি, একদিন গেলাম অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে। কেউ কেউ বলেছিল—অসম্ভব, দেখা না করেই ফিরে আসতে হবে। কিন্তু তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিয়ে গট্ গট্ করে চলে গেলাম অধ্যাপকের কক্ষে আ'র ঢুকেই গড় গড় করে বলে গেলাম—আগে ভেবে রাখা ইংরেজী বয়ানে—'মহাশয় আপনার সঙ্গে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই।' সঙ্গে ছিল একটি খাতা, তাতে অতি কাঁচা হাতের লেখা একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখবার অপচেষ্টা।

সেদিনের সেই হাফ-প্যান্ট-পরা কিশোর ছেলেটির চোখে যে স্বপ্নের মায়া-অঞ্জন মাখানো ছিল, বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী রূঢ় হস্তে তা মুছে দেবার চেষ্টা করেন নি। আজও মনে পড়ে ফেলে আসা সেই দূর অতীতের দিন—রমনার মাঠে এক পাখী-ডাকা সন্ধ্যায় কার্জন হলের একটি নিভৃত কক্ষ। সেখানে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী একটি অল্পবয়স্ক ছেলের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করছেন। আইনষ্টাইনের ক্রমবর্ধমান বিশ্বে যদি উনবিংশ শতাব্দীর ধারণামত ইথার-সমুদ্র বলে কিছু থাকে, তবে মাইকেলসন-মর্লি এক্সপেরিমেন্টের উপর তার কি প্রভাব, এই ধরণের জিজ্ঞাস্য ছিল ছেলেটির মনে। অনেক জিনিষ সে তখনো বুঝে উঠতে পারে নি, কিন্তু বিজ্ঞানী পরম স্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন—'আমি তোমার ভুল ধরবার চেষ্টা করছি না, তোমার বক্তব্য বোঝবার চেষ্টা করছি'

এর পর আবার অল্প সময়ের জন্যে আর একবার দেখা হয়, কিন্তু তার পরেই বোধ হয় অধ্যাপক বোস ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। অনেক দিন পর আবার ঢুকে গেলাম খয়রা লেবোরেটরীতে, কলকাতায়, আবার সঙ্গে কিছু কাগজ এবং তাতে একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখবার চেষ্টা—আর একটু কম কাঁচা হাতের চেষ্টা এবং Pinl নামক এক জার্মান বিজ্ঞানীর একটি পরিচয়-পত্র। আরও কিছু-দিন বাদে খয়রা লেবোরেটরীতে একটি গবেষণা-বৃত্তি পেলাম, কিন্তু তার আগেই অধ্যাপক বোস জেনেছিলেন আমার আর্থিক অনটনের কথা। একদিন একটা জার্মান বই দিয়ে বললেন, এটা অনুবাদ করতে লেগে যা, আমি না হয় গিরিজাকে বলে ছাপিয়ে কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিই। সেই বই ছাপা হয় নি, কিন্তু অনুবাদ করতে গিয়ে জার্মান ভাষার উপর আমার দখল বেড়ে গেল আর অধ্যাপক বোস ব্যক্তিগত ভাবে কিছু অর্থ সাহায্য করলেন, সেটা ছিল খুবই প্রয়োজনীয়।

সেই সময় থেকে অধ্যাপক বোস ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল কস্‌মোলজী, সেটা বোসের চেয়ে অধ্যাপক সেনের আওতায় বেশী করে আসতো। এই দুই অধ্যাপকের ছাত্রদের মধ্যে প্রচুর সহযোগিতা ছিল। অধ্যাপক বোসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ততটা ছিল না—শিক্ষক-ছাত্রের যতটা ছিল আশ্রয়দাতা পিতা আর পুত্রের মত।

এর পর বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী জর্ডানের

* ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা

কাছে একটি গবেষণা-বৃত্তি লাভ করি। তখন আশা ছিল আইনষ্টাইন আসবেন সুইজারল্যাণ্ডে—বহু দিন পরে ইউরোপে—এক বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিতে। কিন্তু আইনষ্টাইনকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি, আমার প্রথম বিদেশ যাত্রার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। অধ্যাপক বোস এবং জর্ডান সেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন—যতদূর মনে পড়ে।

যাহোক জার্মেনী যাবার সময় অধ্যাপক বোস আবার আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সাহায্য করেন। অধ্যাপক খাস্তগীরের কাছে শুনেছিলাম, ঢাকা থেকে বিদায় নেবার সময় বোসের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমেছিল। এর একটা কারণ তাঁর অকাতরে অর্থদান।

মনে পড়ে একবার অধ্যাপক বোসকে বলেছিলাম, এত প্রতিকূল অবস্থায় গবেষণা আমি আর হয়তো করতে পারবো না, আমি বরং অধ্যাপক সাহার ওখানে একটা অনুবাদকের কাজ নিয়ে নিই (এবং অল্প সময়ের জন্যে নিয়েও ছিলাম।) অধ্যাপক বোস বলেছিলেন—আরে, স্রোতের প্রতিকূলেই তো সাঁতরাতে হবে। আজ আরও দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর, বিজ্ঞানের অন্য একটি ক্ষেত্রে গবেষণা করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, ক্রমাগত স্রোতের প্রতিকূলেই এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছি এবং আগের তুলনায় অনেকটা এগিয়েছিও বটে। এটা সম্ভব হয়েছে অধ্যাপক মহলানবীশের কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে। অধ্যাপক মহলানবীশের সঙ্গে আমার যোগাযোগটাও করিয়ে দিয়েছিলেন অধ্যাপক বোসই।

বোস, সাহা, মহলানবীশ—এই তিনজনের উদ্দেশেই প্রণতি জানাই, আর বাঁচিয়ে রাখতে চাই তাঁদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের দেদীপ্যমান প্রদীপশিখা, স্মরণ করি আইনষ্টাইনের বাণী—Heiliges Neugier—diese delikate pflänze, die bedarf, neben Anregung, hauptsächlich der Freiheit—মানবমনের কৌতূহল, একটি পবিত্র, পেলব তরু, যাকে বাঁচাতে হলে চাই স্বাধীনতা, বিজ্ঞানীর স্বাধীনতা।

বিটা-ক্ষয় ও ডান দিক, বাঁ-দিক

শ্রীতাপসকুমার চক্রবর্তী*

যদি বলা হয় 1957 সালে কলম্বিয়ার অধ্যাপক Tsung Dao Lee এবং প্রিন্সটনের Chen Ning Yang-কে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেবার কারণ—তাঁরা ডান দিক ও বাঁ-দিকের মধ্যে পার্থক্য প্রমাণ করেছিলেন; তাহলে কথাটা অবিশ্বাস্যই মনে হবে। ডান দিক ও বাঁ-দিক সম্বন্ধে ছোটবেলা থেকেই আমাদের একটা ধারণা জন্মে যায়, কিন্তু এই ডান দিক ও বাঁ-দিকের মধ্যে সত্যই কোন তফাৎ আছে কি? 1956 সালে অধ্যাপক Lee এবং Yang-এর এই আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত তাবৎ বৈজ্ঞানিকদের কাছে একটাই উত্তর ছিলো—না।

ব্যাপারটা বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে প্রতিসমতা (Symmetry) কাকে বলে। আমরা কোন ছবি বা কোনো প্যাটার্নকে তখনই প্রতিসম বলি, যদি সেই ছবি বা প্যাটার্নটির ডান দিক অবিকল বাঁ-দিকের মত দেখতে হয়। আবার কোন একটি বস্তুকে যে-দিক থেকে বা যেভাবেই দেখি না কেন, যদি সেটিকে একই রকম দেখা যায়, তবে বস্তুটিকে প্রতিসম বলা হয়। প্রকৃতিতে সব কিছুতেই আমরা অল্প-বিস্তর প্রতিসমতা লক্ষ্য করে থাকি। গোলকই সম্ভবতঃ প্রতিসমতার সহজতম নিদর্শন। প্রকৃতিতে তাই গোলাকৃতি বস্তুর আধিক্য দেখা যায়। ভোরবেলার শিশিরকণা থেকে সুরু করে, আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি গোলাকৃতি। ফুল, ফল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও গোলাকৃতির প্রাধান্য দেখা যায়। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন কেলাসেও (Crystal) বহু রকম প্রতিসমতা লক্ষ্য করা যায়। এই সব প্রতিসমতা থেকে কঠিন বস্তুর গঠন-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য ফুল, ফল, গাছপালা ইত্যাদিতে যে প্রতিসমতা দেখা যায়, তা কেলাসের আকৃতিতে দৃষ্ট প্রতিসমতার মত ততটা সূক্ষ্ম নয়। আবার জীবজন্তুর দেহের বৈশিষ্ট্য হলো তাদের দ্বি-পার্শ্বিক প্রতিসমতা (Bilateral symmetry)। এখন ধরা যাক একটি মেয়ে একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আয়নায় আমরা মেয়েটির একটি নিখুঁৎ ছবি দেখতে পাব। এখন আয়নার মেয়েটির সঙ্গে আসল মেয়েটির কোন তফাৎ ধরা যাবে কি? যদি মেয়েটি হাসলে তার বাম গালে টোল পড়ে, আয়নার মেয়েটির ডান গালে টোল পড়তে দেখা যাবে। অতএব আয়নার মেয়েটির সঙ্গে আসল মেয়েটির পার্থক্য ধরা সম্ভব। উপরের ধারণা অনুযায়ী মেয়েটিকে তাই প্রতিসম বলা চলে না। মেয়েটি যদি প্রতিসম হতো, তবে তার ডান গালেই টোল পড়ুক অথবা বাম গালেই টোল পড়ুক কিম্বা আদৌ টোল না পড়লেও তার সঙ্গে আয়নার মেয়েটির কোন তফাৎ থাকতো না। প্রতিসমতাকে আমরা সাধারণতঃ এভাবেই বর্ণনা করি।

পদার্থ-বিজ্ঞানে কিন্তু প্রতিসমতাকে অন্যভাবে ভাবা হয়েছে। সেখানে এর অর্থ আরও ব্যাপক। আমরা জানি, আয়নার কাজ হলো আমাদের ডান দিককে বাঁ-দিক ও বাঁ-দিককে ডান দিকে রূপান্তরিত করা। আমার যেটা ডান হাত, আয়নায় সেটা বাঁ-হাতে পরিণত হয়েছে।

* পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম

আমার ডান হাতটা বাস্তব ও আয়নায় বাঁ হাতটা আমার ডান হাতেরই প্রতিবিম্ব। পদার্থ-বিজ্ঞানের মতে, আয়নায় একটি বস্তুর প্রতিবিম্বের কোন প্রতিরূপ (Counterpart) যদি বাস্তবে সম্ভব হয়, তবে বস্তুটি ও তার প্রতিবিম্বে প্রতিসমতা থাকে। আমার ঘড়ি-পরা বাঁ-হাত আয়নায় ঘড়ি-পরা ডান হাতে পরিণত হয়েছে এবং ডান হাতে ঘড়ি পরাও সম্ভব; অতএব আমার বাঁ-হাত ও আয়নায় তার প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ডান হাতের মধ্যে, পদার্থ-বিজ্ঞানের মতে প্রতিসমতা রয়েছে; অর্থাৎ আরও ব্যাপক অর্থে বলা চলে, আয়নার এধারে ও ওধারে যা দেখা যায়, দুয়েরই কোন প্রতিরূপ যদি বাস্তবে সম্ভব হয়, তবে আয়নার দু-ধারের দৃশ্যের মধ্যে প্রতিসমতা বজায় থাকে। এখন প্রশ্ন উঠবে, আয়নায় যা দেখা যায়, তা সবই কি বাস্তবে সম্ভব? আয়নায় আমার বাঁ-হাতের ঘড়ি ডান হাতে চলে গেছে এবং ডান হাতে ঘড়ি-পরা হামেশাই
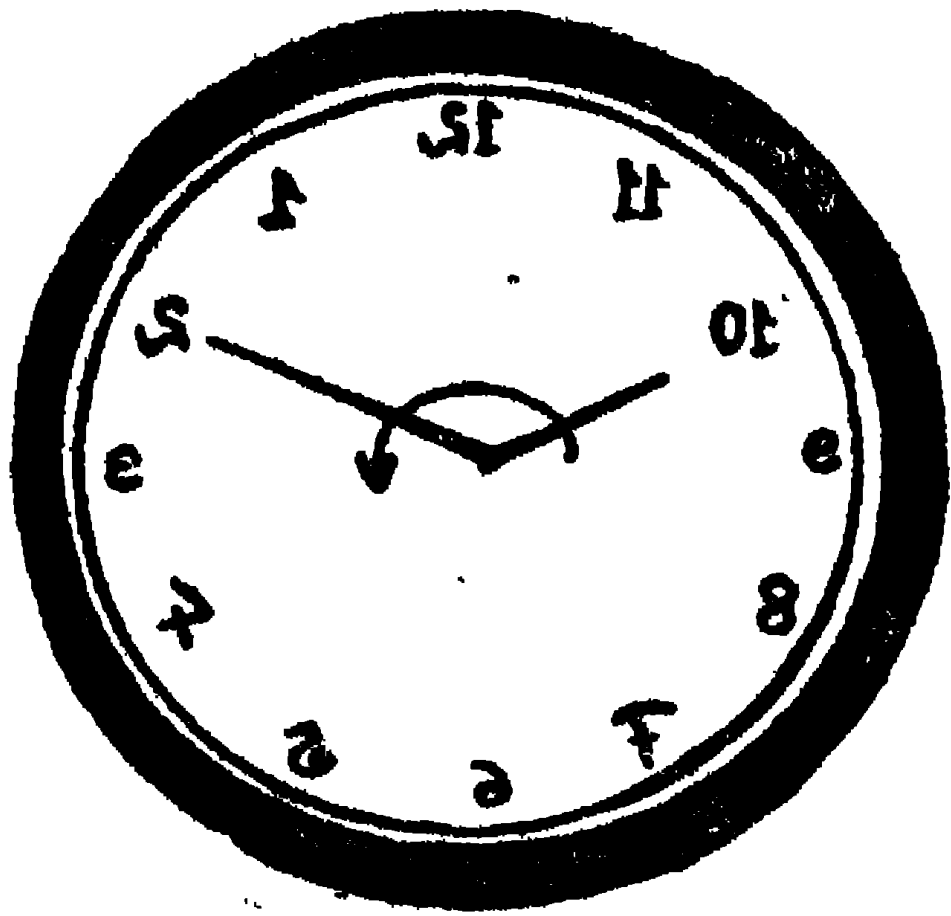
1নং চিত্র: আয়না ঘড়ি। এর কাটা দুটি ডান দিক থেকে বাঁ-দিকে ঘুরছে। সংখ্যাগুলিও উল্টাভাবে লেখা রয়েছে।

দেখা যায় সেটা ঠিক, কিন্তু আয়নায় যে ঘড়িটা দেখা যাবে সেটারও দিক বদল হয়ে যাবে অর্থাৎ ঘড়ির কাটা ডান দিক থেকে বাঁ-দিকে (Anticlock-wise) চলবে। সময় চিহ্নিত অঙ্কগুলিও উল্টাভাবে লেখা থাকবে। একটি 'আয়না ঘড়ি'-র ছবি দেওয়া হলো (1নং চিত্র)। এ-ক্ষেত্রে তো আয়নার ওধারের সঙ্গে এধারের প্রতিসমতা থাকছে না। আসল ঘড়িটি না দেখে কেউ যদি আয়নার ঘড়িটি দেখে, সে সহজেই এটাকে আসল ঘড়ির প্রতিবিম্ব বলে বুঝতে পারবে।

পদার্থ-বিজ্ঞানের মতে 'আয়না ঘড়ি' অবাস্তব নয়, অপ্রচলিত। আমাদের চিন্তাশক্তিকে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী চালাতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু 'আয়না লিখন' অসম্ভব নয়। কালই যদি ডান দিক ও বাঁ-দিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, তবে আজ পর্যন্ত লেখা সব কিছুই আমাদের কাছে উদ্ভট লাগবে। মস্ত বড় রবীন্দ্র ভক্তের কাছেও রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রতিটি পাতা 'গ্রীক' ভাষায় লেখা বলে মনে হতে পারে! অতএব আয়নায় যা দেখা গেল, সেগুলির কোনটাই অবাস্তব নয়। বস্তু ও আয়নায় তার প্রতিবিম্বের মধ্যে এই প্রতিসমতাকে পদার্থ-বিজ্ঞানে বলা হয় প্যারিটি (Parity)। প্যারিটি শক্তি বা ভরবেগের মতই নিত্য (Conserve); অর্থাৎ আয়নায় দেখা পৃথিবীর সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর কোন অমিল নেই। 1924 সালে জটিল পরমাণুর (Complex atom) গবেষণায় বিজ্ঞানী Laporte প্রথম প্যারিটির নিত্যতার সন্ধান পান। পরে 1927 সালে Wigner, Laporte-র সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, প্যারিটির নিত্যতা ডান দিক ও বাঁ-দিকের মধ্যে প্রতিসমতার প্রত্যক্ষ ফল। অতঃপর এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, কেন্দ্রীন-বিক্রিয়া (Nuclear reaction), মেসন মিথষ্ক্রিয়া (Meson interaction), বিটাক্ষয় (Beta decay), আজব পরমাণু-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে খুব সার্থকভাবেই প্রয়োগ

করা হতে লাগলো, কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এর প্রয়োগে অসুবিধা দেখা দিল, যে কথা আমরা একটু পরেই আলোচনা করবো।

এ-পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, আমাদের ডান দিক ও বাঁ-দিকের মধ্যে তফাৎ ধরবার সত্যই কোন উপায় নেই। বলা যেতে পারে, আমাদের বাঁ-দিকে হৃৎপিণ্ড ধুক্‌ধুক্‌ করছে; বাঁ-দিকের পক্ষে এটাই তো যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও কারও দেহের ডান দিকে হৃৎপিণ্ড থাকাটাও নিশ্চয়ই সম্ভব। বাঁ-দিকে হৃৎপিণ্ডের অবস্থানকে তাই একটি সার্বিক সত্য হিসাবে নেওয়া যায় না। অতএব পদার্থ-বিজ্ঞানীদের এই ধারণা হলো যে, কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, তা সাধারণ-ভাবেই করা হোক কিম্বা আয়নায় তার প্রতিবিম্বের মতই করা হোক, ফল একই পাওয়া যাবে।

পদার্থ-বিজ্ঞানের খুব কম সূত্রই বোধ হয় একাধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছে আজ পর্যন্ত। যে সংঘাত, দ্বন্দ্বমূলক মতবাদের মধ্যে দিয়ে পদার্থ-বিজ্ঞান, আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান এগুচ্ছে, সে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। এককালের একচেটিয়া নিউটনের কণাবাদ (আলোক-বিজ্ঞানে) যে তরঙ্গবাদের ঢেউয়ে হারিয়ে গেল, সেই তরঙ্গবাদকেও অনেক ক্ষেত্রেই জায়গা ছেড়ে দিতে হলো Max Planck-এর কোটন তত্ত্বকে। এক-কালের প্রচলিত ধারণা 'ঈথার'-কে ছিন্নভিন্ন করে যে মহামতি আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার সূত্রে এক নতুন পৃথিবী দেখাতে চাইলেন, সেই আইনস্টাইনই তাঁর বাকী জীবনটা এর বিকল্প খুঁজেই কাটিয়ে দিলেন।* প্যারিটির নিত্যতা সম্বন্ধেও তাই একদিন সন্দেহ উপস্থিত হলো। আমেরিকার Brookhaven-এ Cosmotron ও Barkeley-তে Bevatron নামক কণাত্বরণ-যন্ত্র দুটিতে সৃষ্ট কতকগুলি মৌলিক কণা বিজ্ঞানীদের রীতিমত ধাঁধায় ফেলে দিল। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিলেন 'টাউ-থিটার হেঁয়ালী' (Tautheta puzzle)। উপরিউক্ত যন্ত্র দুটিতে কিছু K^+-কণার সৃষ্টি হলো, যার কিছু K^+-কণা বিয়োজিত হয়ে তিনটি π^+ কণায় পরিণত হয়,

$$K^+ \rightarrow \pi^+ + \pi^+ + \pi^-$$

এদের বলা হলো τ-mesons। আবার কিছু K^+-কণার বিয়োজনে মাত্র দুটি π^- মেসনের সৃষ্টি হলো:

$$K^+ \rightarrow \pi^+ + \pi^\circ$$

এদের বলা হলো θ-মেসন। পরীক্ষায় দেখা গেল, τ ও θ মেসনের ভর সমান। কণা দুটি একই সময়সীমার মধ্যে বিয়োজিত হয়। এ রকম আরও কিছু পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল যে, τ ও θ-মেসন একই কণা। একই K^+-মেসনের এই অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার বিজ্ঞানীরা কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণে দেখা গেল, শেষ পর্যায়ে τ ও θ কণার প্যারিটি (Parity) বিপরীত। একই কণার বিয়োজিত অবস্থায় কখনও যুগ্ম প্যারিটি আবার কখনও বিষম প্যারিটি কেন হবে? তবে কি বিয়োজন পদ্ধতিতে প্যারিটি নিত্য নয়? সেই ছোট্ট একটা হেঁয়ালী এক বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে বিজ্ঞানীদের মনে ঘুরতে লাগলো। কিন্তু তখন প্যারিটির নিত্যতা পদার্থ-বিজ্ঞানের আসরে যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে,

* সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে ভারতীয় বিজ্ঞানী ই. সি. জি. সুদর্শন ট্যাকিয়ন (Tachyon) নামে যে কণাটির কথা বলেছেন, সেটা আইনস্টাইনের অনতিক্রম্য আলোর গতির ধারণাকে পাল্টে দেবার আশা রাখে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আগষ্ট, 1973)। আবার 1972 সালের 29শে অক্টোবর Pasadena নামক স্থানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এক সভায় এমন একটি গ্যালাক্সির সম্ভাব্য অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, যার গতি আলোর গতির চেয়েও বেশী (Physics News, Vol. 3, No. 4. P.P. 183)।

তাকে নাকচ করতে হলে সাহসের দরকার রীতিমত। অবশেষে 1956 সালে দু-জন চীনা বৈজ্ঞানিক, যাঁদের কথা আমরা সূচনাতেই বলেছি, তাঁরা সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। অধ্যাপক দু-জন প্যারিটির নিত্যতা সম্বন্ধে যাবতীয় পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান যাচাই করতে সুরু করলেন।

আমরা আগে এক জায়গায় বলেছি, পদার্থ-বিজ্ঞানের কোন কোন ক্ষেত্রে প্যারিটির নিত্যতার প্রয়োগ অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃতিতে আমরা চার রকমের মূল বল বা মিথষ্ক্রিয়ার (Interaction) কথা জানি। নীচে তাদের একটি তালিকা দেওয়া হলো (তালিকা-1)

1নং তালিকা

	শ্রেণী (Class)	শক্তি (Strength)
1.	কেন্দ্রীন বল—যা প্রোটন ও নিউট্রনকে পরমাণু কেন্দ্রে আবদ্ধ রাখে	1
2.	তড়িচ্চুম্বকীয় বল—যা পরমাণুগুলিকে একত্রিত করে অণু সৃষ্টি করে	10^{-2}
3.	দুর্বল মিথষ্ক্রিয়া, তেজষ্ক্রিয়তার যার উদ্ভব হয়	10^{-13}
4.	মহাকর্ষীয় বল	10^{-38}

অধ্যাপক Lee ও Yang লক্ষ্য করলেন, একমাত্র দুর্বল মিথষ্ক্রিয়া বাদে উপরিউক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই প্যারিটির নিত্যতা সফলভাবে প্রযোজ্য। দুর্বল মিথষ্ক্রিয়ার পরীক্ষালব্ধ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে প্রচুর, কিন্তু তার মধ্যে উপরিউক্ত প্রশ্নটির কোন সমাধান পাওয়া যায় না; অর্থাৎ কোন বিজ্ঞানীই নিউক্লিয়াসের বা মৌলিক কণার তেজষ্ক্রিয়তাজনিত ক্ষয়ের ক্ষেত্রে প্যারিটির নিত্যতা যাচাই করে দেখেন নি। এই দুর্বল মিথষ্ক্রিয়ার দরুণই মৌলিক কণাগুলি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিটা-ক্ষয় (Beta decay), মিউওন-ক্ষয় (Muon decay), পাইওন-ক্ষয় (Pion decay) ইত্যাদি দুর্বল মিথষ্ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর Lee ও Yang দুর্বল মিথষ্ক্রিয়ার বিস্তারিত বিশ্লেষণের শেষে দৃঢ়তার সঙ্গে রায় দিলেন যে, দুর্বল মিথষ্ক্রিয়ায় প্যারিটি অনিত্য।

কোন তেজষ্ক্রিয় পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনের (বা পজিট্রনের) নির্গমনকেই বিটা-ক্ষয় (β decay) বলা হয়। এটা অনেকটা পরমাণু থেকে 'ফোটন' বা শক্তি-কণার নির্গমনের মতই। পরমাণুর মধ্যে কোন ফোটন নেই; কোন পরমাণুর একটি শক্তিস্তর থেকে অপর একটি শক্তিস্তরে উত্তরণে ফোটনের সৃষ্টি হয়। ঠিক তেমনি, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কোন ইলেকট্রন নেই; বিটা-ক্ষয় পদ্ধতিতে ইলেকট্রন সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিতে আরও একটি কণার সৃষ্টি হয়, যার নাম নিউট্রিনো। বিটা-ক্ষয় পদ্ধতিতে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের একটি নিউট্রনের (n), একটি প্রোটন (P), একটি ইলেকট্রন (e^-) ও একটি অ্যান্টি-নিউট্রিনোয় ($\bar{\nu}$) রূপান্তর ঘটে; অর্থাৎ

$$n \rightarrow P + e^- + \bar{\nu}$$

এই পদ্ধতিটি অন্যভাবেও হয়। এক্ষেত্রে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের একটি প্রোটন (P), নিউট্রন (n), পজিট্রন (e^+) ও নিউট্রিনোয় (ν) রূপান্তরিত হয়,

$$P \rightarrow n + e^+ + \nu$$

1933 সালে এই বিটা-ক্ষয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে W. Pauli যখন 'নিউট্রিনো' কণাটির অস্তিত্ব ঘোষণা করেন, তখন Niels Bohr মন্তব্য করেছিলেন, 'বিটা-ক্ষয় তত্ত্বে আমাদের আরও আশ্চর্য কিছুর জন্যে তৈরী থাকতে হবে।' Lee এবং Yang-এর তত্ত্বে সে কথাটাই অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে সত্য হয়ে গেল।

1957 সালে Madam Chien-Shiung Wu, ইনিও একজন চীনা বৈজ্ঞানিক ও তাঁর সহকর্মীরা (Ambler, Hayward, Hoppes এবং Hudsen) আমেরিকার National Bureau of

Standards-এ প্যারিটির অনিত্যতার পরীক্ষা করেন। তাঁরা Cobalt-60 নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত β কণার অপ্রতিসমতা নির্ণয় করেন। তাঁদের পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, Co^{60} নিউক্লিয়াসগুলিকে একই অক্ষরেখায় স্পিন (Spin) করানো ও লক্ষ্য করা β কণাগুলি অক্ষরেখার দু-দিকেই সমান সংখ্যায় নির্গত হয় কিনা। তাপীয় বিশৃঙ্খল গতি যাতে নিউক্লিয়াসগুলির সুশৃঙ্খল বিন্যাসে বাধা না দেয়, সেজন্যে কেলাসটিকে অত্যন্ত কম তাপ-মাত্রায় (পরম শূন্য —273.17°C থেকে মাত্র 0.01°C উপরে) শীতল করা হলো। পরীক্ষায় β কণার পরীক্ষায় দেখা গেছে, নিউট্রিনোর স্পিন একটি বামাবর্তী স্ক্রু (Left handed screw) মত। একে অন্যভাবে বলা হয়, নিউট্রিনোর হেলিসিটি (Helicity) ঋণাত্মক। আবার অ্যান্টি-নিউট্রিনোর হেলিসিটি (Heliciy) ধনাত্মক, অর্থাৎ এই কণাগুলি একটি দক্ষিণাবর্তী স্ক্রু (Right handed screw) মত অগ্রসর হয়। এখন আয়নায় এই $\mu^+ - \pi^+ - \nu$ বিক্রিয়ার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করলে দেখা যাবে (2নং চিত্র), সেখানে নিউট্রিনোর হেলিসিটি ধনাত্মক হিসাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু হেলিসিটি অ্যান্টি-নিউট্রিনোর
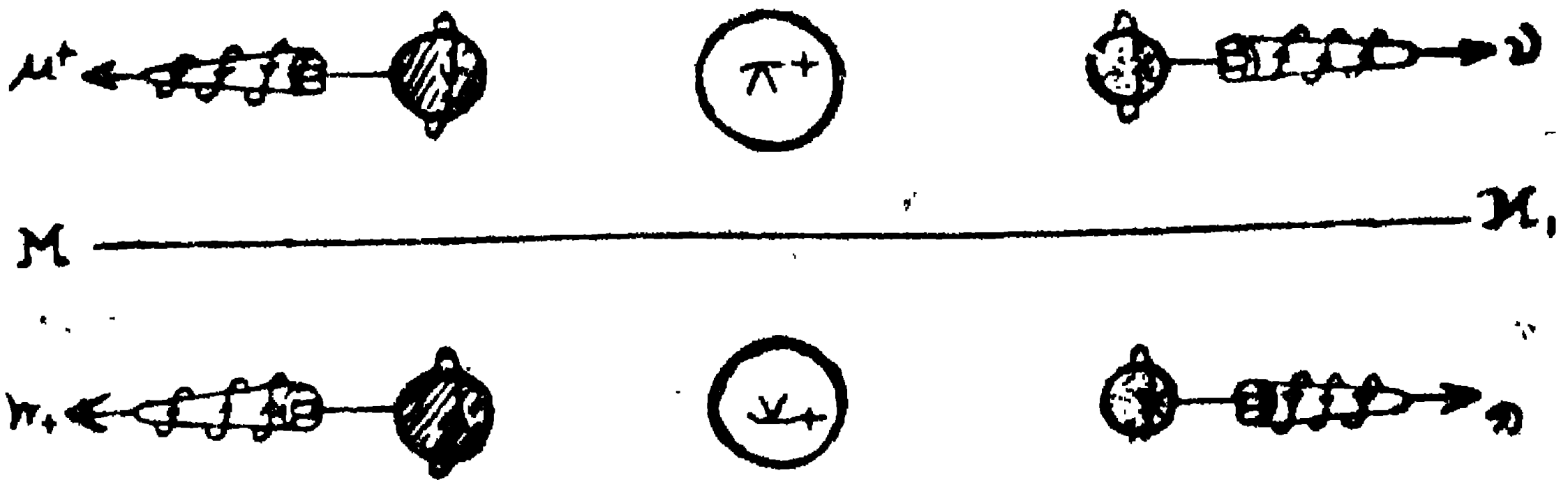
2নং চিত্র: এখানে দৃশ্য ও আয়নায় তার প্রতিবিম্বে অপ্রতিসমতা দেখানো হয়েছে। নিউট্রিনোর হেলিসিটি ঋণাত্মক, যা আয়নায় ধনাত্মক হিসাবে দেখা যাচ্ছে।

দেখা গেল, নিউক্লির স্পিন-এর বিপরীত দিকেই বিটা-কণার নির্গমন বেশী হয়। অতএব Madam Wu ও তাঁর সহকর্মীরা জানালেন যে, বিটা-কণার নির্গমনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে Co^{60} নিউক্লিয়াসের স্পিন (Spin) বামাবর্তী এবং বাঁ-দিককে ডান দিক থেকে পৃথক করা সম্ভব।

উপরিউক্ত পরীক্ষার ফলাফলের তাৎপর্য একটু অন্যভাবে বোঝানো যেতে পারে। 2নং চিত্রে একটি π^+-মেসনকে একটি μ^+ ও একটি নিউট্রিনো (ν) কণায় পরিণত হতে দেখা যাচ্ছে। কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার দরুণ μ^+ ও ν কণা-দুটির স্পিন ভিন্নমুখী। নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত ক্ষেত্রে ধনাত্মক এবং নিউট্রিনো, অ্যান্টি-নিউট্রিনো দুটি ভিন্ন কণা। অতএব এখানে দৃশ্য ও তার প্রতিবিম্বে কোন প্রতিসমতা নেই।

অতঃপর এই ধরণের আরও পরীক্ষা করা হয়েছে। যেমন, বিয়োজন প্রক্রিয়ায় একটি μ-কণার একটি ইলেকট্রন ও দুটি নিউট্রিনো, একটি Λ কণার প্রোটন ও π-কণায় পরিণত হওয়া, Σ-কণার বিয়োজন ইত্যাদি। প্রতিটি পরীক্ষাতেই ডান দিক ও বাঁ-দিকের সাদৃশ্য ঘুচিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই প্যারিটির অনিত্য-তার মধ্যেই টাউ-থিটার রহস্যের সমাধান লুকিয়ে ছিল।

মানুষের গায়ের রঙের তফাৎ কেন ?

সব্যসাচী লোধ

সৌন্দর্য বর্ণনায় মানুষের গায়ের রঙের বর্ণনা স্থান পেয়েছে সর্বাগ্রে। তার একমাত্র কারণ—স্থূল দৃষ্টিতে এর সাহায্যে একজন থেকে আরেক জনকে পৃথক করা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই প্রভেদের সীমা অনেকটা সীমিত হয়ে আসে। যার ফলে পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বহুদিন থেকেই মানুষের মনে কৌতূহল জেগেছে—কেন এই রঙের বিভিন্নতা হয়? মিলই বা কেন? মানুষের এই কৌতূহলের উত্তর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া গেছে, যদিও গায়ের রং সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় জানা সম্ভব হয় নি—তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, বিজ্ঞানীদের এই সাধনায় গাত্রবর্ণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত হয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধে মানুষের গায়ের রঙের উৎস—আনুষঙ্গিক জৈব রাসায়নিক তথ্য, বংশানুক্রম, পরিবেশের প্রভাব এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্নতা—এই কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গায়ের রঙের উৎস সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে হলে সর্বপ্রথম এর সঠিক পরিমাপ দরকার। আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে এটি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে স্টেপ্টোফটোমিটারের (Steptrophotometre) সাহায্যে। এই মিটারের সাহায্যে গায়ের রঙের মান এবং গায়ের রঙের জন্যে দায়ী পদার্থগুলির পরিমাণ ও বিস্তৃতি জানা গেছে।

গায়ের রঙের জন্যে পাঁচটি রঞ্জক পদার্থকে মোটামুটিভাবে দায়ী করা যেতে পারে। যেমন—মেলানিন, মেলানয়েড, ক্যারোটিন, অক্সিহিমোগ্নোবিন এবং অক্সিজেনবিহীন হিমোগ্নোবিন। দৃষ্টিগত ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিকেরা বিচ্ছুরণ (Scattering) নামে অভিহিত করেছেন। বর্তমানে মানুষের গায়ের রঙের উৎস এবং এর অবস্থান সম্বন্ধে জানতে হলে সর্বপ্রথমে ত্বকের (Skin) গঠন সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। ত্বককে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—বহিঃস্তক ও অন্তঃস্তক। এই বহিঃস্তকে রক্তের কোন সরবরাহ থাকে না এবং তার বিস্তৃতি ও গভীরতা সমান নয়। বহিঃস্তককে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়—কোরনিয়াম স্তর, মিউকোসাম স্তর, লুসিডিয়াম স্তর, গ্রানুলোসাম স্তর, জ্যারমিনাল স্তর। কোরনিয়াম স্তর হলো বহিঃস্তকের সবচেয়ে বাইরের স্তর, এই স্তর স্বচ্ছ ও আঁশযুক্ত। এর ঠিক নীচে হলো লুসিডিয়াম স্তর। এই স্তরটি ঘন কোষে সংঘবদ্ধ। এর পর দুই বা তিন সারি চ্যাপ্টা কোষের দ্বারা তৈরী গ্রানুলোসাম স্তর। চতুর্থ স্তরটির নাম মিউকোসাম স্তর। এই স্তরের কোষগুলি গোলাকার বা চ্যাপ্টা ও বহুভুজাকার। সর্বশেষ স্তর বা পঞ্চম স্তরটি হলো জ্যারমিনাল স্তর। এই স্তরটি স্তম্ভাকৃতি কোষের দ্বারা প্রস্তুত। বহিঃস্তকের এই স্তরগুলি অন্তঃস্তকের প্যাপিলা স্তরের সঙ্গে যুক্ত। এই স্তরে ছোট ছোট অসংখ্য শঙ্কু আকৃতির কোষ থাকে। কোষগুলিতে রক্ত সরবরাহের প্রাচুর্য ঘটে, যার ফলে এই অঞ্চল অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়। প্যাপিলা স্তর ব্যতীত আরেকটা স্তর পাওয়া যায়। এই স্তরকে জালিকা স্তর বা নিম্ন স্তর বলা হয়। এই স্তরটি গঠিত হয়েছে পরস্পর যুক্ত বিভিন্ন টিস্যু বা কলার দ্বারা। যে সমস্ত রঞ্জক পদার্থ গায়ের রঙের জন্যে দায়ী বা

যার উপর রং অত্যন্ত নির্ভরশীল—সেগুলির বেশীর ভাগই থাকে বহিঃত্বকের দুটি স্তরের মাঝে অর্থাৎ মিউকোসাম ও জ্যারমিনাল স্তরের কোষে। এফ্. জি. মুরের (F. G. Murray) গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, গায়ের রঙের জন্যে রঞ্জক পদার্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ মেলানিন। এরা হলো ঘন ও কাল কণিকা। অনেক ক্ষেত্রে এর রং হলদেও হতে পারে। এই কণিকাগুলি যে স্থানে ঘন ও বেশী সংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে, সে স্থান থেকে অন্তঃত্বকের লোহিতাভা বহিঃত্বকে পৌঁছুতে পারে না, যার ফলে গায়ের রং কালো মনে হয়। অপর পক্ষে এর স্বল্পতা প্রকাশ পেলে গায়ের রং সাদা দেখায়। মেলানিনের পরিমাণের উপর গায়ের রং বাদামী, হলদে, কালো ইত্যাদি হওয়া নির্ভরশীল। মানুষের দেহের সবস্থানে মেলানিনের পরিমাণ সমান হয় না বলেই গায়ের রং সকল স্থানে এক হয় না। এডওয়ার্ড ও ডাল্টনের (Edward & Dalton) গবেষণা-প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, মেলানিনের রাসায়নিক ক্ষয়প্রাপ্তির ফলে মেলানয়েডের সৃষ্টি। মেলানিনের চেয়ে মেলানয়েড ত্বককে হলুদ বর্ণ দান করে। এই মেলানয়েডের অবস্থান সাধারণতঃ বহিঃত্বকের কোরনিয়াম স্তরে হয়ে থাকে। মিউকোসাম স্তরেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ক্যারোটিন তামাটে রঙের হয়। এর উপস্থিতি লক্ষিত হয় সাধারণতঃ অন্তঃত্বক ও চর্মনিম্নস্থ চর্বির মধ্যে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা এই ক্যারোটিনে লৌহ জাতীয় পদার্থ থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মেয়েদের ত্বকে—বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের ত্বকে এই রঞ্জক পদার্থের বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটে।

অক্সিজেনযুক্ত হিমোগ্লোবিনের রং লাল হয়। যে সমস্ত স্থানে ঐরূপ পদার্থ থাকে, সেখানকার ত্বকের রং লাল্‌চে হয়। বৈজ্ঞানিকদের অনুমানানুযায়ী শরীরের যে সমস্ত স্থানে দ্রুত ধমনী-রক্তের প্রবাহ হয় সে স্থানে ত্বকের রং লাল্‌চে হয়। যেমন—হাতের চেটো, স্তনবৃন্ত, গলা, মাথা।

পক্ষান্তরে অক্সিজেনবিহীন হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতিতে ত্বকের কিয়দংশ নীলাভ হয় বা দেখা যায়। এর কারণ স্বভাবতঃই শরীরের যে সমস্ত অঞ্চলে শিরা ও উপশিরাগুলি প্রসারিত এবং রক্তপ্রবাহ যে অঞ্চলে অত্যন্ত ধীরগতিতে হয়, সে অঞ্চলে ত্বকের রং নীলাভ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে দেহকাণ্ডের নিম্নাংশ, নিতম্ব, পায়ের পাতা, গালের কিয়দংশ। আলোক-বিচ্ছুরণের ফলে ত্বকের কিছু কিছু স্থান নীলাভ হয়। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা মিউকোসামের স্তর ঘোলাটে থাকবার দরুণ মিউকোসাম অধিকৃত স্থানের কিছু ত্বক নীলাভ হয়। দাড়ি কামাবার পর মুখের যে অংশ নীলাভ দেখায় এবং শিশুর দেহের মেরুদণ্ডের বা দেহের নিম্নাংশ নীলচে দেখা যায়, তা আলোক বিচ্ছুরণ স্বরূপ হয় বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

তাহলে উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, মেলানিন এবং মেলানয়েডেই প্রকৃতপক্ষে গায়ের রঙের জন্যে দায়ী। এই দুই রঞ্জক পদার্থ বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী এবং বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে লক্ষিত হয়। কৃষ্ণবর্ণের লোকের গায়ে মেলানিনের আধিপত্য অধিক পরিমাণে বিস্তার লাভ করে, যার ফলে এই মেলানিনকে অপর রঞ্জক পদার্থগুলি থেকে পৃথক করা খুবই কঠিন।

রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা মেলানিনের গঠন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু অনুধাবন করা যেতে পারে। মেলানিন গঠিত হয় 55 শতাংশ অঙ্গার, 6 শতাংশ হাইড্রোজেন, 12 শতাংশ নাইট্রোজেন, 2 শতাংশ গন্ধক এবং অবশিষ্ট 25 শতাংশ অক্সিজেন নিয়ে।

হলম্যানের (Hallman) বিশ্লেষণে প্রকাশ

পার যে, টারোসিন অ্যামিনোসিড (Tarocin Aminocid) জারণের (Oxidation) ফলে মেলানিন তৈরী হয়। এই জারণ সাধারণতঃ কয়েকটি ধাপে ঘটে থাকে।

গায়ের রঙের ক্ষেত্রে বংশাহুক্রমের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাপারে ডাভেনপোর্টের (Davenport) গবেষণা বিজ্ঞান-জগতে এক নজীর স্থাপন করেছে। তিনি নিগ্রো ও শ্বেতকায়দের মিলনে উৎপন্ন এক সংকর জাতির উপর গবেষণা চালান, যার মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রের মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তার মতানুযায়ী গায়ের রঙের জন্যে দু-জোড়া বংশকণিকা (জিন) দায়ী। ধরা যাক এই বংশকণিকা যথাক্রমে A, a এবং B, b-এর মধ্যে A ও B গাঢ় বর্ণের জন্যে দায়ী ও a ও b হাল্কা বর্ণের জন্যে দায়ী। এদের কোনটাই একে অন্যের উপর প্রভাবশীল নয়। রঙের ঘনত্ব A ও B-এর পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ A ও B বংশকণিকা যত বৃদ্ধি পাবে, তত বেশী গাঢ় হবে গায়ের রং। তাহলে নিগ্রো (হটেনটট্)-এর জিনোটাইপ (AABB) এবং শ্বেতকায়দের (aabb-এর জিনোটাইপ) মিলনে যে প্রথম সংকর বা মিশ্র জাতের মানুষ হবে, তাদের গায়ের রং হবে (জিনোটাইপ যথাক্রমে Aa এবং Bb) পিতামাতার রঙের মধ্যবর্তী গায়ের রং। এরাই মূল্যাটো (Mulato) নামে পরিচিত দু-জন মূল্যাটোর মধ্যে বিবাহের দ্বিতীয় প্রজন্মে পাঁচ প্রকার গাত্রবর্ণের ব্যক্তির উৎপত্তি হবে। তারা যথাক্রমে কাল, ঘনবাদামী, বাদামী, হাল্কা, সাদা। এদের পারস্পরিক অনুপাত 1 : 4 : 6 : 4 : 1 ডবজ্যানস্কির (Dobzansky) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রতিফলিত হয় হটেনটট্, শ্বেতকায় ও মূল্যাটোদের উপর। ডবজ্যানস্কির এই বংশকণিকা ব্যাখ্যা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়। তাঁর মতে কোন ব্যক্তির গায়ের রঙের ঘনত্ব নির্ভর করবে সেই ব্যক্তির বংশকণিকার সংখ্যার উপর। এদের বংশ কণিকা $T_1T_2T_3$ $t_1t_2t_3$-র দ্বারা সূচিত করা যেতে পারে। তাহলে নিগ্রোদের গায়ের রঙের জিনোটাইপ হবে $T_1T_1T_2T_2T_3T_3$ এবং শ্বেতকায়দের $t_1t_1t_2t_2t_3t_3$। আবার মনে করা যেতে পারে T_1 রং যে ঘনত্বের জন্যে দায়ী, T_2 তার চেয়ে কম এবং T_3 আরো কম ঘনত্বের জন্যে দায়ী। অনুরূপভাবে t_1 যতটা রঙের জন্যে দায়ী, t_2 তার চেয়ে কম এবং t_3 আরো কম রঙের জন্যে দায়ী। এই ছয় জোড়া বংশকণিকার ভিত্তিতে 64 প্রকার সমবায় সম্ভব। এই বিন্যাসগুলির জিনোটাইপের সংখ্যা হবে সাতাশ। এই সাতাশ প্রকার থেকে সাতটি রং পাওয়া যায়। এই সব রং হলো কাল, অতি ঘনবাদামী, বাদামী, হাল্কা-বাদামী, অতি হাল্কা বাদামী, এবং সাদা ইত্যাদি। এগুলি নিগ্রো ও শ্বেতকায়দের মিলনে উদ্ভূত ব্যক্তিদের সঙ্কর রং বা মিশ্র রং। যাদের জিনোটাইপ হবে T_1t_1, T_2t_2, T_3t_3 অর্থাৎ বড় হাতের অক্ষরগুলি দায়ী হবে ঘন বর্ণের জন্যে এবং ছোট হাতের অক্ষরগুলি দায়ী থাকবে হাল্কা বর্ণের জন্যে। যদিও বর্ণের বিভিন্নতার বিশদ বিবরণী আশা করা যায়, তথাপি সাধারণভাবে ডবজ্যানস্কিকে অনুসরণ করাই শ্রেয়।

বর্তমান আলোচনায় একটা ধারণা খুব স্পষ্ট যে, শ্বেতকায় পিতামাতার কালো সন্তান সম্ভব নয়। আবার কৃষ্ণবর্ণের পিতামাতার শ্বেতকায় সন্তান অসম্ভব। কারণ কৃষ্ণবর্ণের সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে একমাত্র সেই প্রকার বংশকণিকা থাকবে, যারা ঘোর বর্ণের জন্যে দায়ী। পক্ষান্তরে শ্বেতকায় সন্তান-সন্ততি তাদের পিতামাতার কাছ থেকে লাভ করে হাল্কা বর্ণের জন্যে দায়ী বংশকণিকা। পরিবেশ গায়ের রঙের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়তা করে। এই ব্যাপারে সূর্যালোকের

সাহায্যে এডওয়ার্ড ও ডান্টলের (Edward & Dantley) গবেষণা বিজ্ঞান-জগতে আলোড়ন আনে। যারা কখনও প্রত্যক্ষ আলোর সংস্পর্শে আসে নি—এরূপ পরীক্ষণীয় ব্যক্তির মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ সূর্যালোকে রাখা হয়। এর ফলে ঐ স্থানে মেলানিনের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং এই বৃদ্ধি বেশ কিছু দিন ধরে চলে এবং পরে বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং সাড়ে নয় মাসের মধ্যে মেলানিন পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। কাজেই উন্মুক্ত সূর্যালোকের সংস্পর্শে গায়ের ঘনত্ব সাময়িক বেড়ে যায়।

ডি. টিটিভ (D. Titiv)-এর মত হচ্ছে—রক্তের প্লাজ্মা এবং রক্তকণিকার মধ্যে সূর্যরশ্মির প্রত্যক্ষ প্রভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এর ফলে মেলানিনের সৃষ্টি হয়। মেলানিনে তামাজাতীয় ধাতব পদার্থ থাকায় মেলানিনের বৃদ্ধি ঘটে। জন্মগ্রহণের পর শিশুর গায়ের রং এবং রক্তচাপে আক্রান্ত রুগীদের মুখমণ্ডলের রং যে সাময়িক লাল হয়—তা তামার জন্যে। তাছাড়া খাদ্যে তামার প্রাচুর্যের ফলে দেহের রং গাঢ় হবার সম্ভাবনা থাকে। বর্ণহীনতার ব্যাপারে লুই (Lui)-এর ভিটামিন-সি-র (Vitamin-C) অবদানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর ধারণা—ক্ষেত্রবিশেষে ভিটামিন-সি মেলানিন গঠনে বাধা দেয়। এই কারণেই অনেক ইউরোপীয় লেবুর রস পান করে ত্বকের পাংশুতা বজায় রাখবার চেষ্টা করে। অনেক গবেষকেরা এই ব্যাপারে এক মত। কিন্তু অনেক নিগ্রোদের ভিটামিন-সি অধিক পরিমাণে পান করিয়েও গায়ের রঙের পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় নি। জি. মুরির (G. Murri) মতে, গায়ের রং ব্যারোমিটারের ন্যায় ওঠানামা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ককেশীয়ানদের (Coucacian) গায়ের রং শীতকালে শ্বেতাভ হয়। কারণ আলোর অভাবে রঞ্জক পদার্থ অপহৃত হয়, যাকে রঞ্জক পদার্থের অপহরণ (De-pigmentation) বলা হয়। গ্রীষ্মকালে আলোর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসবার ফলে রঞ্জক পদার্থের বৃদ্ধি ঘটে—যাকে রঞ্জক পদার্থের পুনরাবির্ভাব (Repigmentation) নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

গায়ের রঙের পরিব্যাপ্তি প্রসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যস্থলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের গায়ের রং গাঢ় হয়। যেমন—আফ্রিকা সিংহল, ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ ভারত, আমেরিকা, (মধ্যভাগ), দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন ইত্যাদি। অপরদিকে ক্রান্তি অঞ্চলে বাইরে অর্থাৎ মেরু-অঞ্চলের অধিবাসীদের রং হাল্কা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ চীন, জাপান, সোভিয়েট রাশিয়া, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কথা বলা যায়।

যদিও বর্তমানে পরিব্যাপ্তির ব্যাপারে এই ধারণা পুরাপুরি ঠিক নয়, তার কারণ মেরু অঞ্চলে বসবাসকারী এস্কিমোদের রং ঐ অঞ্চলেরই স্থায়ী বাসিন্দা নিগ্রোদের রঙের তুলনায় স্বাভাবিক মান থেকে অনেক কম। কাজেই আলোকের স্বল্পতাই বর্ণহীনতার একমাত্র কারণ নয়।

গায়ের রঙের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের দান অপরিসীম। এই রংকেই ভিত্তি করে নৃ-বিজ্ঞানীরা মানবজাতিকে বিভাজন করেন। মানবজাতির বা মানবগোষ্ঠীর আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে গায়ের রং একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। হুটন ও মণ্টাগু মানবগোষ্ঠীর আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিশ্লেষণের সুরুতে গায়ের রংকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মহাকাশযানে অণু

এইচ আল্‌ম

[ভাবানুবাদ—সিতাংশুবিমল করঞ্জাই ও সূর্যকুমার বর্মন*]

পৃথিবীর অনেক ঘটনাকে দেখানো হয়েছে নিউটনের বলবিজ্ঞার ফলস্বরূপ হিসেবে। কিন্তু সৌরজগতে ছোট ছোট গ্রহ-উপগ্রহের আচরণও যে এই বলবিজ্ঞার ফলস্বরূপ হিসেবে দেখানো যেতে পারে, তা ইতিপূর্বে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। এই সকল গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটলে তারা ছড়িয়ে পড়ে এবং আয়তনের প্রসারণ না ঘটে বরং সংকোচন ঘটে, ফলে 'জেট-প্রবাহ' নির্গত হয়। এই নীতিতেই 'উল্কা-প্রবাহ' (Meteor streams) এবং 'গ্রহাণুপুঞ্জ-প্রবাহ' (Streams of asteroids) সৃষ্টি হয় এবং সম্ভবতঃ এই সকল প্রবাহের সমষ্টিতেই ধূমকেতুর উৎপত্তি হয়।

1) অবিচলিত গতি (Unperturbed motion)—

ধরা যাক মহাকাশযানে অসংখ্য অণু আবদ্ধ অবস্থায় আছে আর এই যানটি বৃত্তাকারে r_o ব্যাসার্ধ নিয়ে কেন্দ্রীয় ভরবিন্দু Me-এর চারদিকে ঘুরছে। যান এবং অণুগুলির ভর এত ক্ষুদ্র ধরা হলো যে, সেগুলি মধ্যে যে আকর্ষণ, তা উপেক্ষা করা যেতে পারে।

এক্ষণে, সেই কেন্দ্রীয় বস্তুর চারদিকে আবর্তিত অণুগুলির কক্ষপথ বিবেচনা করা হবে। মনে রাখতে হবে, অণুগুলি স্থায়ীভাবে যানের গায়ে লেগে থাকবে না। বস্তুগুলি কক্ষে আবদ্ধ থাকবার ফলে কক্ষের দেয়ালের সঙ্গে তাদের ধাক্কা লাগে এবং লেগে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের কক্ষীয় পর্যায়কাল যানের কক্ষীয় পর্যায়কালের সমান হয়। অতএব,

$$T_o = \frac{2\pi}{\bar{\omega}_o} = 2\pi\, \mu_e^{-\frac{1}{2}}\, r_o^{3/2} \qquad \cdots(1)$$

যখন $\bar{\omega}_o$ = কক্ষীয় কৌণিক বেগ

এবং $\mu_e = KM_e$ (K = মহাকর্ষীয় ধ্রুবক)

এখন বলা যায় প্রত্যেক অণুর কক্ষপথের r_o-এর সমান অর্ধপরাক্ষ থাকবে। অক্ষ এবং নিষ্পন্ন বিন্দুগুলিকে বিভিন্নভাবে ঘোরানো যেতে পারে। সুতরাং যান থেকে অণুগুলিকে অক্ষ এবং ব্যাসার্ধ উভয় দিকেই দুলতে দেখা যাবে।

অণুর গতিবেগ নির্ণয়ের জন্যে পরস্পর সমকোণে নত এরূপ অক্ষদ্বয়ের মূল-বিন্দু যানের ভরকেন্দ্রে স্থাপন করা হলো। এই অক্ষদ্বয়ের x-অক্ষ কেন্দ্রীয় ভরের বিপরীত দিকে এবং y-অক্ষ যানের গতির দিকে নেওয়া হলো। এক্ষণে, যদি একটি অণু x-y তল থেকে z দূরত্বে থাকে, তবে কেন্দ্রীয় বস্তুর যে আকর্ষণ $\mu_e r_o^{-2}$ তার z-অংশ ঐ অণুর উপর ক্রিয়া করে এবং এই মান

$$f_z = -\mu_e\, z\, r_o^{-3} \qquad \cdots(2)$$

আবার অণুটি যদি y-z তল থেকে x-দূরত্বে স্থাপন করা হয়, তবে এর পরম কৌণিক গতিবেগ (Absolute angular velocity) $\bar{\omega}$, $(r_o+x)^2$-এর সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক। তখন ঘূর্ণায়মান অক্ষে অণুটির আপেক্ষিক y-গতিবেগ প্রায়

$$V_y = (\bar{\omega} - \bar{\omega}_o)\, r_o = -2\bar{\omega}_o x \qquad \cdots(3)$$

---

* গণিত বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

x দিকে বল f_x, মহাকর্ষীয় বল এবং কেন্দ্রাতিগ বলের (Centrifugal force) সমষ্টি এর সমান :

$$f_x = -\mu_e r^{-2} + r\bar{\omega}^2 \quad \cdots(4)$$

যখন r কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত আলোড়িত দূরত্ব।

যেহেতু কৌণিক ভরবেগ—

$C = r^2\bar{\omega} = (\mu_e r)^2$ ধ্রুবক

অতএব, আমরা পাই

$$r\bar{\omega}^2 = c^2 r^{-3} = c^2 r_o^{-3}\left(1 - \frac{3x}{r_o}\right)$$

$$\text{এবং } \mu_e r^{-2} = c^2 r_o^{-3}\left(1 - \frac{2x}{r_o}\right)$$

$$\text{অতএব, } f_x = -\mu_e x\, r_o^{-3} \quad \cdots(5)$$

সুতরাং সমীকরণ (2) এবং (5)-এর বল দুটির ক্রিয়ায় অণুটি y-অক্ষের চতুর্দিকে সুসমঞ্জস দোলনের সৃষ্টি করবে এবং এই দোলনকাল :

$$T = 2\pi(-f_x x^{-1})^{-1/2} = 2\pi\, \mu_e^{-\frac{1}{2}}\, r_o^{\frac{3}{2}}$$

এটি (1)নং সমীকরণের দোলনকালের সঙ্গে মিলে যায়।

দোলনকালে অণুগুলির পরস্পর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ লাগে সম্ভবতঃ যানের দেয়ালের সঙ্গেও লাগে। মনে করতে পারি এই সংঘর্ষগুলি অন্ততঃ আংশিকভাবে স্থিতিস্থাপক নহে এমন; অর্থাৎ দোলনগুলি 'ড্যাম্প'। সব দোলনগুলিই যে 'ড্যাম্প' এটা নিশ্চিত হবার জন্যে আমরা মনে করতে পারি কক্ষ কিছু গ্যাস ধারণ করে আছে।

সব দোলনগুলি 'ড্যাম্প' হলে, সব অণুগুলি কক্ষের ভরবিন্দুগামী একটি সরলরেখার (y-অক্ষ) উপর স্থাপিত হয়। আরও সূক্ষ্মভাবে বলা যেতে পারে অণুগুলি r_o-ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র চাপের উপর অবস্থিত—যেদিকে কক্ষের ভরকেন্দ্রও গতিশীল। কেবলমাত্র এই অবস্থায় যানের সমান পর্যায়কালে তারা কেন্দ্রীয় স্তরের চারদিকে কক্ষপথে ঘুরতে থাকে আর সেই সঙ্গে ব্যাসার্ধের দিকে বা অক্ষের দিকে কোন দোলন থাকে না।

শনির রিং-এর ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটবে। শনির বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত রিং-এর অণুগুলি বিভিন্ন পর্যায়কালে ঘোরে।

2. তির্যক আপাত আকর্ষণ (Transverse apparent attraction)

যান থেকে অণুগুলির যেমন আচরণ পাওয়া গেল—ঠিক একই আচরণ পাওয়া যাবে যদি মনে করি তাদের উপর যেন y-অক্ষের দিকে f_a আপাত আকর্ষণ-ক্রিয়া করছে :

$$f_a = -\frac{\mu_o}{r_o^3}\,\rho \quad \cdots(6)$$

$$\text{যখন } \rho = (x^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \quad \cdots(7)$$

f_a এর z-অংশে কেন্দ্রীয় বস্তুর মহাকর্ষের z-অংশের সমান। আবার, f_a-এর ব্যাসার্ধের দিকের অংশ অবশ্যই বস্তুর গতির অবস্থার অন্তরের সঙ্গে যুক্ত। x-অক্ষের দিকে সরণ ঘটলে সুসমঞ্জস দোলন x-অক্ষ এবং একই সঙ্গে y-অক্ষ উভয় দিকেই পাওয়া যায়। সমীকরণ (3) থেকে পাই y-বেগের বিস্তার x-বেগের বিস্তারের দ্বিগুণ। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে x-দিকের এবং y-দিকের দোলন দশার অন্তর $\frac{\pi}{2}$। সুতরাং, অণুগুলি আবর্তিত হয় পরিবৃত্ত (Epicyle) পথে অর্থাৎ উপবৃত্তীয় (Ellipse) পথে, যার y-অক্ষ, x-অক্ষের দ্বিগুণ।

3. বিচলিত গতি (Perturbed motion)

মনে করি x—y তলে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র বস্তু m_p ঘূর্ণায়মান অক্ষের (xyz) মূলবিন্দু থেকে r_p দূরত্বে অবস্থিত। তবে, কেন্দ্রীয় স্তরের r_o দূরত্বে অবস্থিত বৃত্তাকারে আবর্তিত কোন একক স্তরের উপর m_p-এর যতখানি মহাকর্ষীয় বল তার পরিমাণ :

$$f_p = -\frac{\mu_p}{r_p^3} r_p \quad \cdots(8)$$

যখন $\mu_p = Km_p$

এবং $m_p << M_e$

এই বল অল্পকাল Δt ($\Delta t << T$) সময় ধরে কার্যকরী হলে একক ভরের বস্তুটির আপেক্ষিক কৌণিক ভরবেগ c-এর বৃদ্ধি ঘটে এবং এই পরিমাণ

$r_o (f_p)_y \Delta t$.

তাহলে (o, y_1) এবং যানের ভরকেন্দ্র এই দুই স্থানের বস্তুটির আপেক্ষিক কৌণিক ভরবেগের অন্তর Δc :

$$\Delta C = y_1 \frac{\delta}{\delta_y} [r_o (f_p) y] \Delta t.$$

$$= -\mu_p r_o y_1 \frac{\delta}{\delta_y} \frac{y}{(x^2+y^2)^3/_2} \Delta t = r_o \Delta F \quad (9)$$

যখন

$$\Delta F = \mu_p y_1 \frac{3 \sin^2\alpha - 1}{r_p^3} \Delta t \quad (10)$$

এবং, x-অক্ষ এবং r_p-এর মধ্যে কোণের পরিমাণ α_p।

বস্তুটির নতুন যে গতি হলো, সেটা বলা যেতে পারে নির্দেশক কেন্দ্রের বৃত্তীয় গতির মত এবং সেই কেন্দ্র আবার একটি পরিবৃত্তের গতির উপর অবস্থিত।

নির্দেশক কেন্দ্রের কক্ষীয় ব্যাসার্ধ

$r = r_o + \Delta r$

$$x_o = 2r_o \frac{\Delta c}{c} = 2 \frac{r_o^2}{c} \Delta F = \frac{T}{\pi} \Delta F \quad \cdots(11)$$

বসিয়ে পাই $\Delta r = x_o \quad \cdots(12)$

যেহেতু অল্পকাল Δt সময়ে অণুটির স্থান পরিবর্তন ঘটে না, সুতরাং পরিবৃত্তের x-অক্ষ হবে x_o এবং ফলে y-অক্ষ হবে $2x_o$। বস্তুটি পরিবৃত্তের পশ্চাদদিকে ঘোরে এবং তার কেন্দ্র বৃত্তীয় পথে ঘোরে, যার কৌণিক বেগ $\bar{\omega} + \Delta\bar{\omega}$।

যখন, যেহেতু $\bar{\omega} = cr^{-2} = \mu_o^2 c^{-3}$

$$\Delta\bar{\omega} = -3 \frac{\bar{\omega}}{c} \Delta c = -\frac{3\Delta F}{r_o} \quad (13)$$

সুতরাং τ অবকাশ পরে নির্দেশক কেন্দ্রের y-দিকে অবিচালিত বস্তুসাপেক্ষে যতখানি সরণ ঘটবে, তা হলো

$$y_\tau = \tau r_o \Delta\bar{\omega} = -3\Delta F\tau = -3\pi x_o \frac{\tau}{T} (14)$$

এখন আমরা দেখবো এক সরলরেখায় অবস্থিত অণুগুলি যানের ভরকেন্দ্রসাপেক্ষে কিভাবে অগ্রসর হয়। সামনের দিকে স্পর্শকের উপর যানের ভরকেন্দ্র থেকে y_1 দূরত্বে একটা বস্তু নেওয়া হলো। ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে এই বস্তুর নির্দেশক কেন্দ্রের বেগ $v_y = r_o \Delta\bar{\omega}$

সুতরাং (10) এবং (13) থেকে, τ অবকাশ পরে

$$y_\tau = -\frac{3\mu_p}{r_p^3} \Delta t \ \tau (3 \sin^2\alpha - 1) y_1 \quad (15)$$

যেহেতু $\mu_p = Km_p$

এবং $K = 4\pi^2 T^{-2} r_o^3 M_e^{-1}$

সুতরাং আমরা লিখতে পারি

$$y_\tau = -Ay_1 \quad (16)$$

যখন

$$A = 12\pi^3 \frac{m_p}{M_e} \left(\frac{r_o}{r_p}\right)^3 (3 \sin^2\alpha - 1) \frac{\Delta t \tau}{T^3}$$

$$= 3\pi\beta \frac{\tau}{T} \quad (17)$$

এবং

$$\beta = 4\pi \frac{m_p}{M_e} \left(\frac{r_o}{r_p}\right)^3 \frac{\Delta t}{T} (3 \sin^2\alpha - 1) \quad \cdots(18)$$

আরও পাই

$$x_o = \beta y_1 \quad \ldots(19)$$

সুতরাং ΔF বাধার ফলে বস্তুর অবস্থা এমনই হয় যে, নির্দেশক কেন্দ্রের y-মান বস্তুর

প্রাথমিক y—যানের অনুযানে পরিবর্তিত হয়। (17) সমীকরণ থেকে $\tau - \tau_A$ অবকাশ পরে পাই $A = 1$.। তখন সব নির্দেশক কেন্দ্রগুলি একটা ভেক্টর ব্যাসার্ধের উপর থাকে, যার কেন্দ্র হবে যানের ভরকেন্দ্র। বস্তুগুলির প্রকৃত অবস্থান কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে থাকবে। একটা বর্গের মধ্যে থাকবে, যার প্রত্যেকটা বাহু $4x_o$ এবং কেন্দ্র যানের ভরকেন্দ্র।

$$\tau_A = nT \quad (n = \text{একটি পূর্ণসংখ্যা}) \qquad (20)$$

সিদ্ধ হলে, একটা বিশেষ ঘটনা দেখা যায়। তখন সব অণুগুলি পরিবৃত্তের প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসে অর্থাৎ সব অণুগুলিই যানের ভরকেন্দ্রে স্থাপিত হয়।

এই ফলের জন্যে যে সর্ত সেটা সমীকরণ (17) এবং (19) থেকে পাওয়া যায়:

$$\beta \cdot \frac{1}{3\pi n} \qquad \cdots(21)$$

$$\text{or, } 12\pi \frac{m_p}{M_e}\left(\frac{r_e}{r_p}\right)^3 (3\,\text{Sin}^2\alpha - 1)$$

$$\frac{\Delta t}{T} = \frac{1}{n} \qquad \cdots(22)$$

বাধাপ্রাপ্ত বস্তুটি যদি এমনভাবে স্থাপিত হয় যে, $3\,\text{Sin}^2\alpha > 1$। অর্থাৎ $\alpha > 35°$

$$\text{or } \alpha < -35°$$

তখন সমস্ত বস্তুগুলি মূলবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হবে। সুতরাং তির্যক কেন্দ্রীভবন ছাড়া অনুদৈর্ঘ্য কেন্দ্রীভবনও আছে।

4. অনুদৈর্ঘ্য আপাত আকর্ষণ (Longitudinal apparent attraction)

তির্যক আপাত আকর্ষণের মতই অনুদৈর্ঘ্য কেন্দ্রীভবন ঘটে অনুদৈর্ঘ্য আপাত আকর্ষণের ফলে। এই আকর্ষণের ফলে বিভিন্ন ধরণের গতি পাওয়া যায়। আমরা যেটা পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় যানের ভরকেন্দ্র যানের সব অণুকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ বলা যায় অণুগুলির ভরকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হবার প্রবণতা দেখা যায়। তবে $-35° < \alpha < 35°$-এর ক্ষেত্রে ভরকেন্দ্রের আপাত বিকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

যানের ভর উপেক্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও ভরকেন্দ্রের এইরকম লক্ষণীয় ধর্ম দেখা যাচ্ছে। তার কারণ কেন্দ্রটি যানের সমগ্র বস্তুকণার গতির অবস্থা স্থির করে। মনে করি যানের ভর বস্তুকণার ভরের তুলনায় অনেক কম এবং তাদের প্রাথমিক সাধারণ ভরকেন্দ্র r যানের ভরকেন্দ্র r_o থেকে দূরে স্থাপিত। বস্তুকণার গতি যান অপেক্ষা মন্থর বলে বস্তুকণাগুলি যানের পিছনের দেয়ালে আঘাত করতে থাকে। তার ফলে যানের ভরকেন্দ্র দূরে সরতে সরতে বস্তুকণার ভরকেন্দ্রের সঙ্গে সমপাতিত হয়।

m_1 ভরবিশিষ্ট বস্তুকণার মধ্যে আপাত আকর্ষণ একটা নির্দিষ্ট সর্তে নিউটনের আকর্ষণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। সর্তটা হচ্ছে—

$$f_a >> \frac{Km_1}{\rho^2} \qquad (23)$$

$$\text{অর্থাৎ } \frac{\rho}{r_e} >> \left(\frac{m_1}{M_e}\right)^{\frac{1}{3}} \qquad (24)$$

$r_o = 10^9$ সে. মি. এবং $M_e = 6 \times 10^{27}$ গ্র্যাম হলে 6 গ্র্যাম ভরবিশিষ্ট বস্তুকণাগুলি অন্ততঃ 1 সে. মি. দূরত্বে থাকবে।

5. জ্যোতিপদার্থবিদ্যার সমস্যার প্রয়োগ (Application to astrophysical problem)

মহাকাশ-বলবিজ্ঞানের কিছু দিক, যার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত দৃষ্টি দেওয়া হয় নি, সেই জিনিষগুলি ব্যাখ্যা করবার জন্যে খুবই সাধারণ মডেল আলোচনা করা হলো।

আমাদের মডেলে যানের দেয়ালের কাজ হচ্ছে সমস্ত অণুকে সমপর্যায়কালে কক্ষপথে ঘুরতে বাধ্য করা। একই ফল আবার অন্যভাবেও

পাওয়া যেতে পারতো, যেমন—'ভিসকাস ফলের' দ্বারা, পরস্পর সংঘর্ষে এবং বিদ্যুচ্চুম্বকীয় বলের দ্বারা। যানের ভিতরের অণুগুলির এক সরলরেখায় স্থাপিত হবার সঙ্গে উল্কা-প্রবাহ অথবা গ্রহাণুপুঞ্জ-প্রবাহ উৎপন্নের কিছু সাদৃশ্য আছে। বাধা পাওয়ার ফলে অণুগুলি কেন্দ্রীভূত হবার সঙ্গে ধূমকেতুর উৎপত্তির মিল আছে।

আমাদের মডেলটির নীতি কিছু কিছু ছায়াপথের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অন্ন হলেও এই নীতি নীহারিকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আপাত আকর্ষণ নীহারিকাকে একত্রীভূত করতে পারে অথবা সংকোচন ঘটাতে পারে—এমনকি নিজেদের মধ্যে মহাকর্ষীয় বল যথেষ্ট না হলেও।*

* H. Alfvén লিখিত 'Apples in a Spacecraft'-এর (Science, 173, 522, 1971) ভাবানুবাদ।

বিজ্ঞান-সংবাদ

মুরগী উৎপাদনে নতুন আলোর ব্যবহার

মুরগী পালকেরা মুরগী উৎপাদনে যে ধরণের আলো ব্যবহার করেন, তা থেকেই বোঝা যায়, মুরগীগুলি কত বড় হবে বা কত বেশী সংখ্যায় শাবক পাওয়া যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় জানা গেছে যে, বিভিন্ন ধরণের আলোর বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকেই এসব জানা যায়।

গবেষকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, খাদ্য হিসেবে রান্নার উপযোগী যে সব মুরগীশাবককে সবুজ আলোর সঙ্কীর্ণ তরঙ্গে উৎপন্ন করা হয়, সেগুলি অন্য শাবকদের চেয়ে চার আউন্স করে বেশী ওজনের হয়। ভারমেণ্টে গবেষণায় আরও জানা গেছে, লাল আলোর সঙ্কীর্ণ তরঙ্গে উৎপন্ন মুরগীশাবকদের জন্মদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

দূষিত তৈল অপসারণে তুলা

কার্পেটের মত তুলার বেল্টে সমুদ্র ও হ্রদ থেকে দূষিত তৈল সরিয়ে ফেলবার কাজ সব চেয়ে ভালভাবে করা যেতে পারে। জাহাজের মুখের দিকে এই বেল্ট খাটিয়ে দিলে জলের সামান্য নীচে দিয়ে ভাসতে ভাসতে তেল পাওয়া গেলেই বেল্টটি ঐ তেল তুলে নেয়। বেল্টটি পিছিয়ে এসে একটি ঘূর্ণায়মান যন্ত্রে লাগে। যন্ত্রটি তেল শুষে নিয়ে তৈলাধারে ঢেলে দেয়। তুলার কার্পেট আবার জলের দিকে ভেসে পড়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসটেক ইউনিভার্সিটি টেক্সটাইল রিসার্চ সেন্টারে কেমিক্যাল প্রোসেসেস লেবোরেটরির অধ্যক্ষ ডক্টর রবার্ট এফ. জনসন তৈলাপসারণের এই ব্যবস্থাটি উদ্ভাবন করেছেন। তিনি বলেন, এই কাজের যত রকমের ব্যবস্থা বা যন্ত্র আছে এই তুলার বেল্ট সে সবের চেয়ে অন্ততঃ দশ গুণ বেশী কার্যকরী। 72 ইঞ্চির একটি বেল্ট ঘণ্টায় 785 গ্যালন তেল অপসারণ করতে পারে। উন্নয়নের ফলে ঘণ্টায় দুই হাজার গ্যালন তেলও এতে সরিয়ে ফেলা সম্ভব।

সমুদ্রতীরের যে সব অঞ্চল তেলের সর পড়ে দূষিত হয়েছে অথবা যেখানে এরকম আশঙ্কা দেখা দিয়েছে—সে সব অঞ্চলে তুলার বেল্ট ঢাকা দিয়ে রক্ষা বা পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—1974

সপ্তবিংশতিতম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

ট্রাইসেরাটপ্‌স্‌

হায়দরাবাদে নেহরু জুওলজিক্যাল পার্কে ট্রাইসেরাটপ্‌স্‌ নামক নিরামিষাশী ডাইনোসরের এই স্বাভাবিক আকারের মডেলটি তৈরী করেছেন ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা। 25 ফুট লম্বা ও 10·5 ফুট উঁচু এই মডেলটি কাচতন্তু দিয়ে তৈরী। শরীরের তুলনায় এদের মাথার খুলি খুব বড়, প্রায় 6 ফুট লম্বা ছিল। মাথার উপরে শক্ত হাড়ের বর্ম পিছনের দিকে বর্ধিত ছিল এবং তা ঘাড়কে ঢেকে রাখতো। এদের মাথায় তিনটি সোজা, লম্বা ও সূচালো শিং ছিল। মঙ্গোলিয়ায় এদের সমগোত্রীয় প্রোটোসেরাটপ্‌সের প্রস্তরীভূত ডিমসমেত আবাসস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে, যা থেকে জানা গেছে যে, এই সব অবলুপ্ত সরীসৃপেরাও ডিম পাড়তো। 7 থেকে 9 কোটি বছর আগে ট্রাইসেরাটপ্‌স্‌ উত্তর আমেরিকায় বিচরণ করতো। এরা টাইরানোসরাস নামক অতিকায় মাংসাশী ডাইনোসরের সমসাময়িক ছিল।

[ছবি—পতাকীরাম চন্দ্রের সৌজন্যে

মার্কোনী—শতবর্ষ স্মরণে

1912 খৃষ্টাব্দের 10ই এপ্রিল মধ্যরাত্রি। মহাসাগর থেকে বেতারযোগে ব্যাকুল আর্তনাদ ভেসে এলো, "বাঁচাও! আমাদের বাঁচাও!" এই খবর ভেসে আসছিল টাইটানিক জাহাজ থেকে। এই জাহাজটি ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বড় জাহাজ। আধুনিকতম কলকৌশলে সজ্জিত এই জাহাজে দেড় হাজারেরও বেশী যাত্রী ছিল। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জলপথে ছুটলো দ্রুতগামী জাহাজ আর আকাশপথে ছুটলো এরোপ্লেন। ঠিক সময়ে সাহায্য পৌঁছাবার ফলে বহু যাত্রীর প্রাণরক্ষা পেল। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে বেতার ও তাঁর আবিষ্কারকের নাম স্থান পেল। যিনি এই অত্যাশ্চর্য ও অতি-প্রয়োজনীয় যন্ত্রের আবিষ্কর্তা, তিনিই হলেন মার্কোনী।

মার্কোনীর জন্মের সময় বাড়ীর বৃদ্ধ চাকর বলে উঠলো, "ওমা! শিশুটির কি বড় বড় কান গো!" চাকরের এই মন্তব্যে মার উত্তর, "বড় বড় কানে অতি ক্ষুদ্র শব্দও শুনতে পাবে।" সত্যই আশ্চর্য হতে হয় যে, তখন কেউ ভাবেন নি হাজার হাজার মাইল থেকে ভেসে আসা নিঃশব্দ তরঙ্গ প্রথম এই কানেই ধরা দিবে—বেতারের আবিষ্কারকরূপে এই শিশু—ভবিষ্যতে খ্যাতিলাভ করবে।

এক শত বৎসর পূর্বে 1874 খৃষ্টাব্দের 25শে এপ্রিল ইটালীর এক ধনী পরিবারে গুগ্লিয়েল্‌মো মার্কোনী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জিউসেপ মার্কোনী ও মাতার নাম অ্যানা মার্কোনী। মার্কোনীর শৈশব কাটে বাবার জমিদারীতে। ছোটবেলায় খেলাধূলা তার আদৌ ভাল লাগতো না। বাড়ীর বিরাট লাইব্রেরীতে সব সময়েই সে বই পড়ায় ব্যস্ত থাকতো। ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। বাড়ীর লাইব্রেরীতে বিজ্ঞানের অনেক বই ছিল। বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানেই তিনি শিক্ষালাভ করেন, কোন দিনই বিদ্যালয়ে যান নি। বিজ্ঞানের অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। এইভাবে কোন স্কুল বা কলেজে শিক্ষালাভ না করেও বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত হয়ে ওঠেন।

তারের সাহায্যে সঙ্কেত ও খবর পাঠাবার উপায় আবিষ্কৃত হলো, কিন্তু এই আবিষ্কার করেই মানুষ ক্ষান্ত রইলো না—কেন না, হাজার হাজার মাইল দূরত্বে খুব অল্প সময়ে সংবাদ পাঠানো গেলেও এর সাহায্যে মাঝ সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত জাহাজ বা আকাশে উড়ন্ত উড়োজাহাজ ডাঙায় বিপদের কথা জানাতে পারবে না। এই সব ক্ষেত্রে বেতার-যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে। বহুদিনের অধ্যবসায়ের ফলে মার্কোনী সার্থকভাবে বেতার-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বায়ুর কম্পনে আমরা শব্দ শুনতে পাই, আর ঈথারের কম্পনে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। 1887 খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হার্ট্‌জ্

আবিষ্কার করেন যে, পুকুরের মধ্যে ঢিল ছুঁড়লে যেমন বৃত্তাকারে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, ঠিক সেরূপ ঈথার-মণ্ডলেও বিদ্যুৎ বৃত্তাকারে তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে। পরে জানা যায়, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহের ফলেই আলোক, বেতার, এক্স-রশ্মি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। হার্ট্জের এই আবিষ্কার তৎকালীন জার্মেনীর একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিশ বছরের তরুণ মার্কোনী সেই পত্রিকা দেখে হার্ট্জের তরঙ্গ সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং আরো জানতে পারেন যে, হার্ট্জ্ এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবার একরকম যন্ত্রও তৈরী করেছেন। খাওয়াদাওয়া ভুলে মার্কোনী সবসময়েই এই বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। একটি ঘরের মধ্যে বিনা তারে যদি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠানো যায়, তবে তা দূরে পাঠানোই বা যাবে না কেন? দিবারাত্রি তিনি অক্লান্তভাবে গবেষণা করতে লাগলেন। তাঁর নিজের বাড়ীর চারতলাকেই গবেষণাগার রূপে ব্যবহার করতেন। বারবার ব্যর্থ হয়েও তিনি অক্লান্তভাবে গবেষণা করে চললেন।

বেতার নিয়ে মার্কোনীর প্রথম আবিষ্কৃত যন্ত্র বেশ অভিনব ছিল। চারতলার গবেষণাগারে ছিল একটি যন্ত্র, আর নীচে ছিল একটি ঘণ্টা। যন্ত্রের একটা সুইচ টিপলেই ঘণ্টা বাজতো, যদিও তাদের মধ্যে তারের সংযোগ ছিল না। এই অভিনব যন্ত্রের দর্শক ছিলেন তাঁর মাতা। এরপর তিনি শব্দের পরিবর্তে টেলিগ্রাফের ন্যায় সঙ্কেত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন এবং এইভাবে তাঁর বাড়ীতে বেতার-টেলিগ্রাফের আবিষ্কার হয়। পরে তিনি আরও কিছুটা উন্নত ধরণের যন্ত্র তৈরী করেন। তিনি তাঁর বাড়ীর এক মাইলের মত দূরত্বে এক পাহাড়ের অপর দিকের নীচু জমিতে বেতার গ্রাহক-যন্ত্র রাখেন। ঐখানে তিনি তাঁর দাদা আলফান্সোকে রাখেন—যাতে গ্রাহক-যন্ত্রে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পৌঁছলে বন্দুকের শব্দে জানিয়ে দেন। তিনি পরীক্ষাগারে সুইচ টিপতেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। এই ভাবেই তরুণ বৈজ্ঞানিক মার্কোনী বেতার আবিষ্কারের পথে ধাপে ধাপে এগোতে লাগলেন।

বেতারের উন্নত ধরণের বিভিন্ন পরীক্ষায় ও তাকে কাজে লাগাতে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন। ইটালী সরকারের কাছে আবেদন করেও সাহায্য লাভে তিনি বঞ্চিত হন। মার্কোনীর মা ছিলেন আইরিশ মহিলা, ফলে তিনি ইংল্যাণ্ড গিয়ে সেখানে সাহায্যের আবেদন করেন এবং ইংল্যাণ্ডের ডাক ও নৌ-বিভাগ সকল প্রকার সাহায্য ও ব্যয়বহনের ভার গ্রহণ করতে রাজী হয়। তিনি ইংল্যাণ্ডের কর্ণওয়ালে একটি বেতার স্টেশন তৈরী করেন এবং মোর্স-এর পদ্ধতিতে সমুদ্রের ওপারে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে বেতার-সঙ্কেত প্রেরণ করতে সক্ষম হন। তাঁর এই সাফল্যের জয়যাত্রা 1901 খৃষ্টাব্দে আরও স্মরণীয়ভাবে প্রকাশ হয়। এই বছরেই তিনি তিন হাজার মাইল দূরবর্তী অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের অপর প্রান্ত থেকে প্রেরিত বেতার-বার্তা গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

এরপর অল্প সময়ের মধ্যে বেতার-যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়ে যায়। ইউরোপে ফিরে

1905 খৃষ্টাব্দে আইরিশের লর্ড ইনচিকুইন-এর কন্যা বিয়াট্রিস ওব্রিয়েনকে তিনি বিবাহ করেন। এদিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মার্কোনীকে অভিনন্দন জানানো হতে থাকে।

বিজ্ঞানের অধিকাংশ আবিষ্কারই পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রেও মার্কোনীকে বহু বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের সাহায্য নিতে হয়েছে। ম্যাক্সওয়েল, হার্টজ, ব্রন, আচার্য জগদীশচন্দ্র, কেলভিন, টেসলা প্রমুখ সকলেরই বেতার আবিষ্কারের পিছনে যথেষ্ট দান থাকলেও বেশী দূরে সঙ্কেত পাঠাবার রহস্যটি মার্কোনী ছাড়া আর কারো জানা ছিল না। সুতরাং মার্কোনীই নিঃসন্দেহে বেতারের প্রকৃত আবিষ্কারক। জার্মান বৈজ্ঞানিক কার্ল ফার্ডিন্যাণ্ড ব্রন-এর এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকায় মার্কোনী তাঁর সঙ্গে 1909 খৃষ্টাব্দে যুগ্মভাবে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে নানারূপ সম্মানজনক পদ ও উপাধি লাভ করেন।

1925 খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে মোটর গাড়ীতে পাহাড়ী পথে যাওবার সময় দুর্ঘটনায় মার্কোনীর ডান চোখে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। ইউরোপের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের সাহায্যে তাঁকে বাঁচানো গেল বটে, কিন্তু তাঁর ডান চোখ চিরদিনের জন্যে নষ্ট হয়ে গেল। তিনি ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন। সুস্থ হয়েই বেতারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। 1927 খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার রোমের এক মহিলাকে বিবাহ করেন। ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গ নিয়ে তাঁর গবেষণা দিনরাত চলতে থাকে। তাঁর এই সব গবেষণার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে রেডার, টেলিভিশন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়।

1937 খৃষ্টাব্দের 20 জুলাই মার্কোনী রোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন; কিন্তু মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে রইলেন।

মার্কোনী ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক। ইংল্যাণ্ডে বেতার সম্বন্ধে গবেষণা করবার সময়ে ইটালীর সামরিক বিভাগে যোগ দিতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। এই জন্যে বেতার সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা বেশ কিছু দিন স্থগিত রাখতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী। অতুলনীয় সম্মানের অধিকারী হয়েও তিনি প্রথম জীবনের বন্ধুদের ভোলেন নি। আজ তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীতে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই

পারদর্শিতার পরীক্ষা

নীচের অঙ্কগুলিতে ক, খ, গ বা চ, ছ, জ ইত্যাদি অক্ষর দ্বারা 0, 1, 2,···8, 9—এই সংখ্যাগুলির এক-একটিকে বোঝানো হয়েছে। এই সংখ্যাগুলি নির্ণয় করে অঙ্কগুলিকে আবার লিখতে হবে। যতগুলিকে সঠিকভাবে লিখতে পারবে, সেই অনুযায়ী অঙ্কে তোমার পারদর্শিতা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

1. ক ক ক ক ক × ক = গ ক ক ক ক খ

গ × খ = গ

2. চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড × ড = চ চ চ চ চ চ চ চ চ

3. ত ত ত × ত ত ত = ত থ দ থ ত

4. প ফ ব ভ ম য র ল হ + হ ল র য ম ভ ব ফ প = প প প প প প প প প ন

5. ঘ × ঘ × ঘ = শ ষ স

শ + ষ + স = ঘ

(উত্তরের জন্যে 219নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

সামুদ্রিক শ্যাওলা

স্রোতহীন বদ্ধ জলাশয়ে স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় খাল-বিল প্রভৃতি স্থানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রকমের উদ্ভিদ জন্মায়। এগুলিকে শৈবাল বা শ্যাওলা বলা হয়, এদের ফুল হয় না। এখানে আমরা আমাদের অতি পরিচিত শ্যাওলার কথা না বলে সমুদ্রজাত শ্যাওলা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

শ্যাওলা দৈর্ঘ্যে অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু সামুদ্রিক শ্যাওলা 100 ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। বিরাট আকৃতির সামুদ্রিক শ্যাওলার নাম Microcystis, Nereocystis প্রভৃতি। Sargassum নামের বায়ুপূর্ণ থলির সাহায্যে এরা জলে ভেসে বেড়ায়। সাধারণতঃ সমুদ্র-জলের উপরে শ্যাওলা জন্মায়, তবে লাল শ্যাওলা 600 ফুট গভীরেও দেখা গেছে। এবার এদের ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

পশ্চিম ইউরোপের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে শ্যাওলা সংগ্রহ করে জৈব সার হিসেবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। গোলাপ ফুলের সারের জন্যে Laminaria ও Fucus নামক শ্যাওলার খুব কদর। মাটির উর্বরতা ও জলধারণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে Laminaria একটি আদর্শ সার। চীনদেশে শ্যাওলা পুড়িয়ে তার ছাই ব্যবহৃত হয় চাষের কাজে। শ্যাওলার রাসায়নিক বিশ্লেষণে নাইট্রোজেন, পটাস, ফস্‌ফেট ও লবণ পাওয়া গেছে। 15 টন শ্যাওলার সঙ্গে 50 কে. জি. অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং 200 কে. জি. সুপার ফস্‌ফেট মিশিয়ে উৎকৃষ্ট সার তৈরী হতে পারে।

পৃথিবীর নানা দেশে পশুখাদ্যের জন্যে সামুদ্রিক শ্যাওলা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Rhodymenia নামের শ্যাওলা মেষজাতীয় প্রাণীর প্রিয় খাদ্য। দক্ষিণ আমেরিকার মেয়েরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে শ্যাওলা খাবার জন্যে সমুদ্রের ধারে যায়। 1917 সালে নরওয়েতে সর্বপ্রথম শ্যাওলা থেকে খাদ্য বিশ্লেষিত হয়েছিল। পোলট্রির মুরগীর পক্ষেও এটি আদর্শ খাদ্য। আয়োডিন স্বল্পতার ক্ষেত্রে শ্যাওলা একটি উৎকৃষ্ট আহার্য।

প্রাচীন কাল থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে সামুদ্রিক শ্যাওলার ব্যাপক প্রয়োগ হয়ে এসেছে। 1330 খৃষ্ট-পূর্বাব্দে চীনে আয়োডিন-স্বল্পতাজাত রোগের প্রতিরোধে শ্যাওলা ব্যবহৃত হয়েছে। লিম্‌ফ্‌ (Lymph) ও গ্ল্যাণ্ডের (Gland) রোগে Digenia simplex নামক শ্যাওলার প্রয়োগ হয়। পেটের অসুস্থতায় Uera এবং Fucus শ্যাওলা খুব উপকারী। ব্ল্যাডার (Bladder) ও কিড্‌নীর (Kidney) দোষে Acetalealaria major নামক শ্যাওলা ব্যবহৃত হয়। শ্যাওলা থেকে পটাসিয়াম ক্লোরাইড এবং বিভিন্ন ভিটামিন পাওয়া যায়। মূলতঃ এথেকেই ঔষধ হিসাবে শ্যাওলা প্রয়োগ করা হয়।

আধুনিককালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সামুদ্রিক শ্যাওলার ব্যবহার কমে আসছে।

শিল্পক্ষেত্রে ম্যানিটল (Mannitol) ও ল্যামিনারিন (Laminarin) নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ উৎপাদনে Laminaria cloustoni নামক শ্যাওলার ভূমিকা অপরিসীম। ম্যানিটলকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় ঔষধ নির্মাণে, রেসিন প্রস্তুতিতে এবং ভার্নিশ ও দেশলাই উৎপাদনে। Algin, agar ও carrageenin প্রভৃতি পদার্থও মূলতঃ এই উদ্ভিদ থেকেই উৎপন্ন হয়। প্রোটিন স্থিতিকারক (Protein stabilizer) ও সেলুলোজ উৎপাদক হিসাবে আমেরিকায় Algin ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ Alginic acid হলো রক্ত জমাট বাঁধবার উপযোগী পদার্থ।

Agar হলো Gelidium নাম শ্যাওলা থেকে উৎপন্ন জলে দ্রবণীয় জেল (Gel) জাতীয় কলয়েড পদার্থ। জেলী, আইসক্রীম, বেকারী শিল্পে Agar-কে জেল প্রস্তুতকারক রূপে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে Agar উৎপাদনে জাপান ছিল একক, বর্তমানে আমেরিকা, নিউজীল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড এবং ডেনমার্কে Agar উৎপন্ন হচ্ছে। শ্যাওলা থেকে জুতার পালিশ, সাবান, প্রসাধন সামগ্রী, শ্যাম্পু ও লুব্রিকেটিং জেলী পাওয়া যায়।

শ্যাওলা থেকে খাবার—কথাটা শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও কিন্তু সত্য। 600 খৃষ্ট-পূর্বাব্দে চীনদেশে শ্যাওলাকে বলা হতো পরম উপাদেয় খাদ্য—এমন কি, দেশের সম্রাটের পক্ষে ছিল তা আদর্শ আহার। Rhodymenia নামে শ্যাওলা থেকে আমেরিকায় পপকর্ণ তৈরী হয়। Porphyra থেকে স্যুপে দেবার মশলা পাওয়া যায়।

এইভাবে সামুদ্রিক শ্যাওলা মানুষের উপকারে লাগছে। অদূর ভবিষ্যতে তাথেকে আরও মূল্যবান পদার্থ পাওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

অলোককুমার সেন

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1.
$$\begin{array}{r} 99999 \\ \times 9 \\ \hline 899991 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 8 \\ \times 1 \\ \hline 8 \end{array}$$

2.
$$\begin{array}{r} 12345679 \\ \times 9 \\ \hline 111111111 \end{array}$$

3.
$$\begin{array}{r} 111 \\ \times 111 \\ \hline 12321 \end{array}$$

4.
$$\begin{array}{r} 123456789 \\ +987654321 \\ \hline 1111111110 \end{array}$$

5. $8 \times 8 \times 8 = 512$

$5+1+2=8$

বিস্ময়কর বৈদ্যুতিক বাতি

বিস্ময়কর বৈদ্যুতিক বাতি সত্যই বিস্মিত করে দেবার মত জিনিষ। একটা বৈদ্যুতিক বাতিকে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির সাহায্যে যেই উত্তপ্ত করা হয়, অমনি সেটা জ্বলে ওঠে, আবার ফুঁ দিলেই নিভে যায়। যন্ত্রটার মধ্যে একটু ম্যাজিকের গন্ধ থাকলেও এটা মোটেই ম্যাজিক নয়। তোমরা নিজেরাই অনায়াসে করে দেখতে পার।

বেশীর ভাগ প্রতিপ্রভ (Fluorescent) বাতির সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী চোঙের মত একটা বাক্স থাকে—যাকে স্টার্টার বলে। ঐ রকম একটা একটা স্টার্টার জোগাড় করে (পুরনো হলেও চলবে) তার তলার দিকের ক্লিপ চারটি খুলে ফেললে 1নং ছবির মত জিনিষটা পাওয়া যাবে। এটাই যন্ত্রের মূল অংশ। ক হচ্ছে নির্দিষ্ট

দূরত্বে অবস্থিত বাঁকানো দুটো বিশেষ ধাতব পাত। খ এবং গ পয়েন্টার, যাদের সঙ্গে ক পাত দুটি তার দিয়ে সংযুক্ত। ক পাত দুটিকে সামান্য উত্তপ্ত করলেই সেগুলি প্রসারিত হবে এবং পরস্পরের সঙ্গে লেগে গিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটাবে, অর্থাৎ সুইচের কাজ করবে। বর্ণনার সুবিধার্থে এই যন্ত্রাংশটাকে আমরা 'তাপ-সুইচ' বলবো।

উপরিউক্ত তাপ-সুইচটিকে কোন বাল্বের পাশে এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে সহজে দেখা না যায়। অনেক রকম ভাবে এটা করা চলে। যেমন:—ঘ-এর মত করে তৈরী কোন ঢাকনার (Shed) সঙ্গে ঙ হোল্ডারটা লাগানো হলো। বৈদ্যুতিক

1নং চিত্র
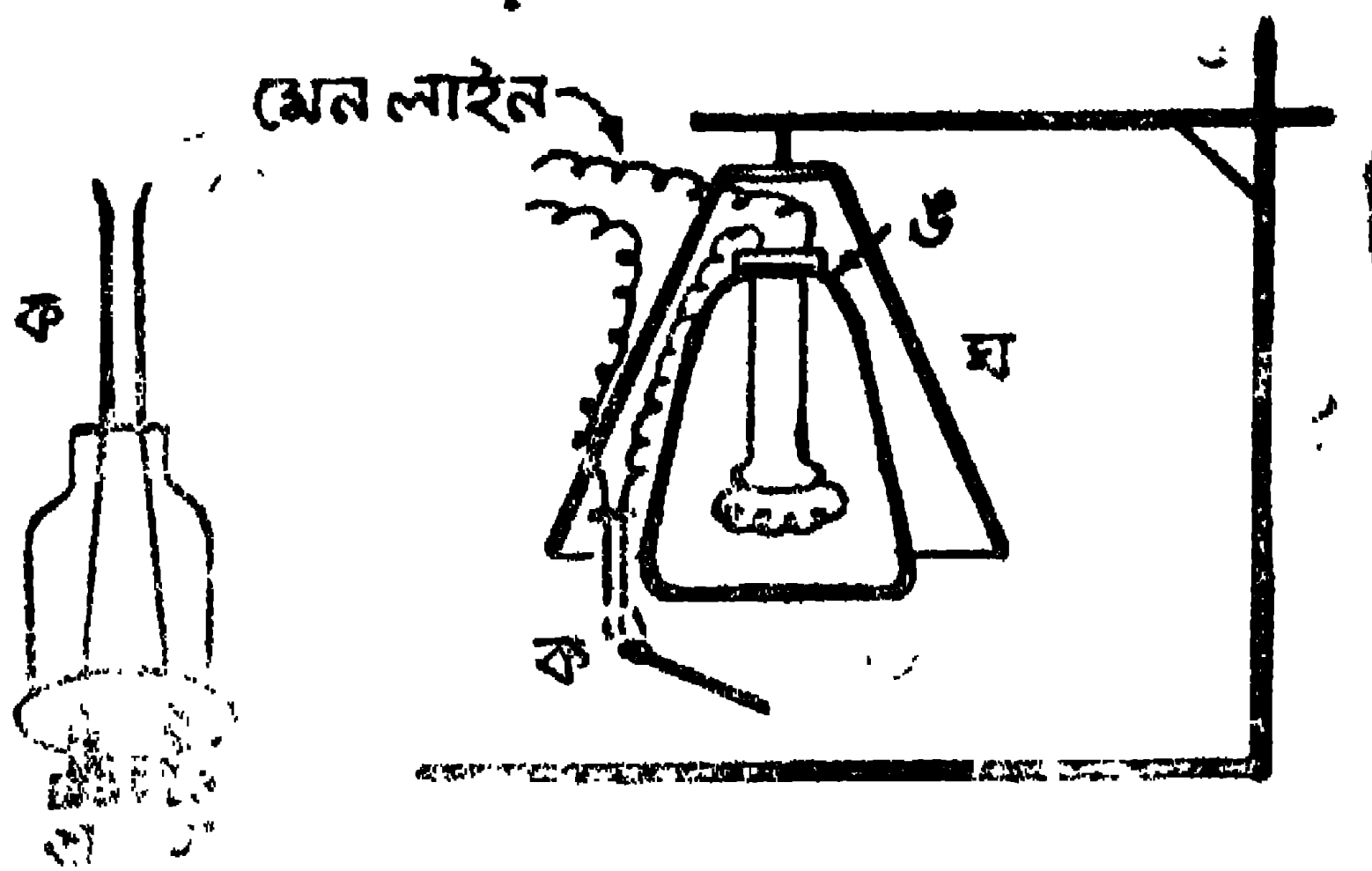
বাল্বটা হোল্ডারের মধ্যে বসিয়ে দাও। এবার বাল্বের গা ঘেঁষে ঘ ঢাকনার সঙ্গে তাপ-সুইচটি এমনভাবে লাগাও, যাতে ক পাত দুটি সামান্য একটু বেরিয়ে থাকে। হোল্ডারের একটা তার গ পয়েন্টারে ও অন্যটা বৈদ্যুতিক লাইনের পজিটিভে এবং খ পয়েন্টারটি নেগেটিভে যোগ করতে হবে।

এখন জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির সাহায্যে সাবধানে ক পাত দুটিকে উত্তপ্ত করলেই বাতিটা জ্বলে উঠবে। আবার ফুঁ দিলেই পাত দুটি ঠাণ্ডা হয়ে সঙ্কুচিত হবে ও ফাঁক হয়ে যাবে, ফলে বাতি নিবে যাবে।

এই যন্ত্রটিকে অগ্নি-সতর্কীকরণের যন্ত্র হিসাবেও ব্যবহার করা চলে। বাল্বের বদলে বৈদ্যুতিক কলিং বেল লাগাতে হবে। আর একাধিক তাপ-সুইচ আগুন লাগতে পারে এমন সম্ভাব্য জায়গায় রেখে দিতে হবে।

পূর্ণেন্দু সরকার

উৎকণ্ঠায় কষ্ট পাই কেন ?

তোমাদের মধ্যে হয়তো কারোর কারোর ভয় বা উৎকণ্ঠার সময় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুত হয়, পেটে এক রকম অস্বস্তি এবং শরীর খুব দুর্বল বোধ হয়। ডাক্তার দেখালে তিনি কিন্তু তোমাকে পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ সুস্থই বলবেন। এ এক রকমের উৎকণ্ঠাজনিত স্নায়বিক রোগ। এটা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে যে, এই রকম উপসর্গগুলি দেখা দেয় তখন—যখন খুব দৈহিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম কর।

এর কারণ জান কি ? আমরা দৈহিক শক্তি অর্জন করি শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) জাতীয় পদার্থ বা আরও পরিষ্কার করে বললে গ্লুকোজ থেকে। যখন আমাদের শক্তির প্রয়োজন হয়, তখন কোষগুলি মাইটোকনড্রিয়ায় (Mitochondria) অবস্থিত কতকগুলি এনজাইমের দ্বারা অক্সিজেনের বিনা উপস্থিতিতেই (Anaerobic condition) গ্লুকোজের জারণ (Oxidation) ঘটিয়ে তাপের আকারে শক্তি উৎপন্ন করে এবং গ্লুকোজ শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই ল্যাকটিক অ্যাসিড কিছুটা পরিমাণে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে ও পুনরায় কিছু তাপ ও শক্তির সৃষ্টি করে এবং বৃহৎ অংশ রক্তে মিশে যকৃতে আবার গ্লুকোজে পরিণত হয়। সুতরাং দৈহিক পরিশ্রমের সময় পেশী-কোষগুলিতে (Muscle cell) ক্রমাগত গ্লুকোজ ভাঙ্গতে থাকে ও রক্তে ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়তে থাকে, কারণ তৎক্ষণাৎ কোন ল্যাকটিক অ্যাসিড গ্লুকোজে পরিণত হতে পারে না।

উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগজনিত স্নায়বিক রোগে এই ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যায়। এই ল্যাকটেটের আয়নগুলি রক্তে অবস্থিত ক্যালসিয়াম অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্নায়ুকোষের সংযোগস্থলে জমা হয় এবং অত্যধিক পরিমাণ ল্যাকটেট আয়ন স্নায়বিক অনুভূতি চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় ও নানা উপসর্গের সৃষ্টি করে। প্রোপ্রানোলল (Propranolol) নামক একটি ওষুধ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ফলে এই স্নায়বিক রোগজনিত অস্বস্তির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে।

শ্রীচিত্তপ্রিয় সরকার*

প্রাণ-রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-19

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : 1. কৃত্রিম উপগ্রহের দ্বারা সাধারণতঃ আয়নমণ্ডল সংক্রান্ত কোন্ কোন্ খবর জানতে পারি ?

পুতুল পাল, কলিকাতা

প্রশ্ন : 2. অন্যান্য নক্ষত্রদের মত ধ্রুবতারা আকাশে দিক পরিবর্তন করে না কেন?

নন্দন চন্দ্র ও পুলক মিত্র, মুর্শিদাবাদ

উত্তর : 1. কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র থাকে। যেমন, স্বয়ংক্রিয় বেতার প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র, সাধারণ ও দূরবীক্ষণ ক্যামেরা, বায়ুর চাপ ও তাপ মাপবার যন্ত্র, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের তীব্রতা পরিমাপক যন্ত্র প্রভৃতি। পৃথিবীর উপরিভাগে প্রদক্ষিণ করতে করতে কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর উপরিভাগের নানা তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

পৃথিবীর সমতলে অবস্থিত বেতার প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র আয়নমণ্ডলের F-স্তরে পর্যন্ত খোঁজ-খবর দেয়। F-স্তরের বাইরের খবর এজাতীয় পরীক্ষায় পাওয়া যায় না। অন্যদিকে আয়নমণ্ডলে F-স্তরের বাইরে আরও কয়েক-শ' কিলোমিটার উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। কৃত্রিম উপগ্রহে অবস্থিত বেতার প্রেরণ ও গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে সমগ্র আয়নমণ্ডলের খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এই সব খোঁজ-খবরের মধ্যে সাধারণতঃ আয়নমণ্ডলের উপরিভাগের মোট ইলেক্ট্রনের সংখ্যা এবং উচ্চতার সঙ্গে ইলেকট্রন-সংখ্যার বিন্যাসই জানা হয়ে থাকে। অবশ্য এথেকেই অন্যান্য বহু তথ্য অঙ্কের সাহায্যে বের করা যায়।

আয়নমণ্ডলের মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা এবং বিভিন্ন স্তরে এই সংখ্যার বিন্যাস সাধারণতঃ (1) ফ্যারাডে আবর্তন, (2) ডপ্‌লার প্রক্রিয়া এবং (3) কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে জানা যায়।

(1) নম্বর পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সমবর্তনশীল বেতার-তরঙ্গ নীচের দিকে প্রেরিত হয়ে আয়ন মণ্ডলে প্রবেশ করে। পৃথিবীর চৌম্বক বলের প্রভাবে তা সাধারণ তরঙ্গ ও অসাধারণ তরঙ্গে ভেঙ্গে যায়। এই দুই তরঙ্গই উপবৃত্তাবর্তন-ধর্মী। আয়নমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে এই দুই তরঙ্গ পুনরায় মিলিত হয়ে সমবর্তনশীল তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু আয়নমণ্ডলে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হয়ে থাকে এবং পৃথিবীর চৌম্বক বলও সর্বত্র সমান নয়; সেজন্যে বেরিয়ে-আসা সমবর্তনশীল তরঙ্গের সমবর্তন-তল আবর্তিত হয়ে থাকে। এটিই ফ্যারাডে আবর্তন, যা পরিমাপ করে আয়ন মণ্ডলের উপরিভাগের মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা এবং ঘনত্ব অঙ্ক কষে বের করা যায়।

(2) নম্বর পদ্ধতিতে প্রেরক এবং গ্রাহক-যন্ত্রের আপেক্ষিক গতিবেগের জন্যে গ্রাহক যন্ত্রে যে তরঙ্গের কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়, তাকে কাজে লাগানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে ডপ্‌লার প্রক্রিয়া বলা হয়। ডপ্‌লারের প্রক্রিয়া অনুযায়ী গতিশীল কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়ে যায়, ফলে আয়নমণ্ডলে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের পথও পরিবর্তিত হয়। বেতার-তরঙ্গের পথ মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের উপর নির্ভর করে এবং এই প্রতিসরাঙ্ক আবার স্থানীয় ইলেকট্রনের সংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই গতিশীল উপগ্রহ ও ভূতলের গ্রাহক-যন্ত্রের আপেক্ষিক গতিবেগের জন্যে বেতার-তঙ্গের কম্পাঙ্কের পরিবর্তন হয় এবং আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গ পথের পরিবর্তনের জন্যেও কম্পাঙ্কের কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে পরিমাপ করেই আয়নমণ্ডলের উপরিভাগে মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা জানা সম্ভব।

(3) নম্বর পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট গ্রাহক-যন্ত্রে গৃহীত গতিশীল কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ উপস্থিতি নির্ধারণ করে আয়ন-মণ্ডলের মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা মাপা সম্ভব।

2. লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আকাশের সব জ্যোতিষ্কই পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এর কারণ হলো যে, এরা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে আছে এবং হয়তো তাদের নিজস্ব কোন গতিবিধি আছে, তবুও পৃথিবী থেকে তাদের স্থির বলেই ধরা যেতে পারে। পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে বলে ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে দর্শকের কাছে মনে হয় দূরের স্থির নক্ষত্রগুলি পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। গাড়ীতে বসে আমরা যেমন দেখি যে, বাইরের স্থির গাছপালা প্রচণ্ড বেগে বিপরীত দিকে ছুটে চলে। ধ্রুবতারা রয়েছে ঠিক পৃথিবীর অক্ষ বরাবর উপরের আকাশে। তাই পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকেই লক্ষ্য করা থাক না কেন, পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর অবস্থানের কোন পরিবর্তন হবে না; অর্থাৎ সব সময়েই একে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির থাকতে দেখা যাবে। তবে দক্ষিণ থেকে স্বাভাবিক কারণেই এই ধ্রুবতারাকে দেখতে পাওয়া যায় না।

শ্যামসুন্দর দে*

*ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মহাপ্রয়াণে পরিষদের কার্যকরী সমিতির 1৫ই মার্চ '74 তারিখের সভায় অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় সর্বসম্মতিক্রমে বর্তমান বৎসরের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন

20শে মার্চ (1974) বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি, ভারত চেম্বার অব কমার্স, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স, মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স এবং ওরিয়েন্টাল চেম্বার অব কমার্স-এর পক্ষ থেকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন ও পরিষদকে প্রতিকৃতি অর্পণ-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। উক্ত প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক অবদান ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জন্যে নিরলস প্রচেষ্টার বিষয় তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর আদর্শের প্রতীক বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে এই রাজ্যের বণিক সম্প্রদায় যে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। তিনি আশা করেন—পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি এবং কর্মপ্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণে বণিক সম্প্রদায় যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

আবরণ উন্মোচনের পর প্রতিকৃতিটি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির সভাপতি শ্রী ডি. পি. গোয়েঙ্কার নিকট থেকে পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র পরিষদের পক্ষে উপহার হিসাবে গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতার শেরিফ ও ওরিয়েন্টাল চেম্বার্স অব কমার্সের সভাপতি শ্রীরুসী বি গিমি। অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির সভাপতি শ্রী জি. সাহা, ভারত চেম্বার অব কমার্স-এর শ্রীকে. এল. চৌধুরী, মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্সের শ্রীআত্মারাম কানোরিয়া প্রমুখ। বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষাকল্পে পরিষদের প্রচেষ্টা বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও একটি সচিত্র বিজ্ঞান-কোষের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এই বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও বিজ্ঞান-কোষের বাস্তব রূপায়ণ আচার্য বসুর অন্যতম লক্ষ্য ছিল, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁর জীবদ্দশায় এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। সেই জন্যে বিজ্ঞান পরিষদ এই দুটি কর্মসূচী বিশেষভাবে গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে ডক্টর বসু কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সর্বসাধারণ—বিশেষতঃ এই রাজ্যের বণিক সম্প্রদায়ের নিকট আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যের জন্যে আবেদন জানান। পরিশেষে সভাপতি শ্রীরুসী বি গিমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আচার্য বসুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে বিজ্ঞান পরিষদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। অনুষ্ঠানে প্রতিকৃতির শিল্পী শ্রীদীনবন্ধুচন্দ্র চন্দ্রকে অঙ্গবস্ত্র ও মানপত্রদানে সম্মানিত করা হয়।

ভ্রম সংশোধন—মার্চ (1974) সংখ্যা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 155 পৃষ্ঠায় ·· $F_n = 2^{2n}+1$, এর স্থলে হবে ···$F_n = 2^{2^n}+1$, হবে। এবং 116 পৃষ্ঠায় 2য় কলামের 8ম পংক্তির রসোৎসুরের, 117 পৃষ্ঠায় 2য় কলামের 11শ পংক্তির মজুরণ, 118 পৃষ্ঠায় 1ম কলামের 6ষ্ঠ পংক্তির তামিল, 119 পৃষ্ঠায় উপর থেকে 5ম পংক্তির প্রতি এবং নীচে 2য় কলামের 12শ পংক্তির স্বল্পমুখী, 15শ পংক্তির পেয়েছেন, প্রাণময়তা এবং 121 পৃষ্ঠার 14শ পংক্তির লুটিয়ে যাবে, 17শ পংক্তির অভয় খপে-এর স্থলে হবে যথাক্রমে রসোৎসুকের, মজ্জরণ, তালিম, গ্রন্থি, স্বল্পমুখী, গেয়েছেন, প্রেম, লুকিয়ে থাকে, অভয় স্বপে। মুদ্রণজনিত এই ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিচালিত মাসিক পত্রিকা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

সবচেয়ে প্রিয়
হিমানী গ্লিসারিন সাবান।

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার

নিয়মাবলী

1. পরিষদের বার্ষিক সভ্য-চাঁদা 19·00 টাকা ও পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষাণ্মাসিক সভ্য ও গ্রাহক চাঁদা যথাক্রমে 9·50 টাকা ও 9·00 টাকা। সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না। সভ্যগণকে প্রতিমাসে পত্রিকা প্রেরিত হয়ে থাকে।

2. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক ও সদস্যগণকে যথারীতি সাধারণ বুকপোষ্টযোগে পাঠানো হয়; মাসের 15 তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট আপিসের মন্তব্যসহ সঙ্গে সঙ্গে কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পরে জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরেও উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।

3. কোন সদস্যের চাঁদা 31শে মার্চের (1975) মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে জমা না পড়লে তিনি পরিষদের পরবর্তী বছরের (1975-'76) জন্য পরিষদের কোন কর্মাধ্যক্ষ পদে বা কার্যকরী সমিতির সদস্য পদে নির্বাচিত হতে বা নির্বাচন করতে পারবেন না।

4. টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 ফোন-55-0660 ঠিকানায় প্রেরিতব্য; ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

5. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।

6. প্রবন্ধাদির পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে অঙ্কিত কপি পাঠাতে হবে।

7. বানানে রেফের পরে দ্বিত্ব বর্জন বাঞ্ছনীয়; উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

8. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক মণ্ডলী অক্ষম।

9. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

10. চিঠি-পত্রে সর্বদা গ্রাহক বা সভ্য নম্বর উল্লেখ করবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি যথোপযুক্তভাবে রক্ষার জন্ত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্ত একান্ত প্রয়োজনীয় এই ভাষায় রচিত সচিত্র বিজ্ঞানকোষ প্রণয়ন, জনশিক্ষার উপযোগী বিজ্ঞান সংগ্রহশালা স্থাপন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্ত আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা তহবিল গঠন করা হইয়াছে; এই তহবিলে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। দেশের সহৃদয় সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণকে মুক্ত হস্তে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি-রক্ষা তহবিলে দান করিবার জন্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই তহবিলে দান পাঠাইবার ঠিকানা—কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6। ইতি

[বিঃ দ্রঃ—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে যে কোন দান আয়করমুক্ত।]

[Vide No. 11 (1)/703-b/v dated the 28th December 1959]

পরিমলকান্তি ঘোষ
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অষ্টাবিংশতিতম বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, 1975 | দ্বিতীয় সংখ্যা

রিয়্যাক্টর ও পশ্চিম বাংলা

সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যযোজনা পর্ষদ কেন্দ্রের কাছে এই রাজ্যের জন্যে একটি বিদ্যুৎ-জননকারী রিয়্যাক্টরের দাবী উপস্থাপিত করেছেন। সংবাদ-পত্রে প্রকাশ—এই দাবী কেন্দ্রের বিবেচনাধীন আছে। এই দাবীর পক্ষে যে সব অন্তরায় এখনও দূর হয়েছে বলে মনে হয় না, তার অন্যতম হলো—কয়লা খনির উৎস মুখ থেকে পশ্চিম বঙ্গে প্রস্তাবিত রিয়্যাক্টরের স্থান 200 কিলোমিটারের মত, তাই ভারতের দূরতম অঞ্চলে যেখানে কয়লা পরিবহন ব্যয়সাধ্য, তার দাবী উপেক্ষা করে পশ্চিম বঙ্গে বিদ্যুৎ-জননকারী রিয়্যাক্টর স্থাপন লাভজনক হবে না। দাবীর বিপক্ষে এই কারণ আপাতদৃষ্টিতে অসার মনে না হলেও কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ভারতীয় পরমাণু কমিশন বার বার হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লাভিত্তিক প্ল্যান্ট থেকে রিয়্যাক্টরে ইউনিটপিছু খরচ অনেক কম। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন প্রকাশিত 'যোজনা' পত্রিকার গত এক সংখ্যায় বর্তমান সময়ের স্ফীততর মূল্যমান ও পরিবহন ব্যয় ধরে পরমাণু শক্তি কমিশন একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কয়লাখনি থেকে দূরে বা কাছে কোন ক্ষেত্রেই রিয়্যাক্টর উৎপাদিত বিদ্যুৎ অলাভজনক হতে পারে না। তবে কয়লাখনি থেকে দূরতম স্থানে কয়লা পরিবহনে যে ব্যয় কিছু বেশী হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কয়লা সম্পর্কে আমাদের বাস্তব চিত্রটি একটু সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কয়লা উৎপাদনে বিহারের স্থান সর্বাগ্রে। তার পরে পশ্চিম বঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশের স্থান। ওড়িশা,

মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, আসাম প্রভৃতি রাজ্যেও কিছু কয়লা আছে। সব মিলে আমাদের ব্যবহার-যোগ্য কয়লার ভাণ্ডার 21365·40 মিলিয়ন টন (GSI News, এপ্রিল, 1971)। কয়লার ব্যবহার যে শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ নয়, ইস্পাত শিল্প, রেলওয়ে, সারশিল্প, সিমেন্ট, কাগজ কারখানা ইত্যাদি অনেক শিল্পই আজ কয়লার উপর নির্ভর-শীল। 1978-79-তে সম্ভাব্য কয়লার যে চাহিদা ধরা হয়েছে 135 মিলিয়ন টন, তার মধ্যে বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের জন্যে বরাদ্দ আছে মাত্র 43 মিলিয়ন টন অর্থাৎ সমস্ত চাহিদার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। আগামী 25 বছরে এই মোট চাহিদার পরিমাণ বাড়লে—তাই আমাদের আরও বেশী কয়লা প্রতি বছর খনি থেকে তুলতে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু কয়লার অবৈদ্যুতিক ব্যবহারের এই অনুপাতের ইতরবিশেষ হবে বলে মনে হয় না। কারণ কাগজ, সিমেন্ট সার এসবই আমাদের দেশে এখনও ঘাটতির তালিকায় আছে। কয়লার সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ এই শিল্প-গুলির জন্যে রেখে দিতে হবে। তাছাড়া অধুনা তেলের সঙ্কট আমাদের আর একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এখন আমরা বুঝতে পারি ডিজেল চালিত রেলইঞ্জিনের ব্যবহারের প্রসার করে আমরা দূরদৃষ্টির পরিচয় দেই নি। এখন কয়লা ইঞ্জিনের দিকেই মনোনিবেশ করতে হবে। এতেও কয়লার অবৈদ্যুতিক ব্যবহার বাড়বে। পরন্তু কয়লা থেকে তরল জ্বালানী তৈরী করাও একটি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, যা ভবিষ্যতে তৈল-সঙ্কট থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে জার্মেনী কয়লা থেকে তরল জ্বালানী উৎপাদন করেছিল, কিন্তু এই ব্যয়সাধ্য উৎপাদন পদ্ধতি পরবর্তীকালে কেউ কাজে লাগান নি। এখন প্রযুক্তিবিদ্যার যে অগ্রগতি হয়েছে, তাতে আরও কম খরচে কয়লা থেকে তরল জ্বালানী উৎপাদনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ সম্পর্কে গবেষণাও চলেছে। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে আমাদের কয়লার ভাণ্ডার খরচ করা উচিত। কয়লা আমাদের পর্যাপ্ত রয়েছে—আরও নতুন উৎস পাবার সম্ভাবনাও আছে। তাসত্ত্বেও কয়লার ব্যাপক-ক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা স্মরণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার সীমিত রাখতে হবে। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনও তো একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ, যার অভাবে আমাদের ক্ষেতেখামারে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ব্যাহত হবে। আগামী 25 বছরে আমাদের জনসংখ্যা স্ফীততর হবে। মাথাপিছু বছরে অন্তত: 500 ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারলে তবেই ভারত চলনসই মত একটি উন্নতিশীল দেশ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারবে। 2000 খৃষ্টাব্দে অন্তত: এই মানে আসা যে কোন উন্নতিশীল দেশের পক্ষে প্রয়োজন—এই হলো সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের অভিমত। সেক্ষেত্রে জল, জোয়ার যে কোন শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের আমরা চেষ্টা করি না কেন, কয়লার তুলনায় তা হবে অকিঞ্চিৎকর। তাই কয়লার উপরই আমাদের অনেকাংশে নির্ভর করতে হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে। আর একটি ভরসাস্থল ছিল পরমাণুশক্তি। কারণ আমাদের ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের ভাণ্ডার এ সম্পর্কে নতুন উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। ভারতীয় পরমাণু শক্তি কমিশনের পরিকল্পনা ছিল—1985 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমাদের স্বাভাবিক ইউরেনিয়াম থেকে রিয়্যাক্টর তৈরীর কাজ চলবে। তারপর আরম্ভ হবে দ্বিতীয় পর্যায় যাতে প্রথম পর্যায়ের রিয়্যাক্টর থেকে পাওয়া U-238 থেকে রূপান্তরিত প্লুটোনিয়াম জ্বালানী নিয়ে ফাষ্ট ব্রিডার রিয়্যাক্টর (FBR) তৈরী করা যাবে। এই সব রিয়্যাক্টরে থোরিয়ামের আবরণ রেখে যে U-233 নতুন জ্বালানী উৎপাদিত হবে, তাতে তৃতীয় পর্যায়ে নতুন রিয়্যাক্টর

প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা যাবে। কারণ আমাদের থোরিয়ামের মজুত ভাণ্ডার যথেষ্ট আছে। এই পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কোন গলদ নেই। কিন্তু প্রয়োগগত অসাফল্যের জন্যে ফাষ্ট ব্রিডার রিয়্যাক্টর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পৃথিবীর কোন দেশেই এখনও সাফল্য লাভ করেনি। অবশ্য বলা হচ্ছে আগামী 1985 খৃষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি এরকম রিয়্যাক্টর বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারবে। আমরাও যে একই সময়ে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আরম্ভ করতে পারবো তার স্থিরতা নেই। থোরিয়াম জ্বালানী নিয়েও একই সমস্যা রয়েছে। ফলে আগামী 25 বছর আমাদের পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে ইউরেনিয়ামের উপরই নির্ভর করতে হবে। পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্য অনুযায়ী আমাদের ভাণ্ডারে ব্যবহারযোগ্য যে ইউরেনিয়াম আছে, তাথেকে 6000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎপ্ল্যান্ট গড়া যেতে পারে। তাহলে পরমাণু শক্তি থেকে আমরা প্রত্যেকটি 400 মেগাওয়াটের মাত্র 15টি রিয়্যাক্টর আশা করতে পারি এই শতাব্দীতে। সমগ্র দেশের বিদ্যুতের চাহিদা বিবেচনা করলে এই সংখ্যা খুবই সামান্য। তাই কয়লাখনি থেকে দূরতম অঞ্চলগুলিতে বৈদ্যুতিক প্রয়োজনে কয়লা পরিবহন একান্তই অপরিহার্য। সেক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গে একটি কয়লাভিত্তিক বৈদ্যুতিক প্ল্যান্টে পরিবহনজনিত ব্যয়ের কতটুকু সাশ্রয় হবে তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। তাছাড়া 15টি বিদ্যুৎজননকারী রিয়্যাক্টর দিয়ে যে কয়লা পরিবহনের সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না, তা সহজেই বোঝা যায়। বরং রিয়্যাক্টরের মত একটি নূতন প্রযুক্তিবিস্তার সুফল থেকে পশ্চিম বাংলাকে বঞ্চিত করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। পরন্তু পশ্চিম বাংলা ঘনতম জনবসতিপূর্ণ রাজ্য। আগামী 25 বছরে এই ঘনত্ব আরো বাড়বে বই কমবে না। ফলে কয়লাভিত্তিক প্ল্যান্ট থেকে পরিবেশ দূষিত-করণের কুফল এই রাজ্যেই অধিকভাবে প্রকট হয়ে উঠবে। এসব বিবেচনা করলে এ রাজ্যে অন্ততঃ 50 : 50 অনুপাতে কয়লা ও পরমাণু শক্তির বৈদ্যুতিক প্ল্যান্ট হওয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে একটি রিয়্যাক্টরের দাবীর প্রতি কেন্দ্রের অনীহা কেন?

আমরা আশা করবো, পশ্চিম বাংলার এই দাবী অবহেলিত হবে না। আমরা আরও প্রস্তাব করবো—পশ্চিম বাংলায় এই একটি বিদ্যুৎজননকারী রিয়্যাক্টরের সঙ্গে এমন একটি গবেষণা কেন্দ্রও হওয়া উচিত—যাতে ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে থোরিয়াম রিয়্যাক্টরের পরিকল্পনা সফল করতে এই কেন্দ্রটি সাহায্য করতে পারে।

সূর্যেন্দুবিকাশ কর

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রসঙ্গে

শ্রীসুবোধনাথ বাগচী

আচার্য বসুর মৃত্যুবার্ষিক দিবস উপলক্ষে কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধু আমাকে অনুরোধ করেছেন আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে। ঢাকায়, কলিকাতায়, শান্তিনিকেতনে বার্লিনে ও প্যারিসে বহুক্ষণ ধরে, অনেক সময় দীর্ঘদিনের ব্যবধানে, তাঁকে একা পেয়েছিলাম এবং সেই সূত্রে অনেক কিছুরই আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, যার সবকিছুই জনসাধারণের নিকট পেশ করবার কোন সার্থকতা দেখতে পাই না। আমাদের দেশে মহৎ ব্যক্তিকে সচরাচর ভালমন্দ মেশানো মানুষ হিসেবে না দেখে, দেবতার মত পূজা করা হয়, কারণ এখানে মনুষ্যত্বের আদর্শ থেকে দেবতার মহিমাই বেশী আকর্ষণীয়। তার ফলে অত্যুক্তি এসে সত্যকার মহৎ মানুষটিকে খর্ব করে দেয়—অন্ততঃপক্ষে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিকট। অধ্যাপক বসুর জীবন-সংস্পর্শে এসে তাঁকে অনেক ভাবেই জেনেছি, যার মধ্যে অনেক কিছু আমার উপকারে এসেছে, আমাকে মুগ্ধ করেছে, বিস্মিত করেছে। আবার অনেক কিছুই উপলব্ধি করেছি যা আমি গ্রহণ করতে পারি নি এবং বুদ্ধিজীবীদের গ্রহণ করা উচিত নয় বলেই মনে করি। তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পেয়েছি, তা বস্তুতপক্ষে নিজের জন্যেই, দশের জন্যে নয়। তবুও দীর্ঘ দিন বাদে বেশ কিছু সময় দেশে বাস করবার ফলে দেশের যে পরিবর্তন দেখেছি, তাতে মনে হয়, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ব্যক্তিগত জীবনের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা সম্ভব হলে, হয়তো তা থেকে এটা বোঝা যাবে যে, আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মূল গলদ কোথায় এবং তা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে হয়তো তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও গড়ে তোলা খুব কঠিন হবে না।

ফেব্রুয়ারী 5, 1974। মন্ট্রিয়লে অফিস ঘরে বসে আছি, সকাল 10টা নাগাদ সেক্রেটারী ফোন করে জানালেন যে, ফেব্রুয়ারী 4 তারিখে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন। প্রথমে এই সংবাদটা বিশ্বাস করতে পারি নি। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় জানুয়ারী 17, 1974 তারিখে তাঁর বাড়ীতে। সেদিন বহুক্ষণ ধরে আমার সাম্প্রতিক গবেষণা এবং 1974-75 সালে ছুটিতে কলিকাতায় এসে আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য কিরূপে সাধিত হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়। 1. 10. 73 তারিখে চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন :

"I have read your recent paper in Acta Crystallographica with great interest. It seems to open out a new line of attack on the structure of liquids. I shall be ready to help you in all possible ways, if you decide to spend the period of leave and work out further development of your ideas here."

শেষবারের সাক্ষাতের সময় তিনি আমাকে আশ্বাস দেন যে, বর্তমানে হৈচৈ-এর মধ্যে ধীর-স্থির ভাবে আমার গবেষণা সম্পর্কে, বিশেষতঃ আমার কোয়ান্টামোত্তর তত্ত্বের গবেষণা সম্পর্কে,

কিছু করা সম্ভব হলো না। তবে আমি এক বছরের ছুটিতে কলিকাতায় এলে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করবেন। আমি অনেক উৎসাহ ও আশা নিয়ে জানুয়ারী (1974) মাসে কর্মস্থলে ফিরে যাই এবং তখন স্বপ্নেও ভাবি নি যে, এত শীঘ্র আমরা তাঁকে হারাবো। এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদের পর সন্দিহান হয়ে পড়েছিলাম যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এক বছর কলিকাতায় বাস করে কোন উচ্চাঙ্গের গবেষণার উদ্দেশ্য সাধিত হবে কিনা। তবুও অনেক আশা নিয়ে দেশে এসেছিলাম।

এখানে আসার স্বল্পকাল পরেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম যে, আমার সন্দেহ অমূলক নয়। মহান আচার্যের উপস্থিতিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে কতটা পরিবর্তন করতে সক্ষম, তা যাঁরা এরূপ মহৎ ব্যক্তির নিবিড় সম্পর্কে এসেছেন তাঁরাই সঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন।

এই শতাব্দীর অনেক বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার সংযোগ হয়েছে। বিগত 25 বছরের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎ পরিচয়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করতে পারি যে, বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় ও জ্ঞানে এই শতাব্দীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্থান। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি আরো বড় ছিলেন। তাঁর প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল তিনি উচ্চমানের বিজ্ঞানী বা জ্ঞানী-পণ্ডিত ছিলেন বলে নয়—তাঁর এই চারিত্রিক মাহাত্ম্যের জন্যেই।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বৈজ্ঞানিক কার্যের সমীক্ষা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু সংখ্যায় (জুলাই-অগাষ্ট 1974) এবং 'Science & Culture'-এর Bose Number-এ (জুলাই, 1974)। তবুও আমার মনে হয় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের (Z.Phys 26, 178, 1924) সূক্ষ্ম তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক মূল্য এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানী মহলেও উপলব্ধ হয় নি। তার ফলে বিজ্ঞান ইতিহাসের পুস্তকে তাঁর নাম পাওয়া যায় না বা গৌণ-ভাবে উল্লেখিত হয়। ভারতের বিজ্ঞান-ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিজ্ঞানের অনেক মূল্যবান, উচ্চাঙ্গ ও বিভিন্ন শাস্ত্রে ফলপ্রসূ গবেষণা এদেশে হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানজগতে সম্পূর্ণ নতুন ভাবধারা এবং প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বিরূপাচারী, অথচ সার্থক চিন্তাধারা ও পদ্ধতি খুব কমই সর্বাগ্রে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয়েছে। গত 150 বছরের ভারতবর্ষে এরূপ অভিনব চিন্তাধারা বিজ্ঞানজগতে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসুই এনেছেন।

বিশ্বের বিজ্ঞানজগতে সত্যেন্দ্রনাথ বসু উপরি-উক্ত প্রবন্ধের জন্যেই খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্ব মৌলিক কণার পদার্থবিদ্যায় প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই। তাঁর গবেষণার ঐতিহাসিক মূল্য এই যে, বিজ্ঞানের ইতিহাসের সন্ধিস্থলে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলো যে, শক্তি-প্রবাহের মধ্যে কণা ও তরঙ্গধর্ম যুগপৎ নিহিত আছে। প্রায় একই সময়ে লুই দে ব্রগলি (L. De Brogli) দেখালেন যে, কণাপ্রবাহের মধ্যেও তরঙ্গধর্মের প্রকাশ পায়। সুতরাং 1924 সালেই প্রমাণ হয়ে গেল যে, যে কোন বস্তুর মধ্যেই উভয় ধর্ম প্রকাশ পাচ্ছে। সনাতনী পদার্থবিদ্যার কণা ও তরঙ্গ যে বিপরীত ও পরস্পরের অসামঞ্জস্য গুণের পরিচয় দেয়, তা গভীর-তর স্তরে ঠিক নয়। বস্তুর স্বভাবই এই দ্বৈত ধর্ম। প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম ও আইনস্টাইনের ফোটন কণার ধর্ম বুঝতে হলে আমাদের নতুন পদার্থবিদ্যা সৃষ্টি করতে হবে, সনাতনী কণা ও তরঙ্গের ধারণা পাল্টাতে হবে। অচিরেই যে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়েছিল, সে কথা আজ সব বিজ্ঞানীই জানেন। কিন্তু এটা অনেকেই ভেবে দেখেন না যে, তার প্রেরণা এসেছিল দে ব্রগলি ও বোসের বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে।

বোস দেখালেন যে প্লাঙ্কের সূত্র পেতে গেলে ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুচ্চুম্বক তরঙ্গবাদ গ্রহণ করবার প্রয়োজন নেই। সুতরাং প্রায় সবারই একটা ধারণা আছে যে, শুধুমাত্র কণাধর্ম নিয়েই বোস প্লাঙ্কের সূত্রের পুনরাবিষ্কার করেন। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যদিও তিনি ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গবাদ উপেক্ষা করেই প্লাঙ্কের সূত্র পান, তবুও তরঙ্গের স্বভাব, (Polarisation প্রত্যয়ের মাধ্যমে) তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল phase-cell-এর সংখ্যা নির্ণয় করতে। অতএব, তাঁর প্রকল্পিত অভিনব সংখ্যায়নের মূলে শুধু কণাধর্ম নয়, তরঙ্গধর্মও রয়েছে। এই তথ্যটি তাঁর প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত না থাকলেও, পরবর্তী গবেষকদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল।

আমার মনে হয়, কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের গভীর তাৎপর্য কি, কেন বাস্তব জগতে মাত্র দু-রকমের সংখ্যায়ন পাওয়া যায়, ইত্যাদি নানা নিগূঢ় প্রশ্নের উত্তর আমরা এখনও জানি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যতদিন পর্যন্ত না আমরা এই বস্তুর এই দ্বৈত ধর্মের পারস্পরিক যুগপৎ অস্তিত্ব স্বীকার করবো, এই দ্বৈত ধর্মের অন্তরালে বস্তুর যে অদ্বৈত ধর্ম আছে, তা উদ্ঘাটন করতে পারবোনা, ততদিন পর্যন্ত এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না এবং এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করবে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধের (Z. Phys 27, 384, 1924) যথার্থ সমীক্ষা।

এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বিজ্ঞানজগতে এপর্যন্ত উপেক্ষিত হয়েছে। অধ্যাপক বসু মনে করতেন যে, এই প্রবন্ধটির যথার্থ মূল্যায়ন এখনও হয় নি। সম্প্রতি (16 ডিসেম্বর, 1974) কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইনস্টিটিউটে এই প্রবন্ধের উপর একটি সেমিনার হয়। সেখানে আমি এই প্রবন্ধটির যথার্থ গুরুত্ব কোথায়, তা দেখাবার চেষ্টা করেছি। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই সব আলোচনার কূট বিচার এখানে করা সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে এই প্রবন্ধটির বিশেষ মূল্য নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়:

পরমাণু ও বিকিরণের সাম্যাবস্থা কোন্ বিশেষ প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সে সম্পর্কে কোন বিশেষ প্রকল্পের অবতারণা না করেই, সাম্যাবস্থায় পরমাণু ও বিকিরণের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকবে, তা স্থির করা যায়। এই সাধারণ সম্পর্ক থেকে বিশেষ বিশেষ কার্যকারণ প্রণালী মেনে নিয়ে যে সব সমীকরণ আসে, তাও পাওয়া যায়। সুতরাং বসুর পদ্ধতিতে পাওয়া ফল সাধারণভাবেই সত্য হওয়া উচিত। আইনস্টাইনও এ কথা মেনে নিয়েছেন। আইনস্টাইনের প্রধান আপত্তি ছিল বসুর প্রকল্পে, যথা পরমাণুটি উপরের শক্তিস্তর থেকে নিম্নস্তরে আসবার সম্ভাবনায় বিকিরণের প্রভাব নেই। বর্তমানে এটা প্রমাণ হয়েছে যে, এই বিষয়ে আইনস্টাইনের মতই সত্য। এই আপত্তির যথার্থতা অধ্যাপক বসুও মেনে নিয়েছিলেন। বোধ হয় আইনস্টাইনের নভেম্বর 3, 1924 তারিখের পত্র (যার পাত্তা এখনও পাওয়া যায় নি) পাবার পরই অধ্যাপক বসু তাঁর প্রবন্ধে প্রকাশিত মত পরিবর্তন করেন। আইনস্টাইনকে লিখিত অধ্যাপক বসুর তৃতীয় পত্র (জানুয়ারী 27, 1925) থেকে এটা বেশ পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, খুব সাধারণ প্রকল্প থেকে যে সমীকরণ তিনি পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে পরীক্ষিত ফলের সামঞ্জস্য কিরূপে আনা সম্ভব। আমার মনে হয়, তা সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা মেনে নেব যে, তাঁর সাধারণ প্রকল্পই অসম্পূর্ণ। বিকিরণের বন্টন ব্যবস্থা (Distribution) পরমাণুর বন্টনাবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়।

পরমাণু ও বিকিরণের সাম্যাবস্থা নির্ভর করবে উভয়ের প্রতিক্রিয়ার (Interaction) উপর। যাই হোক, এটা মনে হয় যে, তাঁর মূল পদ্ধতির অনুকরণে একটা সমীকরণ পাওয়া যাবে, যা পরীক্ষিত ফলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হবে। মোট কথা, এই প্রবন্ধের উপর আরও অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন আছে।

আইনস্টাইনকে লিখিত বসুর তৃতীয় পত্রে আরও দুটি গভীর সমস্যার উল্লেখ আছে, যে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার মনে হয়, তিনি যে সব গভীর সমস্যার উল্লেখ করেছেন তার সমাধান করতে হলে প্রয়োজন হবে কোয়ান্টামোত্তর তত্ত্ব সৃষ্টি করা। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইনস্টিটিউট দ্বিতীয় প্রবন্ধের উপর সেমিনার করে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এ দিকে এনেছেন এবং আমার বিশ্বাস যদি এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান সেমিনারের জের টেনে অধ্যাপক বসু উল্লেখিত প্রশ্নগুলির সমাধানের জন্যে গবেষণার যথোচিত ব্যবস্থা করেন, তবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক অবদান বিজ্ঞানের ইতিহাসে আরও বর্ধিত হবে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার লুপ্ত গৌরবের কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

অধ্যাপক বসুর সৃজনীশক্তিসম্পন্ন প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক অবদানের গুরুত্ব উপরে যা বলা হলো তা থেকেই বোঝা যাবে। তাঁর বৈজ্ঞানিক অন্যান্য প্রবন্ধে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। উপরন্ত, যাঁরা আচার্য বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই তাঁর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু অনেকেই চিন্তা করে দেখেন না যে, 'পাণ্ডিত্য' ও জ্ঞানের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে।

আমাদের দেশে ঐতিহাসিক কারণবশতঃ মধ্যযুগীয় Scholastic মনোভাব এখনও বিদ্যমান। তাই অনেক সময় সৃজনীশক্তিমূলক প্রতিভার চেয়ে 'পাণ্ডিত্যের' দাম বেশী দেওয়া হয়। এর ফলে বিভিন্ন মনীষীদের উক্তির চর্বিতচর্বন উদ্গার করেই অনেকে নিজের পাণ্ডিত্যের ও মহিমার পরিচয় দিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সত্যকার জ্ঞানী-পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায় না। পূর্বতনদের উক্তি বা মতবাদের গভীর তত্ত্বকথাটি, সারমর্মটি নিজস্ব উপলব্ধির সঙ্গে যাচাই করে প্রকাশ পায় সহজভাবেই। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের রচনার ভিতর। বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যায় এরূপ জ্ঞানী-পণ্ডিতের কথা উঠলে সর্বাগ্রে মনে পড়ে সমারফেল্ড (A. Sommerfeld), ফন লাউয়ে (M. von Laue), বরন্ (M. Born) ও পাউলির (W. Pauli Jr) নাম। এঁরা শুধু সৃজনীশক্তিসম্পন্ন গবেষণাই করেন নি, এঁদের প্রতিভার ও পাণ্ডিত্যের সাহায্যে গভীর ও নূতন বিপ্লবী গবেষণার সৃষ্টি হয়েছে। সত্যেন বসুর প্রতিভা ও জ্ঞান ছিল সৃজনীশক্তিমূলক। বিভিন্ন বিষয়ে, (যদিও অনেক খুঁটিনাটি খবর তিনি রাখতেন না), তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। সত্যেন বসুকে তাই 'পণ্ডিত' না বলে জ্ঞানী-পণ্ডিত বলাই উচিত।

অনেকেই উপলব্ধি করেছেন যে, আইনস্টাইনের অসামান্য সৃজনীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভা ছাড়াও, আরও একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, যা যে কোন কালেরই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অন্যের গবেষণার অন্তর্নিহিত গূঢ় সত্য এবং বিভিন্ন তত্ত্বের (অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে অসামঞ্জস্য) সম্পর্কটা আইনস্টাইনের নিকটই প্রথম উদ্ভাসিত হতো, যা তত্ত্বের সৃষ্টিকর্তাদেরও দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। বোস সংখ্যায়ন ও দে ব্রগ্‌লির গবেষণার যথার্থ মর্ম ও পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বপ্রথম আইনস্টাইনের নিকটই ধরা পড়ে, একথা আজ সাধারণ বিজ্ঞানীরাও

জানেন। সত্যেন বসুর প্রতিভারও খানিকটা অনুরূপ বিশেষত্ব ছিল। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া এ স্থলে অসঙ্গত নয় বলেই মনে করি। কারণ তা থেকে অধ্যাপক বসুর প্রতিভার, পাণ্ডিত্যের ও আচার্যসুলভ মান সহজেই প্রকট হবে।

হোসেমান ও বাগচীর প্রবর্তিত কোয়াণ্টা-মোত্তর তত্ত্বের অঙ্কুর সৃষ্টি হয় 1953 সালের গোড়ায়। ঐ সম্পর্কে তিনখানি প্রবন্ধ পড়েছিল অধ্যাপক লাউয়ের দেরাজে বেশ কিছু দিন, কারণ তিনি দু-একটি কূট প্রশ্ন তুলেছিলেন, যার সদুত্তর তিনিও দিতে পারেন নি—আমরাও দিতে পারি নি। আমাদের মতানৈক্যের সমাধান না হওয়াতে প্রবন্ধগুলি প্রকাশনের বাধা সৃষ্টি হয়। 1954 সালের প্রারম্ভে আমি দু-মাসের জন্যে কলিকাতায় আসি এবং অধ্যাপক বসুকে আমাদের সঙ্কটের কথা জ্ঞাপন করি। প্রশ্নটির গুরুত্ব অনুভব করে, অল্প কয়দিনের চেষ্টাতেই ডক্টর সুধাংশু দত্তমজুমদারের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, অধ্যাপক লাউয়ের মতই ঠিক। তার ফলে আমাদের তত্ত্বকে সঙ্গতিপূর্ণ করবার জন্যে আমাদেরকে generalized 4-momentum ও kinetic 4-momenturm-এর নতুন সংজ্ঞা দিতে হয় এবং বস্তুর ভর যে তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তরঙ্গের amplitude-এর উপর নির্ভর করবে—এরূপ প্রকল্প করতে হয়। এবার অবশ্য অধ্যাপক লাউয়ে ঐ তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশের অনুমতি দিলেন। তবুও বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুভব করে, বিশেষতঃ যখন এই প্রবন্ধগুলি বর্তমানে সর্ববিজ্ঞানীগ্রাহ্য মতবাদের বিরূপাচারী ছিল এবং আইনস্টাইন-দে ব্রগ্‌লির মতবাদের সপক্ষে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার কষ্টিপাথরে যাচাই করা প্রমাণ উপস্থিত করেছিল—অধ্যাপক লাউয়ে প্রবন্ধগুলি আইনস্টাইন ও দে ব্রগ্‌লির নিকট তাঁদের মতামতের জন্যে প্রেরণ করেন। দে ব্রগ্‌লি আমাদের উৎসাহ দিয়ে জানালেন যে, অনুরূপ তরের সংজ্ঞা তিনি 1927 সালেই দিয়েছিলেন। আইনস্টাইন কিন্তু শুধু উৎসাহই দিলেন না, উপরন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করলেন, যার যথার্থ মর্ম আমি উত্তরকালে সঠিক বুঝেছিলাম। প্রথমতঃ তিনি প্রশংসা করলেন আমাদের generalized 4-momentum-এর সংজ্ঞার জন্যে। আইনস্টাইনের মতে এই সমীকরণটি বেশ একটু অদ্ভুত যেন "ডাইনির দিদিমার হেঁসেল থেকে উদ্ভূত হয়েছে।" প্রায় একযুগ পরে এই সমীকরণের আশ্চর্য ক্ষমতা পেয়েছিলাম তৎকালীন তত্ত্বটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে। আইনস্টাইন আরও একটা মন্তব্য করলেন যে, আমাদের pilot wave তত্ত্ব যদি সত্য হয়, (তিনি pilot wave-এর মূল ধারণাটা যে সত্য এটা বিশ্বাস করতেন) তবে বর্তমানে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের মূলে যে Superposition principle রয়েছে, তা ত্যাগ করতে হবে এবং চলমান তরঙ্গের দ্বারাই কণার গতি ও পথ নির্দিষ্ট হবে। অবশ্য তখন আমরা আইনস্টাইনের উক্তির মর্মকথা উপলব্ধি করতে পারি নি, কারণ আমরা আমাদের তত্ত্ব থেকে বিখ্যাত শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ পেয়েছিলাম। কিন্তু 1956 সালে এই তত্ত্বকে হাইড্রোজেন পরমাণুতে প্রযোগ করতে গিয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছুলাম (Z. Phys. 145, 65, 1956), তা থেকে আর কোন সন্দেহ থাকলো না যে, আইনস্টাইনের উক্তি কতটা সত্য এবং আবার বিস্মিত হলাম আইনস্টাইনের প্রখর অন্তর্দৃষ্টি অনুভব করে। উপরন্তু এই প্রবন্ধে আরও প্রমাণ হলো—কেন শ্রোয়েডিঙ্গার তত্ত্ব থেকে আমরা শুধু সম্ভাব্যবাদের সাহায্যেই পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারি। সুতরাং আমাদের এই গবেষণা থেকে আইনস্টানের মতের, (যথা বর্তমান কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব শুধু গড় হিসেবেই সত্য) আরও একটা

দৃঢ় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গেল। এখানে আমাদের এই গবেষণার উল্লেখের কারণ—আইনস্টাইনের প্রখর অন্তর্দৃষ্টির আরও একটা (এপর্যন্ত অপ্রকাশিত) উদাহরণ এথেকে পাওয়া যাবে এবং মহান আচার্যদের ব্যবহার কিরূপ হয় তারও দৃষ্টান্ত মিলবে। উপরন্তু অধ্যাপক বসুর সৃজনশক্তিমূলক পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও পাওয়া যাবে। অধ্যাপক বসু আমাদের এই তত্ত্বের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন করেছিলেন, যা মূল প্রবন্ধে উল্লেখিত আছে। এই নতুন তত্ত্ব এগিয়ে নিতে হলে গণিত ও পদার্থবিস্তার অনেক কূট ও অজানা সমস্যার সমাধান করতে হবে। শেষ সাক্ষাতের সময় অধ্যাপক বসু আমাকে খুবই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আমি কলিকাতায় ছুটিতে এলে তিনি আমার সঙ্গে বসে এই তত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনা করবেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে আমার বিশেষ আক্ষেপ যে, অদৃষ্টের চক্রান্তে আমি তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলাম।

এই প্রসঙ্গে সৃজনীশক্তিমূলক গবেষণায় অধ্যাপক বসুর মহান আচার্যসুলভ গুণের আরও দু-চারটে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। অধিকন্তু তা থেকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে।

তীব্র ইলেক্ট্রোলাইটের (Strong electrolytes) সমস্যায় অধ্যাপক বসুর ঔৎসুক্য ছিল তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের এই সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সময় থেকেই (1917)। ডেবায়ের (P. P. Debye) গবেষণার পর (1924) সবাই মেনে নিয়েছিলেন যে, তীব্র ইলেক্ট্রোলাইটের মূল সমস্যার মোটামুটি সমাধান হয়েছে, যদিও এই তত্ত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে তেমন কোন সুফল দেয় না। প্রায় 25 বছর বিখ্যাত বিশেষজ্ঞেরা গবেষণা করেছেন এই তত্ত্বকে বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকরী করবার প্রচেষ্টায়। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। পরিশেষে Onsager, Kirkwood, Fowler এবং অন্যান্য বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ডেবায়ের তত্ত্ব ঘন-দ্রবণের (Concentrated solution) ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে। 1948 সালে আমি দেখাই যে, ডেবায়ের প্রবর্তিত Boltzmann বন্টনের পরিবর্তে নতুন রকম বন্টন প্রকল্প গ্রহণ করলে ডেবায়ের তত্ত্বকে ঘন-দ্রবণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। এই সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ Journal of Indian Chemical Society-তে প্রেরণ করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের (সৌভাগ্যের ?) বিষয় যে, যেহেতু আমার গবেষণা ডেবায়ে তত্ত্বের বিরূপাচারী ছিল, তাই প্রবন্ধগুলি প্রকাশনের বাধা হয়, তার মধ্যে কোন গলদ না থাকা সত্ত্বেও। আমি তখন অধ্যাপক বসুকে অনুরোধ করি আমার গবেষণাটা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, তা ভাল করে বিচার করতে। তিনি কয়েক দিন বেশ গভীরভাবে আমার প্রবন্ধ দুটি পরীক্ষা করলেন। একদিন কিছু অঙ্ক কষবার পর হঠাৎ আমাকে বললেন—'যা বেঁচে গেছিস্'। আজও জানি না—তিনি কিরূপে আমার প্রবন্ধ সঙ্গতি পূর্ণ কিনা, তা বিচার করলেন। যাই হোক, তাঁর সম্মতি পাবার পর প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি আরও বললেন :

আমার প্রকল্পিত বন্টনকে Statistical mechanics-এর সাহায্যে প্রমাণ করা সম্ভব এবং এ সম্পর্কে ডক্টর মহাদেব দত্ত তাঁর তত্ত্বাবধানে যে কাজ করেছেন, তার উল্লেখ করলেন। তিনি ডক্টর দত্ত ও আমাকে নির্দেশ দিলেন একযোগে কাজ করতে। অধ্যাপক বসুর ধারণা যে ঠিক, তা অচিরেই দত্ত ও বাগচীর প্রবন্ধে প্রমাণ হলো। আমার পূর্ব প্রকল্পিত বন্টনের অনুরূপ একটি নতুন বন্টন পাওয়া গেল ডক্টর দত্তের Statistical Mechanics-এ গবেষণার ভিত্তিতে। পঞ্চাশ দশকে এই নতুন বন্টন নিয়ে জগতের বিভিন্ন গবেষণাগারে

ফলপ্রসূ কাজ হয়েছে এবং তার ফলাফল অনেক গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে। তবুও বিশেষজ্ঞ মহলে Onsager-এর মত (যথা ডেবায়ের মূল পদ্ধতিটাই সাধারণভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ) টিকে থাকলো বহু প্রামাণ্য গ্রন্থে। অবশেষে 1973 সালে আমি প্রমাণ করি যে, Onsager-এর মত ভুল। ডেবায়ের মূল পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য, যদিও ডেবায়ের আদি তত্ত্বটি অসঙ্গতিপূর্ণ; কিন্তু দত্ত-বাগচী প্রবর্তিত নতুন বণ্টন ব্যবস্থার সাহায্যে পরিবর্তিত ডেবায়ে তত্ত্বটি সঙ্গতিপূর্ণ, যদিও কিছুটা অসম্পূর্ণ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম এই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি বোস সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে যে বিশ্ব সম্মেলন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, তাতেই প্রথম বিজ্ঞানীদের নিকট পরিবেশন করতে সক্ষম হওয়ায়। অধ্যাপক বসুও এই প্রবন্ধটিতে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন এবং এর থেকে উদ্ভূত নতুন তত্ত্বকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার জন্যে তিনি আমাকে জাতীয় অধ্যাপকের একটি গবেষক ছাত্র দিতে উৎসুক ছিলেন। বিদেশে আমি প্রচার করে থাকি যে, তীব্র ইলেক্ট্রোলাইটের কাজটা কলিকাতা স্কুলের এবং যেহেতু নানা কারণে এই নতুন তত্ত্বকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, এই কাজটি কলিকাতার গবেষক ছাত্রেরা গ্রহণ করবেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই পরিকল্পনা অধ্যাপক বসুর অভাবে বাস্তবে কার্যকরী করা সম্ভব হলো না, যদিও এই কাজে হাত দিলে বিজ্ঞান কলেজের নাম বিদেশে ছড়িয়ে পড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

অধ্যাপক বসুর আরও একটা আচার্যসুলভ গুণের উল্লেখ এখানে উপস্থিত করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। 1953 সালে হোসেমান ও বাগচী দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, "On the Algebra of Physically Observable Functions"। এই প্রবন্ধে গণিতের সংজ্ঞায় Functions-এর সঙ্গে গবেষণাগারে পাওয়া Functions-এর কি সম্পর্ক তা নিয়ে বিচার করা হয়। অধ্যাপক লাউয়ে এই প্রবন্ধ দুটির খুব প্রশংসা করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে এর থেকেই আমাদের প্রেরণা আসে কোয়ান্টাম-তত্ত্বের তত্ত্ব গড়বার ও প্লাঙ্কের ধ্রুব h-এর যথার্থ অর্থ কি, তা বুঝবার প্রচেষ্টা। আমার বিশিষ্ট বন্ধু স্বর্গীয় অধ্যাপক ডিন্‌ঘাসও (A. Dinghas), প্রখ্যাত গাণিতিক ও বার্লিন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ) খুব খুশী হয়েছিলেন এই কাজে। কারণ এর ফলে differentiation পদ্ধতিকে integration পদ্ধতির সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। একদিন পরিহাস করে তিনি আমাকে বলেন: "এবার আমি তত্ত্বীয় পদার্থ-বিদ্‌দের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে প্রস্তুত। কারণ পদার্থবিদ্যায় differentiation পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়।" তিনি আরও এই মত প্রকাশ করেন যে, আমাদের গবেষণার সঙ্গে Schwartz-এর distribution theory-র সম্পর্ক বোধ হয় আছে এবং এ নিয়ে আমাকে গবেষণা করতে অনুরোধ করেন, যাতে আমাদের ভাবধারা গাণিতিক মহলেও ফলপ্রসূ হয়। অন্যান্য কার্যে ব্যস্ত থাকায় আমাদের এই কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। 1958 সালে কলিকাতায় ফিরে এসে আমি অধ্যাপক বসুকে এ সম্পর্কে তাঁর ছাত্রদের দিয়ে অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করি। তিনি তখন গণিতশাস্ত্রে ও distribution theory-তে সুপণ্ডিত শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষকে (বর্তমানে কালত গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ) অনুরোধ করেন এই বিষয়বস্তুটা নিয়ে আলোচনা করতে। তার ফলে অচিরেই ঘোষ প্রমাণ করেন যে, অধ্যাপক ডিন্‌ঘাসের অনুমানটা ঠিকই। আমাদের তত্ত্বটা Schwartz-Temple generalised function তত্ত্বের সমার্থক। এই মতটি এখন গণিতশাস্ত্রের পুস্তকে গৃহীত হয়েছে। ঐতিহাসিক মূল্যায়নের জন্যে এটা বলা দরকার

যে, আমাদের গবেষণা Temple-এর কাজের পূর্বেই হয় এবং অন্যত্র আমি দেখিয়েছি যে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অনেক ক্ষেত্রে Algebra of Physically Observable Functions বেশী কার্যকর হবে generalised functions-এর গণিতের থেকে। অধ্যাপক বসুর সাহায্য ব্যতীত খুব সম্ভবতঃ একাজটি নিষ্ফল হয়ে শুধু পত্রিকার পাতায় বিরাজ করতো।

অধ্যাপক লাউয়ের তত্ত্বাবধানে হোসেমান ও আমার প্রধান কর্তব্য ছিল Unified Kinematic Diffraction Theory গড়ে তোলা। এই গবেষণা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনেছে X-ray structure analysis-এ এবং Kirchoff-এর আমল থেকে শতবর্ষব্যাপী চালু একটা স্বতঃসিদ্ধ (যথা intensity থেকে সরাসরি অন্য কিছুর, বিশেষতঃ Phase-এর সাহায্য না নিয়ে পদার্থের গঠন নির্ণয় করা সম্ভব নয়) যে, সব সময় ঠিক নয়, তার প্রমাণ হাজির করেছে। আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে যে পুস্তক (Monograph) এ বিষয়ে লেখা হয়, তা বিশেষজ্ঞ মহলে সুপরিচিত এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এই পুস্তকটি "a standard work in the field for some time to come", "an important source work", ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়। কিন্তু আমাদের পুস্তক প্রকাশনের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদের যাতে এই নতুন তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, তার জন্যে 1954 সালে আমার স্বল্পকালস্থায়ী কলিকাতায় অবস্থানের মধ্যেই অধ্যাপক বসু বিজ্ঞান কলেজে এই তত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার সুযোগ দেন আমাকে B. B. Roy Memorial Lecturer করে। এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করে জগতের বিভিন্ন গবেষণাগারে পলিমার, তরল পদার্থ, জৈব পদার্থের গঠন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। অথচ দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞদের এ সম্পর্কে কাজ করতে কোন উৎসাহ দেখা যায় না।

এই গবেষণায় যদিও অধ্যাপক বসুর প্রত্যক্ষ কোন দান ছিল না, তবুও এই গবেষণার প্রেরণা আমি পেয়েছিলাম যখন আমি তাঁর ঢাকা গবেষণাগারে রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে মৃত্তিকার কেলাস সংগঠন নিয়ে অনুসন্ধান করি। সেই সময় লক্ষ্য করি অধ্যাপক বসু কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যার বিচার করেন, তার সমাধানের জন্যে কি মূল নীতির সাহায্যে অগ্রসর হন। কার্যকরী ফলাফলের উপর নির্ভর না করেই, শুধু বিষয়বস্তু গভীরভাবে বোঝবার প্রয়াসেই অধ্যবসায়সহকারে যে অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি করতেন, তা আমাকে বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত করে। ঢাকা থাকাকালীনই আমার ধারণা হয় যে, তরল পদার্থের রঞ্জেন রশ্মির বিশ্লেষণের উপযুক্ত তত্ত্ব নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে (1946-49) এই বিষয়ে আমি experimental গবেষণা করবার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে 1949 সালে অক্টোবর মাসে যুরোপে যাই উপযুক্ত তত্ত্ব গড়বার জন্যে তরল পদার্থের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তার গঠন কিরূপ, তা experimental গবেষণার সাহায্যে জানতে। 1951 সালের মধ্যভাগে আমি গ্যটিঙ্গেনে (Goettingen) যাই জার্মেনীর তদানীন্তন ভৌত রসায়নের নেতা বনহোফারের (K. Bonhoeffer) নিমন্ত্রণে আমার তীব্র ইলেক্ট্রোলাইটের গবেষণা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে। এই সুযোগে গ্যটিঙ্গেনের অনেক বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় এবং হাইসেনবার্গ ও ফন লাউয়ের সঙ্গেও বহুক্ষণব্যাপী আলাপ-আলোচনা হয়। প্রায় সবাই প্রথমেই প্রশ্ন করেন বোস ও রামন বর্তমানে কি কার্যে ব্যস্ত এবং স্বাধীনোত্তর ভারতেও রামানুজনের মত গাণিতিক, বোস ও রামনের মত পদার্থবিদ্ সৃষ্টি হচ্ছে না কেন—তাই জানতে তাঁরা উৎসুক।

এই তিনজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর কথাই বিদেশী বিজ্ঞানীদের সর্বাগ্রে মনে পড়ে। এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য বিদেশী বিজ্ঞানীদের প্রশ্নের উত্তর দেশবাসীর নিকট উত্থাপিত করা।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেশের এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানের নেতাদের নিকট উপস্থিত করতে চাই।

(ক) আমার বক্তৃতার অনতিকালে পরেই Eigen ও Wicke তাঁর ইলেক্ট্রোলাইটের উপর একটি মূল্যবান গবেষণা করেন যার সারমর্মটা ইতিপূর্বে প্রকাশিত দত্ত-বাগচীর প্রবন্ধেই নিহিত ছিল। এই সূত্রে বন্‌হোফারের সঙ্গে আমার কয়েকবার আলাপ-আলোচনা হয়। বন্‌হোফারের গবেষণাগারে তখন বহু উদীয়মান তরুণ বিজ্ঞানী কাজ করতো। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন বিজ্ঞানীমহলে পরিচিত। কিন্তু তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন তরুণ আইগেনের কথা। তাঁর মতে আইগেন ছিল সবচেয়ে মেধাবী এবং দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, আইগেনের আমেরিকা যাবার ইচ্ছে হয়েছে, কারণ তদানীন্তন পশ্চিম জার্মেনীতে সে বিশেষ সুযোগ পাচ্ছে না এবং বনহোফার চেষ্টা করছেন এই তরুণকে তাঁর গবেষণাগারে রাখতে। প্রায় এক যুগ পরে হঠাৎ একদিন কাগজে দেখলাম যে, আইগেন তাঁর গবেষণাগারে কাজ করেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তখন শ্রদ্ধায় এই মহান আচার্যের স্মরণ করলাম এবং ক্ষোভ হলো যে, আমাদের দেশে এরূপ আচার্যের সাক্ষাৎ মেলে না বলে।

(খ) আমার তরল পদার্থ সম্পর্কে গবেষণার প্ল্যান শুনে নিজে থেকেই লাউয়ে বলেন যে, তিনি শীঘ্রই বার্লিনে Fritz Haber-এর Institute-এর অধ্যক্ষ হয়ে যাচ্ছেন এবং হোসেমান তাঁর সহকারী (Scientific Assistant) হয়ে এই সম্পর্কে গবেষণা করবেন। তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, আমি তাঁর গবেষণাগারে হোসেমানের সঙ্গে একযোগে এই বিষয়ে গবেষণা করি এবং তজ্জন্য তিনি আমাকে তাঁর সহকর্মী (Scientific Collaborator) করবেন। অযাচিতভাবে এই প্রস্তাব আসাতে আমি বিস্মিত হই, কারণ কখনও ভাবি নি যে, X-ray structure analysis-এর জন্মদাতা ও বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ম্যাক্স ফন লাউয়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করবার সুযোগ পাব, বিশেষতঃ তখন আমার ইলেক্ট্রোলাইটের গবেষণা সম্পর্কে তিনি অবহিতছিলেন না এবং আমার কাছে কোন সার্টিফিকেটও ছিল না। তখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার ছুটি পাবার অসুবিধার কথা উল্লেখ করি। তিনি আমাকে বার্লিনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। 1951 সালের অক্টোবর মাসে আমি তাঁর গবেষণাগারে যোগদান করি। 19.2.53 তারিখে তিনি নিজে থেকেই অধ্যাপক বসুকে আমার ছুটি মঞ্জুরের জন্যে এই মর্মে লেখেন:

"Dr. Hosemann and Dr. Bagchi are in the midst of investigations of the greatest consequence and significance not merely for the analysis of crystal structures. It would be a great loss not only for the two persons mentioned, but what is more important for the Science if they must separate now. (জার্মান থেকে অনূদিত, কথাগুলি আমিই underline করেছি।)

উপরের ছুটি দৃষ্টান্ত আমি দিলাম বিশেষ ভাবে আমাদের দেশের বিজ্ঞানের কর্ণধারদের জানাবার জন্যে যে, উচ্চমানের বিজ্ঞানী ও আচার্যেরা স্বভাবতঃই কিরূপ আচরণ করেন। তার জন্যে প্রার্থনার প্রয়োজন হয় না, কোন নীতি বা কর্তব্যের দোহাই দিতে হয় না। আর এটা মনে রাখা ভাল যে, তাঁরা এইরূপ

উদারতার জন্যে গর্ব করেন না, বরঞ্চ সাধারণ সামাজিক মানুষ হিসেবেই তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন—এই মনে করেন।

আমার দু-একজন বন্ধু বলেন যে, আমি Rebel, কারণ চিরাচরিত সর্বজনগ্রাহ্য মতবাদের বিরুদ্ধেই আমার প্রায় সব গবেষণা এবং তাও বিষয়বস্তুর মূল নিয়ে, যার থেকে অনেক সময় কার্যকরী ফল পাওয়া মুস্কিল। কারণ তার জন্যে প্রয়োজন বিশেষ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমসাপেক্ষ experiment-এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। আমার মনে হয় এই দুর্ধর্ষ সাহস, মুনিদের মত অগ্রাহ্য করবার ধৃষ্টতা আমার এসেছে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গবেষণা পদ্ধতি অনুধাবন করে। বিজ্ঞান জগতে নিউটন-আইনস্টাইনও যে সব কিছু ঠিক বলেন নি, তা বিজ্ঞানীরা জানেন। বিজ্ঞানীর কর্তব্য সব কিছুই নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা যাচাই করে নেওয়া—কাউকেই সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত মনে না করে। অধ্যাপক বসুর এই মনোভাব খুব প্রবল ছিল। তাই সব কিছুই তিনি নিজে পরীক্ষা করে নিতেন। কারও মতকে বিনা পরীক্ষায় প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতেন না। আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণা খুব বেশী যে হয় না—তার প্রধান কারণ আমাদের দুঃসাহসের অভাব ও scholastic মনোভাব। খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের গবেষণার জের টেনে অচিরেই কার্যকরী ফল পাবার জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা; তাঁদের গবেষণা নিবদ্ধ থাকে একমাত্র গতানুগতিক গবেষণার কার্যক্রমে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমানে শুধুমাত্র আশু কার্যকরী ফল পাবার সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেইরূপ গবেষণাতেই পৃথিবীর, এমনকি আধুনিক য়ুরোপীয়, বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত। বর্তমানে জগতে খুব কম বিজ্ঞানীই আছেন, যাঁরা সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বের মূল নিয়ে নাড়াচাড়া করেন এবং যে দু-চারজন বিজ্ঞানী এই সব সমস্যায় ব্যস্ত, তাঁরাও বিজ্ঞানজগতে যথেষ্ট পরিচিত নন। আরও বিশেষ পরিতাপের কথা যে, নোবেল কমিটিও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেন বলেই মনে হয়। নচেৎ, সত্যেন বসু ও গ্যামো-কে (G. Gamow) সম্মানিত না করে, তাঁদের গবেষণার ভিত্তিতে যাঁরা কার্যকরী ফল পেয়েছেন, শুধু তাঁদেরকেই সম্মানিত করবার কি কারণ থাকতে পারে। অবশ্য সর্বকালেই সর্বত্রই অতি কম সংখ্যক ব্যক্তিই তত্ত্বের মূল তথ্য বা প্রকল্প নিয়ে চিন্তা করেন। তবুও বিজ্ঞানীদের এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বিজ্ঞানের নতুন অধ্যায় সৃষ্ট হয়েছে এই সব স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার জন্যেই। গ্যালিলিও-নিউটন-আইনস্টাইন পদার্থবিদ্যার ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা সবাই এই মন্তব্যের যথার্থতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। উপরন্তু, যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে অভ্রান্ত মনে করেন, তৎসম্পর্কে গভীর চিন্তা করেন না, তাঁরা বিজ্ঞানের মহারথী হলেও বিজ্ঞানের সঙ্কট কাটিয়ে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করতে পারেন না। 1898 সালে লর্ড কেলভিনের সুপরিচিত মন্তব্য থেকেই এটা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে এবং তজ্জন্যই প্লাঙ্কও তাঁর অভিনব বিপ্লবী আবিষ্কারের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করতে সক্ষম হন নি। অপর দিকে দেখা যায় যে, সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব যে সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এরূপ মনোভাব থাকলে লর্ড রাদারফোর্ড, নীল বোর, হাইসেনবার্গ তাঁদের যুগান্তকারী গবেষণা করতে পারতেন না। বিজ্ঞানের ইতিহাসের এই সব সুপরিচিত দৃষ্টান্ত থেকে এবং আমাদের দেশের রামানুজন, রামন, বোস ও সাহার গবেষণা থেকে এটা সহজেই প্রমাণ হবে যে, উচ্চমানের (বিশেষতঃ তত্ত্বীয়) গবেষণার জন্যে নিজস্ব প্রতিভা, অধ্যাবসায় ও সাধনা ব্যতীত অন্য কিছুরই বিশেষ প্রয়োজন হয় না। একনিষ্ঠ সাধনার অভাবই আমাদের দেশে সাফল্যের সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বিবেকানন্দের উক্তি "ফাঁকি দিয়ে কোনও বড়ো কাজ হয় না"।

অধ্যাপক বসুর বৈজ্ঞানিক অবদানের ও আচার্যসুলভ গুণের সমীক্ষা এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। তাঁর জীবন থেকে দেশবাসী ও বিশেষত বিজ্ঞানীরা কি শিক্ষা পেতে পারেন, তার আলোচনাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে হয়। ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে, তা থেকেই উপলব্ধি হবে যে, আমরাও বিজ্ঞানজগতে নতুন ভাবধারা ও পদ্ধতি সৃষ্টি করতে পারি যদি আমাদের ধীশক্তি ও তদোপযুক্ত সাধনা থাকে। গণিত শাস্ত্রে ও তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে বর্তমানে যে উচ্চমানের গবেষণা খুব বেশী হচ্ছে না, তার জন্যে গ্রন্থাগারের বা সুযোগ-সুবিধার যথোপযুক্ত অভাবকেই প্রধানত দায়ী করা নিতান্তই অসঙ্গত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও উচ্চাঙ্গ গবেষণাগারের প্রতি একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখলেই বোঝা যাবে যে, এর জন্যে প্রধানত দায়ী আমাদের স্বভাব ও চরিত্র।

অধ্যাপক বসু আরও প্রমাণ করেছেন যে, স্বীয় ক্ষমতাতেই যন্ত্রপাতির জন্যে বিদেশের প্রতি চেয়ে না থেকেই ভাল experimental গবেষণাগার তৈরী করা যায়, অবশ্য যদি অধ্যবসায় ও ইচ্ছা থাকে। ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে দেখা যায় যে, এখানে উচ্চমানের তত্ত্বীয় গবেষণা কিছু হয়েছে। কিন্তু নতুন কোন experimental technique আচার্য জগদীশচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেউই উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন নি, যদিও রামন ও কৃষ্ণান পুরনো যন্ত্রপাতি নিয়েই যে experimental গবেষণা করেছেন, তা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে আদৃত হয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জগতে অনেক নতুন experimental technique সৃষ্টি হয়েছে, যা গবেষণার নতুন পথ খুলে দিয়েছে, অথচ তার জন্যে বিশেষ যন্ত্রপাতি বা প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় নি। উপরন্তু, উপযুক্ত নেতৃত্ব থাকলে আমরা যে উচুদরের experimental গবেষণা করতে পারি (যদিও খুব নতুন কিছু এপর্যন্ত তথায় আবিষ্কৃত হয় নি) তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ভাবার সৃষ্ট পরমাণু গবেষণাকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করলেই। দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারের নিরপেক্ষ সমীক্ষা করলে এটা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে যে, আমাদের দেশে উচ্চাঙ্গের গবেষণা না হবার প্রধান কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যন্ত্রপাতির অভাব নয়, অর্থের অভাব নয়, যোগ্যতার অভাবও নয়—তার মূল কারণ আমাদের চরিত্র। দু-চারজন প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়সহকারে উচ্চাঙ্গের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, কিন্তু আমাদের চরিত্রদোষে তা দু-তিন পুরুষের মধ্যেই জীর্ণ হয়ে পড়ে, আদর্শ হারিয়ে গতানুগতিক সংস্থানে দাঁড়িয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমানের experimental গবেষণায় বিশেষ প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্বে সংঘবদ্ধভাবে একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থায় অগ্রসর হওয়া। এই নেতৃত্ব আইনকানুনের মারফতে গড়ে তোলা সম্ভব নয়; তার জন্যে চাই সর্বাগ্রে উপযুক্ত আদর্শবাদী মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানের আইনকানুন সহজেই আদর্শানুযায়ী পরিবর্তন করবার ক্ষমতা। এইখানেই আমাদের সবচেয়ে দুর্বলতা। একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এককালে মন্তব্য করেছিলেন:

'আমাদের দেশের যোগ্য ব্যক্তি এককভাবে পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর সমকক্ষ। কিন্তু দশজন পাশ্চাত্ত্য দেশীয় ব্যক্তির সমবেত শক্তি বেড়ে যায় 100 গুণ, আর আমাদের দেশে তা নেমে যায় শূন্যে।' দেশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় তার ফল হয় negative!! আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্থানগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যাবে এই মন্তব্যটি কতখানি সত্য।

উপরে আমার অভিজ্ঞতা থেকে যে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছি, তা থেকেই এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সত্যেন বোসের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি সর্বদেশেই সর্বকালেই বিরল। তাই অনেক সময় চিন্তা করি, তাঁর মত মহৎ ও প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীর কাছ থেকে আরও অনেক সৃজনীশক্তিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক অবদান পাওয়া গেল না কেন? তিনি তাঁর একটা নিজস্ব স্কুল গঠন করতে সক্ষম হন নি কেন?

300 বছরের ঐতিহ্যে গড়া য়ুরোপের কথা ছেড়ে দিয়ে জাপানের সঙ্গে আমাদের তুলনা করলেও দেখতে পাই যে, যুদ্ধোত্তর ভগ্ন জাপান শুধু শিল্পেই নয়, তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যাতেও Yukawa-র নেতৃত্বে বিশ্বে একটি সম্মানজনক স্থান অধিকার করে নিয়েছে, অথচ জাপানে তত্ত্বীয় বিদ্যার ঐতিহ্য (ভারতের তুলনাতেও) পূর্বে প্রায় ছিল না বললে বিশেষ অত্যুক্তি হবে না।

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও হোমি ভাবা দেশের বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে সার্থকভাবে অনেক সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন যার জন্যে দেশবাসী তাঁদের নিকট যথার্থ কৃতজ্ঞ। তবুও এই সব সংস্থা থেকে কেন অনুরূপ-মানের গবেষণা প্রকাশিত হচ্ছে না? এবং যে দু-চারজন তরুণ বিজ্ঞানী একটু ভাল গবেষণা করেছেন, তাঁরা দেশের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন কেন? যদি আমাদের বিজ্ঞানজগতে সম্মানজনক আসন অধিকার করবার বাসনা থাকে, তবে এই দুটি প্রশ্নের নিরপেক্ষ বিচার প্রয়োজন। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার যে মহান আচার্যসুলভ গুণসমন্বিত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নিকট থেকেই সর্বাগ্রে Yukawa-র মত নেতৃত্বে আশা করা যায়। অথচ তা সম্ভব হয় নি কেন? এর সদুত্তর খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। এই সম্পর্কে একদিন পরিহাসচ্ছলে আমাকে বলেছিলেন, "ঢোড়া সাপকে কেউ ভয় করে না, মানে না।" এই উক্তির পশ্চাতে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ও আক্ষেপ আছে তা আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের মনোবৃত্তি যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরাই অনুভব করতে পারবেন। তবুও শুধু আমাদের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করে কোন ফল নেই। 'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!' বলে নিষ্ফল ব্যঙ্গ করে লাভ নেই। আমার মনে হয় ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যে আমাদের দেশে এরূপ দুরবস্থা এত ব্যাপক কি কারণে। এই সম্পর্কে আমি অন্যত্র আমার মত প্রকাশ করবো।

সত্যেন বসুর জীবন যে তাঁর প্রতিভা ও চরিত্রের মাহাত্ম্যের মাপকাঠিতে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি, সে কথা তিনি নিজেও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি কথা আমার বিশেষ করে মনে হয়। সেটা বোধ হয় 1953 সাল। আমি তখন বার্লিনে গবেষণায় ব্যস্ত এবং নানা কারণে দেশে, বিশেষত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরবার জন্যে বিশেষ ব্যগ্র। তিনি কোপেনহাগেনে নীল বোরের গবেষণাকেন্দ্র পরিদর্শন করে বার্লিনে আমার নিকট কয়েক দিনের জন্যে এসেছিলেন। আমার মনোবাসনা জেনে তিনি আমাকে খুব গম্ভীরভাবে উপদেশ দিলেন, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের উপর বিশেষ কোন মোহ না রেখে বার্লিনে বেশ কিছু দিন থেকে যেতে। তিনি আমাকে সতর্ক করে দিলেন যে, আমি যদি বিজ্ঞানী হিসেবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্থান পেতে চাই, তবে বর্তমানে বার্লিন পরিত্যাগ করে দেশে ফিরলে সারা জীবন আমাকে আফশোষ করতে হবে। আমাকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সর্ব-

বিজ্ঞানীর শ্রদ্ধার পাত্র লাউয়ে এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এভাল্ড (P. P Ewald) আমাদের কোয়ান্টামোত্তর তত্ত্বকে সার্থকভাবে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টার জন্যে এরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন যে, এ সময়ে হোসেমান ও বাগচীর একযোগে কাজ করা বিশেষ প্রয়োজন। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করলেন, 'ভাখ্, এই সত্যেন বোস যদি য়ুরোপে থাকতো তবে অন্য সত্যেন বোস হতো।'

আমার নিজের মনে কোন সন্দেহ নেই যে, সত্যেন বোস যদি 1926 সালে ভারতবর্ষে ফিরে না এসে, বার্লিনে বা গ্যটিঙ্গেনে কিছু দিন একমনে শুধু তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার চর্চা করতেন, তা হলে নবযুগের পদার্থবিদ্যার মূলে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দান আরও অনেক বেশী থাকতো। পূর্বে আমি অনেক সময় ভেবেছি যে, ভারতবর্ষেই বা তাঁর মত প্রতিভাশালী ও শ্রদ্ধেয় খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর আরও অনেক সৃজনীশক্তিমূলক গবেষণার বাধা ছিল কোথায়? পৃথিবীর বেশীর ভাগ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বীয় পদার্থবিদেরা তো একা-একাই গবেষণা করেন এবং দীর্ঘকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকাশ করতে তো তাঁদের কোন ব্যাঘাত হয় না। এ কি তবে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব? ভারতীয় জীবন-দর্শন আমাদের জাতীয় জীবনে, সামাজিক জীবনে যে দুর্গতি এনেছে, তার বিচার সমাজ-বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় করা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যত্র আমি এই সমস্যার আলোচনা করবো, কারণ এই প্রবন্ধের মুখ্য প্রশ্নের [কেন সত্যেন বোসের জীবন আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নি?] উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে উপরিউক্ত সমস্যা বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে। বর্তমানে এই প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই জ্ঞাপন করতে চাই:

যারা দেশকে ভালবাসে এবং দেশপ্রেমের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে না, তাঁদের পক্ষে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে উপেক্ষা করে স্বীয় ক্ষমতার এবং নিজস্ব চরিত্র-মাহাত্ম্য বজায় রেখে খুব বড় কিছু দেশের জন্যে করা সম্ভব হয় না। ইতিহাসে এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, জাতীয় জীবনের সব কিছুরই বিকাশ হয় যখন দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক সুস্থতা থাকে, যখন জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয় নি, যখন সংস্কৃতির ধারকদের 'প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত' হতে হয় না। অপর দিকে, যখনই সমাজে ও রাষ্ট্রে অরাজকতা ও দুর্নীতি প্রবেশ করে, তখন সব কিছুই বিষিয়ে ওঠে 'মাৎস্যন্যায়ের' প্রাবল্যে। যাঁরা সৎ, তাঁরা সব কিছু থেকেই দূরে সরে থাকতে বাধ্য হন, অথচ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় চিত্ত বিক্ষুব্ধ হতে থাকে সর্বদাই। বিষাক্ত আবহাওয়ার প্রতিকারের কোন উপায় এই সব সজ্জন ব্যক্তিদের থাকে না, তবুও এই দুরবস্থা তাঁদেরকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে, কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে নির্বিকল্প সমাধিলাভ করা সম্ভব নয়। এই-জন্যেই কি ভারতের ঋষিরা উপদেশ দিয়ে-ছিলেন যে, যদি জ্ঞানী হতে চাও তবে তপোবনে বাস কর, আর যদি বিমল আনন্দ ও শান্তি চাও, তবে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা কর!

এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য সত্যেন বোসের মত অত্যন্ত সংবেদনশীল সজ্জন ব্যক্তির পক্ষে। কারণ তাঁরা সর্বক্ষণই অনুভব করেন "bleeding on the thorns of life"

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের চিন্তা-জগতে যে অদ্ভুত ফসল ফলেছিল তার মূলে আছে দুটি বাস্তব তথ্য:

(1) বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সবারই আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল, অন্ততপক্ষে দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্যে তাঁদের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু এটাই প্রধান কারণ নয়, যেহেতু ইতি-পূর্বেও স্বচ্ছল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় স্বল্পসংখ্যক ছিল।

(২) এর প্রধান কারণ যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের প্রভাবে বাংলাদেশে কার্যকরী সুষ্ঠু সমাজনীতি ও আদর্শের সৃষ্টি হয়েছিল। সাহিত্যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। বিজ্ঞান জগতেও নতুন চিন্তাধারা ও প্রেরণা এসেছিল এর ফলে, যার প্রকাশ দেখতে পাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে। কিন্তু একথা সত্য যে, বিজ্ঞানজগতে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মনীষা আমাদের দেশে এখনও জন্মগ্রহণ করে নি, যদিও গত এক শত বছরে বিজ্ঞানের ইতিহাসে অদ্ভুত মনীষাসম্পন্ন বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎ মেলে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকদের তার কারণ অনুসন্ধান করা কর্তব্য নয় কি ?

সাহিত্যের পুষ্টি, বিকাশ ও রূপ নির্ভর করে প্রধানত সমাজব্যবস্থার উপর, সে সমাজ ভালই হোক বা মন্দই হোক। তাই মধ্যযুগেও বাংলাদেশের দুর্দিনেও দেখতে পাই সাহিত্য নতুন ভাবধারায়, নতুন ভঙ্গীতে, নতুন জীবন সমীক্ষায় প্লাবিত হয়েছে। পরাধীনতার গ্লানির মধ্যেও জন্মগ্রহণ করেন পরশুরাম ও সুকুমার রায়ের মত সাহিত্যিক। বর্তমানে দেশের দুরবস্থা সত্ত্বেও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যও বিশ্বের দরবারে আসন করে নিতে সক্ষম কিন্তু সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না হলে, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিকাশ সম্যকভাবে হয় না, দেশে যথোপযুক্ত মনীষা থাকা সত্ত্বেও। গ্রের 'Elegy' কবিতায় যে আক্ষেপ করা হয়েছে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আজ যে brain drain নিয়ে আক্ষেপ করা হচ্ছে, তার প্রতিকার শুধু গবেষণার জন্তে উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব দূর করলেই বা গবেষকদের ও শিক্ষকদের বেশী বেতন দিলেই হবে না। আমার মনে হয় অনুকূল পরিবেশের অভাবেই সত্যেন বোসের মত প্রতিভাও তার পরিপূর্ণতা ও বিকাশ লাভ করতে পারে নি।

পরিশেষে এ কথা জানাতে চাই যে, দেশের তৎকালীন পরিবেশে নিজস্ব চরিত্রবৈশিষ্ট্য বিসর্জন না দিয়ে সত্যেন বোসের পক্ষে যেটুকু করবার ক্ষমতা ছিল, তা তিনি করবার চেষ্টা করেছেন এবং আমি অন্যত্র দেখিয়েছি যে, তিনি নিজস্ব বৈজ্ঞানিক স্বার্থ উপেক্ষা করেই দেশের সেবা করেছেন। দেশনেতারা ও শিক্ষাক্ষেত্রের কর্ণধারেরা কি একবার চিন্তা করবার সময় পেয়েছেন যে, আমাদের দেশে গত 25 বছরে উচ্চমানের গবেষণা বিশেষ কিছু হয় নি কেন? অথচ এই সময়কালেই এই দেশেই শিক্ষা সমাপ্ত করে বিদেশে অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানী বাস করেন, যাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশ্বের বিশেষজ্ঞ-মহলে আদৃত হয়েছে। অর্থাভাব, সুযোগের অভাব যে এর যথার্থ কারণ নয়, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া সম্ভব। তার যথার্থ কারণ কি, তা প্রায় সব চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই জানেন। সুতরাং প্রতিকার কি তাই বিচার্য। পাশ্চাত্ত্য-দেশে দেখতে পাই যখন একটি সংস্থা অপটু হয়ে পড়েছে, সমাজের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না, তখন বুদ্ধিজীবীরা সমস্যার সমাধানের জন্তে একটি কার্যকরী পন্থা নির্দেশ করেন, যাতে প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। আমাদের দেশেও অবশ্য পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণে বিভিন্ন প্ল্যানের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে কোন কিছুই বাস্তবে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। এর জন্তে দায়ী প্রধানত দেশের বুদ্ধিজীবীরা, অশিক্ষিত জনসাধারণ নয়। সর্বের মধ্যেই ভূত থাকলে ওঝা বিশেষ কিছু করতে পারে না! দেশের উন্নতিকল্পে বিবেকানন্দ তাই চেয়েছিলেন স্বল্পসংখ্যক চরিত্রবান, বীর্যবান শিষ্য। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, সঙ্গে সঙ্গে এও ভাবতে হবে তাঁদের আদর্শ

কি হবে যাতে তাঁদের সাধনা ও কর্ম বাস্তবে ফলপ্রসূ হয়। শুধু অতীতের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের মোহান্ধে অভিভূত হয়ে থাকলে যে কার্যসিদ্ধি হবে না, এ কথাটা সমাজ-বিজ্ঞানীদের, দেশনেতাদের সর্বাগ্রে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

বর্তমানে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, জনসাধারণের জীবন দর্শন পরিবর্তনের জন্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বুদ্ধিজীবীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা।

চান্দ্র শিলা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ

চন্দ্র অভিযানে প্রেরিত অ্যাপেলো-11-এর অভিযাত্রী আর্মষ্ট্রং কর্তৃক চন্দ্রপৃষ্ঠে নুড়ি কুড়াবার দৃশ্য পৃথিবীর যে সব মানুষ টেলিভিসনে দেখেছিলেন, তারা অতিশয় উল্লসিত হলেন, কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ, পদার্থবিদ ও রসায়নবিদ প্রমুখ বিজ্ঞানিগণ শুধু পুলকিত নন, তাঁরা ব্যগ্র হয়ে উঠলেন ঐ নুড়িগুলিকে চাক্ষুষ দেখতে, হাতে পেতে। অভিযাত্রীদল তাঁদের সংগৃহীত সম্পদ নিয়ে যথাসময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নামলেন। প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আনীত শিলা, মৃত্তিকাসমূদয় নাইট্রোজেন ভর্তি কাচের বাক্সে বন্দী করে কোয়ারেনটাইন (Quarantine) কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো সাত সপ্তাহের জন্যে। চন্দ্রপৃষ্ঠের কোন বিষাক্ত রোগ-বীজাণু শিলা মৃত্তিকার সঙ্গে এসে থাকলে তা দিয়ে তো আর পৃথিবীতে কোন নূতন রোগের উদ্ভব হতে দেওয়া যায় না। তাই এই সতর্কতা। আরো সাত সপ্তাহ যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা ঐ অমূল্য সম্পদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে আপন আপন গবেষণাগারে নিয়ে যেতে পারবেন।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষকগণ কাচের ভিতর দিয়ে চান্দ্র শিলাগুলিকে চাক্ষুষ দেখলেন এবং যান্ত্রিক উপায়ে নাড়াচাড়া করে সেগুলিকে চারটি শ্রেণীতে বিভাগ করলেন।

টাইপ A—গাঢ় ধূসর বর্ণের শিলা, যার গায়ে মাখানো আছে খালি চোখে অদৃশ্য অতি মিহি খনিজ পাউডার। দৃশ্যতঃ এর সঙ্গে তুলনা চলে পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি থেকে উৎকীর্ণ ব্যাসাল্ট (Basult) শিলার সঙ্গে।

টাইপ B—এই শিলাগুলি উল্লিখিত ব্যাসাল্ট শিলার মতই দেখতে, তবে এগুলির গায়ে মাখানো খনিজ পাউডার অপেক্ষাকৃত মোটা দানাবিশিষ্ট, যার ব্যাস 1 মিলিমিটার বা তার চেয়েও একটু বড়। এই দানাগুলিকে খালি চোখে দেখা যায়।

টাইপ C—এই শিলাগুলি পার্থিব ব্রেকসিয়ার (Breccia) অনুরূপ; অর্থাৎ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড একত্র জুড়ে গিয়ে একটি শিলাখণ্ডে পরিণত হয়েছে। স্বভাবতঃই এর উপরিভাগ এবড়োখেবড়ো।

কতকগুলি টুক্‌রো পাথর যদি চুন প্রভৃতি মশলা সংযোগে বা আংশিক গলে গিয়ে দৃঢ় ভাবে জমাট বেঁধে একটিমাত্র শিলাখণ্ডে পরিণত হয়, তাকে ব্রেকসিয়া বলে। পৃথিবীতে প্রাচীন ইমারতের ভগ্নস্তূপে ও অন্যত্র এই ধরণের ব্রেকসিয়া দেখা যায়।

এদেরই অনুরূপ ব্রেকসিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠেও গঠিত হয়। খনিজ পদার্থের সূক্ষ্ম গুঁড়ার আস্তরণবিশিষ্ট বহু ছোট বড় খাদ চন্দ্রপৃষ্ঠে আছে।

উল্কার আঘাতে চন্দ্রপৃষ্ঠে ভগ্নীকৃত বিবিধ আগ্নেয় শিলার টুকরো, যেগুলি আঘাতজনিত উত্তাপে আংশিক গলিত অবস্থায় ঐ সকল খাদে গিয়ে জড়ো হয় এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগীরণে আরো যে সকল খনিজ দ্রব্য এসে ঐ সঙ্গে মিলিত হয়, সেগুলি ঐ খাতে বা ছাঁচে দৃঢ়সংবদ্ধভাবে জমাট বেঁধে প্রতি খাদে একটি করে শিলাখণ্ডে রূপান্তরিত হয়। এরাই চন্দ্রপৃষ্ঠের ব্রেকসিয়া।

এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, একটি ব্রেকসিয়ায় ছোট বড় নানা আকৃতির বিবিধ জাতীয় অবস্থণ উপল অবস্থান করতে পারে।

টাইপ D—এই পদার্থ বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো ও ধূসর বর্ণের বস্তুকণার সমাবেশ—, যাদের ব্যাস—সর্ববৃহৎটির ০—1 সেন্টিমিটারের বেশী নয়। একেই বলা হয় চন্দ্রপৃষ্ঠের ধূলি বা মৃত্তিকা।

চাঁদকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের নানা ভাবনা। চান্দ্র শিলার বয়স কত? পৃথিবীর সুপ্রচুর খনিজ পদার্থের মধ্যে কোন্গুলির সঙ্গে চান্দ্র শিলাসমূহের সাদৃশ্য বেশী? নাকি চান্দ্র শিলা পার্থিব শিলা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক? পৃথিবীতে যে সব মৌলিক পদার্থ আছে, চন্দ্রেও কি তাই আছে এবং সেই সেই আনুপাতিক পরিমাণে আছে? চন্দ্র কি কোন দিন সম্পূর্ণ গলিত অবস্থায় ছিল? খনিজ শিলা গঠনে চন্দ্রে কি কোন দিন জলের কোন ভূমিকা ছিল? ইত্যাদি।

অ্যাপোলো-11, অ্যাপোলো-12 এবং অ্যাপোলো-14 কর্তৃক আহৃত চান্দ্র শিলা প্রভৃতির মোট পরিমাণ 99 কিলোগ্র্যাম। তার মধ্যে অ্যাপোলো-11 এনেছিল প্রায় 24 কিলোগ্র্যাম। অ্যাপোলো-12 এবং অ্যাপোলো-14 যে সমস্ত শিলা এনেছিল, সেগুলিরও উপরিউক্ত প্রণালীতে শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছিল। তাতে দেখা যায়, অ্যাপোলো-11 কর্তৃক আনীত শিলার সঙ্গে এদের আনীত শিলার পরস্পরের সঙ্গে শ্রেণীগত না হলেও পরিমাণগত যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

চন্দ্রপৃষ্ঠের যে স্থান থেকে অ্যাপোলো-11 নুড়ি কুড়িয়েছিল, তার নাম শান্তি সাগর (Mare Tranquillitatis)। এখানে ব্রেকসিয়া ও অন্যান্য শিলা প্রায় সমপরিমাণে বর্তমান। অ্যাপোলো-12 যে স্থান থেকে নুড়ি এনেছিল, সেখানকার নাম ঝটিকা সমুদ্র (Oceanus Procellarum)। ঝটিকা সমুদ্রে ব্রেকসিয়ার চেয়ে অন্যান্য শিলার পরিমাণ অনেক বেশী। আবার অ্যাপোলো-14 চন্দ্রের ফ্রা মরো (Fra Mauro) অঞ্চল থেকে শিলা সংগ্রহ করেছিল। এখানকার প্রায় সকল শিলাই ব্রেকসিয়া।

শিলা সংগ্রহকালে অভিযাত্রীদের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা ব্যক্তিগত কিছু পছন্দ-অপছন্দ ছিল ধরে নিলেও সংগ্রহ স্থানের পার্থক্যই যে ঐ প্রকার অসম পরিমাণের জন্যে মূলতঃ দায়ী, এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

অ্যাপোলো 11-এর সংগ্রহে এত অধিক ব্রেকসিয়া এবং অ্যাপোলো 14-এর সংগ্রহে অধিকতর সংখ্যক ব্রেকসিয়া থাকায় সহজেই অনুমান করা যায় এই দুই স্থানে উল্কার আঘাত পড়েছে বেশী এবং সেই সঙ্গে ব্রেকসিয়া গঠনের উপযোগী অন্যান্য প্রক্রিয়াও চলেছে বেশী, পক্ষান্তরে অ্যাপোলো 12-এর সংগ্রহ স্থানে ততটা নয়।

শিলাগুলির বয়ঃক্রম নির্ণয়ের পরও ঠিক এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। হিসেব করে দেখা গেছে যে, অ্যাপোলো-12 কর্তৃক আনীত শিলার বয়স 330 কোটি বছর, অ্যাপোলো-11 কর্তৃক আহৃত শিলার বয়স 370 কোটি বছর, অ্যাপোলো-14 কর্তৃক সংগৃহীত শিলার বয়স আরো বেশী। যেসব শিলা যত বেশী দিন চন্দ্রপৃষ্ঠে অবস্থান করছে তাদের উপর উল্কাপাত হয়েছে বেশী দিন। সুতরাং তাদের মধ্যে ব্রেকসিয়ার সংখ্যাও বেশী হবার সম্ভাবনা। এদিকে পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন যে শিলা

পাওয়া গেছে, সেটি বয়স 350 কোটি বছর। অতএব ভূত্বক গঠনের পূর্বেই নিঃসন্দেহে চন্দ্রত্বকের গঠন আরম্ভ হয়েছিল।

পৃথিবীর কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী বলেছিলেন ভূপৃষ্ঠের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে চন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে। পরবর্তীকালে পদার্থবিদ্‌গণ গতিবিদ্যার সাহায্যে এই ধারণা খণ্ডন করেছেন। বর্তমানে চন্দ্রের গঠন-উপাদানে ও পৃথিবীর গঠন-উপাদানে বিস্তর পার্থক্য দেখে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো চন্দ্র কোন দিন পৃথিবীর অংশভূত ছিল না।

পৃথিবীতে যত বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তর পাওয়া যায়, সে তুলনায় চন্দ্রে প্রস্তরের প্রকারভেদ নিতান্তই কম। এর কারণ আছে। পৃথিবীতে জল তো আছেই। তাছাড়া প্রবহমান বায়ু সমন্বিত আবহমণ্ডল বর্তমান। পৃথিবীস্থিত অনেক আদিম আগ্নেয় শিলাই আবহমণ্ডলের রাসায়নিক ভাঙাগড়া খেলায় নানা জাতীয় বহু সংখ্যক শিলায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চন্দ্রে আবহমণ্ডল না থাকায় তথাকার আদিম শিলাগুলির কোন রূপান্তর ঘটে নি। সুতরাং সেগুলির আদিম অবস্থায়ই রয়ে গেছে, বহু জাতীয় অনেকানেক প্রস্তরে পরিণত হতে পারে নি। কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠে এক অঞ্চলের খনিজের সঙ্গে অন্য দূরাঞ্চলের খনিজ দ্রব্যাদিও অগ্ন্যুদগীরণের ফলে এসে মিশে যায়। তাছাড়া এগুলির সঙ্গে কিছু কিছু উল্কাপিণ্ডও অবশ্যই মিশে যাচ্ছে।

অ্যাপোলো-11 মোট 36টি শিলা ও 11·9 কিলোগ্রাম চান্দ্র মৃত্তিকা চন্দ্রপৃষ্ঠের শান্তি সাগর এলাকা থেকে নিয়ে এসেছিল। শিলাগুলির মধ্যে 8টি A টাইপের অর্থাৎ মিহি পাউডার মাখানো, 8টি B টাইপের অর্থাৎ মোটা দানা পাউডার মাখানো এবং 20টি ব্রেকসিয়া।

অ্যাপোলো-12 মোট 46টি শিলা ও 7·44 কিলোগ্রাম চান্দ্র মৃত্তিকা চন্দ্রপৃষ্ঠের ঝটিকা সমুদ্র এলাকা থেকে নিয়ে এসেছিল। শিলাগুলির মধ্যে 26টি A টাইপের, 16টি B টাইপের এবং 4টি ব্রেকসিয়া।

অ্যাপোলো-14 মোট 97টি শিলা ও 13·56 কিলোগ্রাম চান্দ্র মৃত্তিকা চন্দ্রপৃষ্ঠের ফ্রা মরো অঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছিল। শিলাগুলির মধ্যে একটিও A টাইপের নেই, B টাইপের মাত্র 9টি এবং অবশিষ্ট 88টি সবই ব্রেকসিয়া।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে তিনটি অভিযাত্রী দল চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মোট 179টি শিলা ও 32·9 কিলোগ্রাম চান্দ্রমৃত্তিকা সংগ্রহ করে এনেছিল।

ঐ 179টি শিলার মধ্যে ওজন হিসাবে দশ শতাংশ হচ্ছে :

(1) প্লাজিওক্লেজ (Plagioclose)—$(Ca, Na)(Al, Si)_4O_8$ এবং (2) পাইরোক্সিন (Pyroxene)—$(Ca, Mg, Fe)_2Si_2O_6$

ওজন হিসেবে এক থেকে দশ শতাংশ হচ্ছে নিম্নোক্ত পাঁচটি :

(3) ওলিভাইন (Olivine)—$(Mg, Fe)_2SiO_4$

(4) ইলমেনাইট (Ilmanite)—$FeTiO_3$

(5) ক্রিস্টোবেলাইট (Cristobalite)—SiO_2

(6) ট্রাইডিমাইট (Tridymite)—SiO_2

(7) পাইরোক্সফেরোআইট (Pyroxferraite)—$CaF_6(SiO_3)_7$

ওজন হিসেবে এক শতাংশের কম হচ্ছে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য কয়টি। তন্মধ্যে লৌহঘটিত এই পাঁচটি :

(8) লৌহ-নিকেল (Iron Nickel)—(Fe, Ni)

(9) ট্রোলাইট (Trolite)—FeS

(10) আর্মালকোলাইট (Armalcolite)—$(Fe, Mg)Ti_2O_5$

(11) ক্রোমাইট (Chromite)—$FeCr_2O_4$

(12) আলভোস্পিনেল (Ulvospinel)—Fe_2TiO_4

ক্যালসিয়াম ফসফেটঘটিত এই দুটি :

(13) অ্যাপাটাইট (Apatite)—Ca_5, $(PO_4)_3$ (F, Cl)·

(14) হুইটলকাইট (Whitlockite)—Ca, $MgH(PO_4)_7$ এবং অন্য দুটি

(15) পটাশ ফেল্ডস্পার (Patash Feldspur)—(K, Na) $AlSi_3O_8$

(16) কোয়ার্ট্‌জ (Quartz)—SiO_2

চন্দ্রপৃষ্ঠে আহৃত উপরিউক্ত শিলাসমূহের মধ্যে দুটি পার্থিব খনিজ জগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত। একটির নাম পাইরোক্স ফেরো-আইট, যেটি ব্যাসাল্টের পাইরোক্সিন পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। অপরটির নাম আর্মাল-কোলাইট (আয়রন ম্যাগনেসিয়াম টাইটানেট)। আর্মালকোলাইট শিলা অ্যাপোলো-11 কর্তৃক আনীত বলে তার তিন অভিযাত্রী আর্মষ্ট্রং, অলড্রিন এবং কলিনস-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে তাদের নামের আদ্যংশ সন্ধি করে এই শিলাটির নামকরণ করা হয়েছে।

চান্দ্র ব্যাসাল্ট ও পার্থিব ব্যাসাল্ট মূলতঃ এক হলেও তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্তমান। চন্দ্রের ব্যাসাল্টমধ্যস্থ প্লাজিওক্লেজ-এ আছে প্রায় নির্ভেজাল অ্যানরথাইট (Anorthite, Ca Al_2 Si_2 O_8), কিন্তু পার্থিব ব্যাসাল্টমধ্যস্থ প্লাজিও-ক্লেজ-এ আছে অ্যানরথাইট এবং অ্যালবাইট (Albite, $NaAlSi_3O_8$)—এই দুয়ের মিশ্রণ।

আবার পার্থিব ব্যাসাল্টের চেয়ে অ্যাপোলো-11-এর আনীত শিলায় দশ গুণ বেশী ইলমেনাইট আছে, পরন্তু অ্যাপোলো-12-এর আনীত শিলায় মাত্র তিন গুণ বেশী ইলমেনাইট আছে।

বিভিন্ন স্থানের শিলায় উপাদানগত পার্থক্যও কিছু কিছু আছে। যেমন অ্যাপোলো-11-এর আনীত শিলায় টাইটেনিয়াম বেশী, সিলিকা কম। আবার অ্যাপোলো-14-এর আনীত শিলায় অ্যালুমিন (AlO_2) বেশী, লৌহ অক্সাইড (FeO) কম।

1970 সনে অক্টোবর মাসে রাশিয়া মনুষ্য-বিহীন মহাকাশযান লুনা-16-কে পাঠিয়েছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে ফেকামডিটাইটিস সাগর (Mare Fecunditatis) নামক অঞ্চলে। সেখান থেকে লুনা-16 স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় মাটি খুঁড়ে চান্দ্র-মৃত্তিকা নিয়ে নির্বিঘ্নে রাশিয়ায় যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করে। অ্যাপোলো-12 নেমেছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে ঝটিকা সমুদ্রে। লুনার অবতরণ স্থান ফেকামডিটাইটিস সাগর ও ঝটিকা সমুদ্রের মধ্যে ব্যবধান দুই হাজার মাইলের বেশী, অর্থাৎ চন্দ্রের পরিধির এক-তৃতীয়াংশ।

অ্যাপোলো-12 কর্তৃক আনীত মৃত্তিকা ও লুনা-16 কর্তৃক আনীত মৃত্তিকা তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। এত দূরত্ব সত্ত্বেও উভয় নমুনার মধ্যে আশ্চর্য রাসায়নিক সাদৃশ্য বর্তমান।

বিজ্ঞানিগণ অনুমান করেন ভিন্ন ভিন্ন স্থানের চান্দ্র শিলা ও চান্দ্র মৃত্তিকায় গুণগত বা শ্রেণীগত কোন পার্থক্য না থাকাই সম্ভব। তবে এক অঞ্চলের এক জাতীয় শিলার সংখ্যার তুলনায় অন্য অঞ্চলের সেই জাতীয় শিলার সংখ্যা আনুপাতিক হিসেবে কম বা বেশী হওয়া বিচিত্র নয়। পরবর্তী অন্য সকল অ্যাপোলো অভিযানের নূতন সংগ্রহের মধ্যে দু-একটি এমন নূতন শিলা থাকতে পারে, যা পৃথিবীর খনিজসমূহের মধ্যে নেই, অর্থাৎ পৃথিবীতে অপরিচিত।

অ্যাপোলো-11, 12, 14 ও লুনা-16 কর্তৃক চন্দ্রপৃষ্ঠে খনিজ নমুনাগুলি সম্বন্ধেই মাত্র এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হলো। এরপর 1972 সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত অ্যাপোলো-15, 16 ও 17 চন্দ্রে গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে নেমে বহু চান্দ্র শিলা ও মৃত্তিকা নিয়ে এসেছে।

অ্যাপোলো-11, 12, 14 এবং লুনা-16 নেমেছিল চন্দ্রপৃষ্ঠের বিষুব অঞ্চলে।

মনোপলের সন্ধানে

তাপস চক্রবর্তী*

মহাকাশের গ্রহ, নক্ষত্রজগত থেকে সুরু করে অসংখ্য অণু, পরমাণু মৌলিক কণাসমন্বিত আণুবীক্ষণিক জগৎ পর্যন্ত এক বিশাল 'নিয়মের রাজত্ব' বর্তমান। পদার্থ-বিজ্ঞানে তাই শুধু 'নিয়ম আর সংখ্যার' নাগপাশে এই বিশ্বের প্রতিটি ঘটনাকে বেঁধে বিভিন্ন সূত্রের সাহায্যে এসবের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা চলেছে। তবে এই নিয়মের রাজত্বে কখনও কখনও ছন্দপতন লক্ষ্য করা যায়। বহুকাল থেকেই তড়িৎ ও চুম্বকত্বের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আমাদের জানা ছিল। 1820 সালে প্রথম বিজ্ঞানী Oersted একটি তড়িদ্বাহী তারের চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব লক্ষ্য করেন। বস্তুত: প্রতিটি বৈদ্যুতিক প্রভাবের সঙ্গে একটি চৌম্বক প্রভাবের সাদৃশ্য রয়েছে এবং প্রতিটি চৌম্বক প্রভাবের সঙ্গে একটি তড়িত প্রভাবের সাদৃশ্য বর্তমান। স্বভাবত:ই তাই পদার্থ-বিজ্ঞানের এই শাখা দুটিকে একত্র করে সৃষ্টি হয়েছে তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব। তবে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক প্রভাবের মধ্যে একটি বৈসাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। সেটি হলো—যদিও প্রকৃতিতে মুক্ত ঋণাত্মক বা ধনাত্মক তড়িত-আধানের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, চুম্বকীয় আধান কিন্তু সবসময়েই যৌথভাবে অবস্থান করে দ্বিমেরু (Dipole) সৃষ্টি করে। একটি পরমাণু সাধারণভাবে তড়িতনিরপেক্ষ; কিন্তু এটির পক্ষে শুধুমাত্র ঋণাত্মক বা ধনাত্মক আধানযুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। যেহেতু ইলেকট্রনগুলি পরমাণুর কেন্দ্রীন অপেক্ষা অধিক চলনশীল, অতএব ধনাত্মক আধান-ধর্মী হলে বস্তুটির কিছু ইলেকট্রন খোয়া গেছে এবং ঋণাত্মক আধান-ধর্মী হলে এর বিপরীত; অর্থাৎ অধিক সংখ্যক ইলেকট্রন সংযোজন ঘটেছে বলে ধরা হয়। একটি চুম্বকের চুম্বকীয় আধানে কিন্তু সর্বদাই একটি ভারসাম্য বজায় থাকে; অর্থাৎ একটি চুম্বককে ভেঙে দু-টুক্‌রো করলে দুটি চুম্বকই পাওয়া যাবে; মুক্ত উত্তর মেরু কিম্বা মুক্ত দক্ষিণ মেরু পাওয়া সম্ভব হয় না।

তড়িত ও চৌম্বক ধর্মে এই অপ্রতিসমতাই বিজ্ঞানীদের এমন একটি কণা আবিষ্কারের প্রেরণা জুগিয়েছিল, যেটিতে থাকবে চুম্বকের যে কোন একটি মেরু—কণাটির নাম দেওয়া হয় মনোপোল (Monopole)। 1931 সালে এই কণাটির সম্ভাব্য অস্তিত্বের কথা প্রথম ঘোষণা করেন বৃটিশ বিজ্ঞানী ডিরাক (R. A. M Dirac)

প্রায় শতাধিক কাল আগে ইংরেজ বিজ্ঞানী J. C. Maxwell-উদ্ভূত তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্বে চারটি সমীকরণের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সমীকরণ চারটি দুটি ভাগে বিভক্ত; ভাগ দুটি তড়িত ও চৌম্বক ক্ষেত্র অনুযায়ী। এই সমীকরণগুলিতে বৈদ্যুতিক আধান e উপস্থিত থাকলেও মুক্ত চুম্বকীয় আধানের (g) কোন উল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে যদি এই চুম্বকীয় আধান (g) উপরিউক্ত সমীকরণে সংযোজিত করা যায়, তবে সমীকরণগুলিতে অপূর্ব প্রতিসমতা বজায় পরিলক্ষিত হয়।

---

* পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্রুগড়

মনোপোল সন্ধানের সুরুতে ডিরাক লক্ষ্য করেন, সনাতনী পদার্থবিদ্যা মনোপোলের অস্তিত্বে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় চুম্বকীয় আধান উপস্থাপিত করেও ডিরাক লক্ষ্য করেন যে, কোয়ান্টাম তত্ত্বেও মনোপোলের অস্তিত্ব কল্পনায় কোনই বাধা নেই ; তবে এক্ষেত্রে প্রত্যিটি মনোপোলে একটি নির্দিষ্ট আধান

$$g_h e = \frac{1}{2} n \bar{h} c$$

থাকতে হবে। এখানে,

n একটি পূর্ণসংখ্যা

$2\pi \bar{h}$ = প্ল্যাংকের ধ্রুবক

c = আলোর গতি

তত্ত্বগতভাবে মনোপোল আবিষ্কারের প্রথম যুগে n=1 ধরা হয়েছিল। এই পরিমাণ আধানযুক্ত কণার নাম 'ডিরাকের মনোপোল'। তৎকালীন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি শুধুমাত্র 'ডিরাক মনোপোল' অন্বেষণেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে Schwinger তাত্ত্বিক গবেষণায় মুক্ত চুম্বকীয় মেরু ; অর্থাৎ মনোপোলের ক্ষেত্রে n=2, 4 এবং 12—এই তিনটি অতিরিক্ত মানের প্রস্তাব নেন।

যাই হোক, আজ থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগে ডিরাকের প্রথম প্রস্তাবনার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন তত্ত্বই মনোপোলের অবিদ্যমানতার পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখাতে সক্ষম হয় নি। সম্প্রতি Schwinger dyon নামে একটি অযুগ্ম চুম্বকীয় মেরুর কথা বলেছেন, যে কণাটি তড়িত ও চুম্বকীয়—দুই প্রকারের আধানই বহন করে।

মনোপোলের ধর্ম—Dielectric পদার্থের প্রতি তড়িত-আধানের যেরূপ আকর্ষণ থাকে, Ferromagnetic বা Paramagnetic পদার্থের প্রতি সেরূপ আকর্ষণের ফলে চুম্বকীয় আধানগুলিকে, এই পদার্থ দুটি প্রাকৃতিক চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণকে উপেক্ষা করে বহুকাল সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখতে সক্ষম। অবশ্য লেবোরেটরীতে প্রস্তুত চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে কণাগুলিকে ঐ পদার্থ থেকে শিথিল করা সম্ভব।

মনোপোলের দ্বিতীয় ধর্ম হলো, এগুলিকে gH পরিমাণ বল প্রয়োগ করে চৌম্বক ক্ষেত্র রেখা (Megnetic-field line) অনুযায়ী ত্বরিত করা যেতে পারে। এর ফলে কণাটির প্রতি সেন্টিমিটারে বর্ধিত শক্তির পরিমাণ হবে 20n Mev/kg, kG = kilogauss। অতএব একটি একক মেরুতে (n=1) 60 KG চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে কণাটির 2cm ত্বরণ দূরত্বে বর্ধিত শক্তির পরিমাণ হবে 2·4 Gev, এবং n=12 মেরুর ক্ষেত্রে এই বর্ধিত শক্তির পরিমাণ হবে 29 GeV। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, যদি কণাটি কোন পরমাণুর সঙ্গেও আবদ্ধ থাকে, তবে লেবোরেটরীতে লভ্য চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যেই কণাটিকে কঠিন পদার্থ থেকে উৎপাটন করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন কঠিন পদার্থে আন্তঃপারমাণবিক দূরত্বের মধ্যে একটি একক মেরুর 256KG পরিমাণ চৌম্বক ক্ষেত্রে শক্তির পরিমাণ হবে 130ev। এই শক্তি কঠিন পদার্থে পরমাণুর বন্ধনশক্তি থেকে অনেক বেশী।

মনোপোলের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হলো—একটি চলমান মনোপোল কণার আয়নন ক্ষমতা খুব বেশী। একটি চলমান চুম্বকীয় আধান এমন একটি তড়িৎ ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে, যা কণাটির গতিবেগের সমানুপাতিক। Cole & Bauer লক্ষ্য করেন, একটি মনোপোল কণা একটি আপেক্ষিকতাবাদী বিরল মৃত্তিকা আয়নের (Rare earth ion) মতই অস্বাভাবিক আয়ননে সক্ষম এবং n-এর মান 1-এর চেয়ে বেশী হলে, কণাটি আমাদের জানা যে কোন মৌলের আপেক্ষিকতাবাদী কেন্দ্রীন থেকে অনেক দ্রুত আয়ননে সক্ষম। মনোপোলের এই গুণের জন্যেই

কণাটির অন্বেষণে সলিড স্টেট নির্দেশন যন্ত্রের (Solid State Detector—যার সাহায্যে কেবল অত্যধিক আয়নকারী কণার নির্দেশন সম্ভব) ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল।

মনোপোলের ভর—তত্ত্বগতভাবে মনোপোলের ভর সম্বন্ধে এখনও স্থির নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় নি। কণাত্বরণ যন্ত্রের পরীক্ষায় কোন কোন বিজ্ঞানী কণাটির ভর প্রোটনের ভরের তিনগুণ হিসেবে ধরে নিয়েছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, মনোপোলের ব্যাসার্ধ সনাতনী পদার্থ-বিদ্যায় গণিত ইলেকট্রন ব্যাসার্ধের (re) সমান ধরে মনোপোলের ভর গণনা করা হয়েছে $g^2/r_e c^2 - 2.4m_p$, m_p —প্রোটনের ভর। কখনও আবার কণাটির ভর প্রোটন ভরের সমান ধরা হয়েছে।
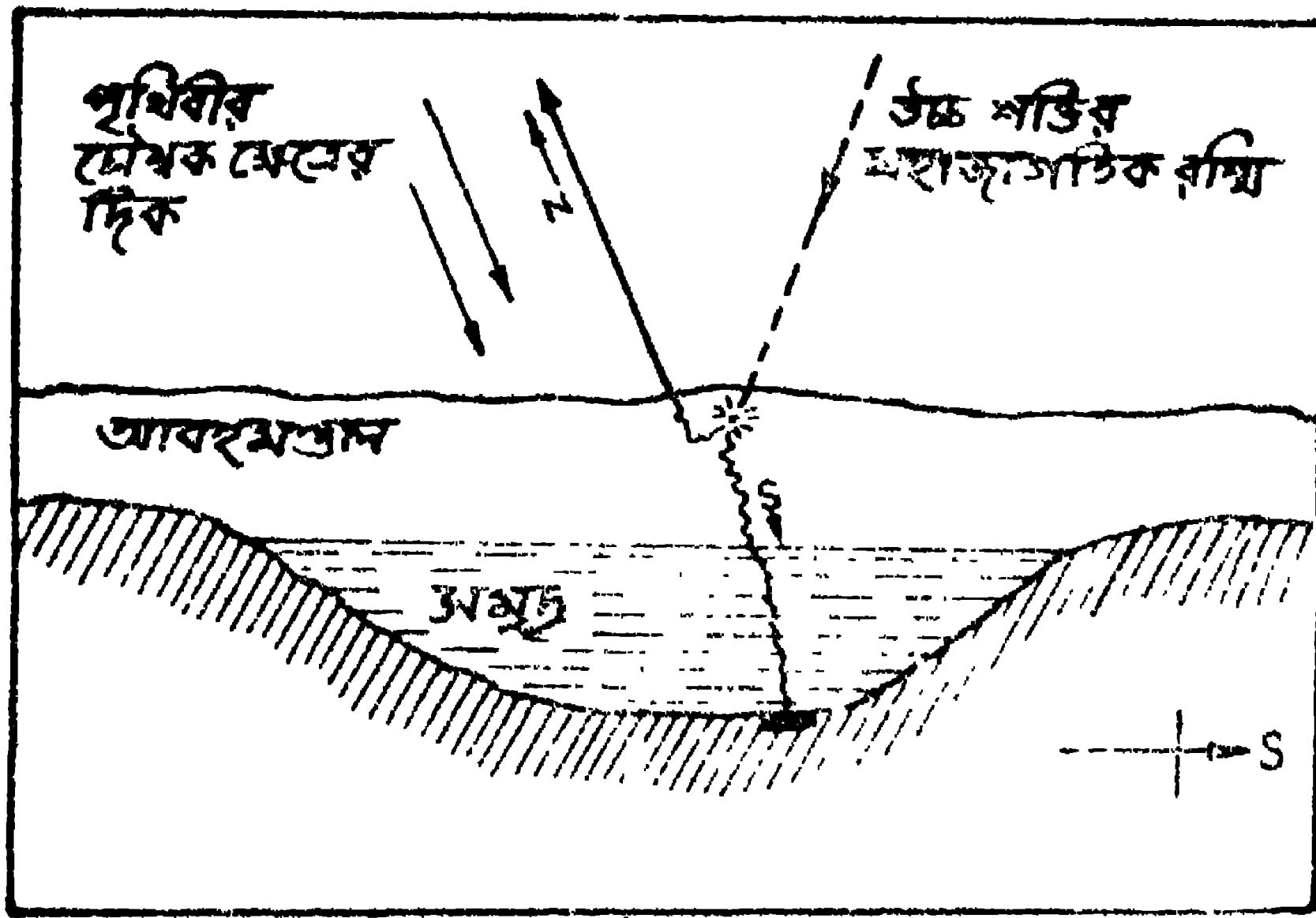
1নং চিত্র—মনোপল অন্বেষণের একটি প্রকল্প। উচ্চ শক্তির মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে আবহমণ্ডলের সংঘর্ষে এক জোড়া মনোপলের সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। কণা দুটি ভূচৌম্বক রেখা অনুযায়ী হয়, সমুদ্রতলে আবদ্ধ হয় কিংবা শূন্যে মিলিয়ে যায়

মনোপোলের স্পিন (Spin) সম্বন্ধে কিছুই বলা সম্ভব নয়। আবার তড়িচ্চুম্বকীয় মিথস্ক্রিয়া ছাড়া কণাটির অন্য কোন মিথস্ক্রিয়া সম্বন্ধেও কিছু জানা সম্ভব হয় নি। মনোপোলের অস্তিত্ব যদি সত্যই সম্ভব হয়, তবে সেগুলি সবই যে সমগোত্রীয় হবে—এমন কথাও বলা যায় না। যেমন বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত বহু ধরণের কণার অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তেমনি বহু রকমের মনোপোল থাকাই সম্ভব; তবে কণাগুলির ভর বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত কণাগুলি থেকে অনেক বেশী হবে।

মনোপোল অন্বেষণ—মনোপোল অন্বেষণের একটি প্রধান ক্ষেত্র হলো মহাজাগতিক রশ্মি। মহাকাশ থেকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে-আসা এই কণাগুলি বিভিন্ন শক্তিতে এসে পৃথিবীকে আঘাত হানে। 1নং চিত্র অনুযায়ী, উচ্চশক্তির কিছু

মহাজাগতিক রশ্মির আবহমণ্ডলের উচ্চস্তরের কিছু পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষে এক-জোড়া মনোপোল সৃষ্টি হয়, কণা দুটি ক্রমশঃ মন্থর গতিপ্রাপ্ত হয়ে কঠিন পদার্থে আটকা পড়ে কিম্বা শূন্যে মিলিয়ে যায়।

উচ্চশক্তির মহাজাগতিক রশ্মি কণাগুলি (10^{17}-
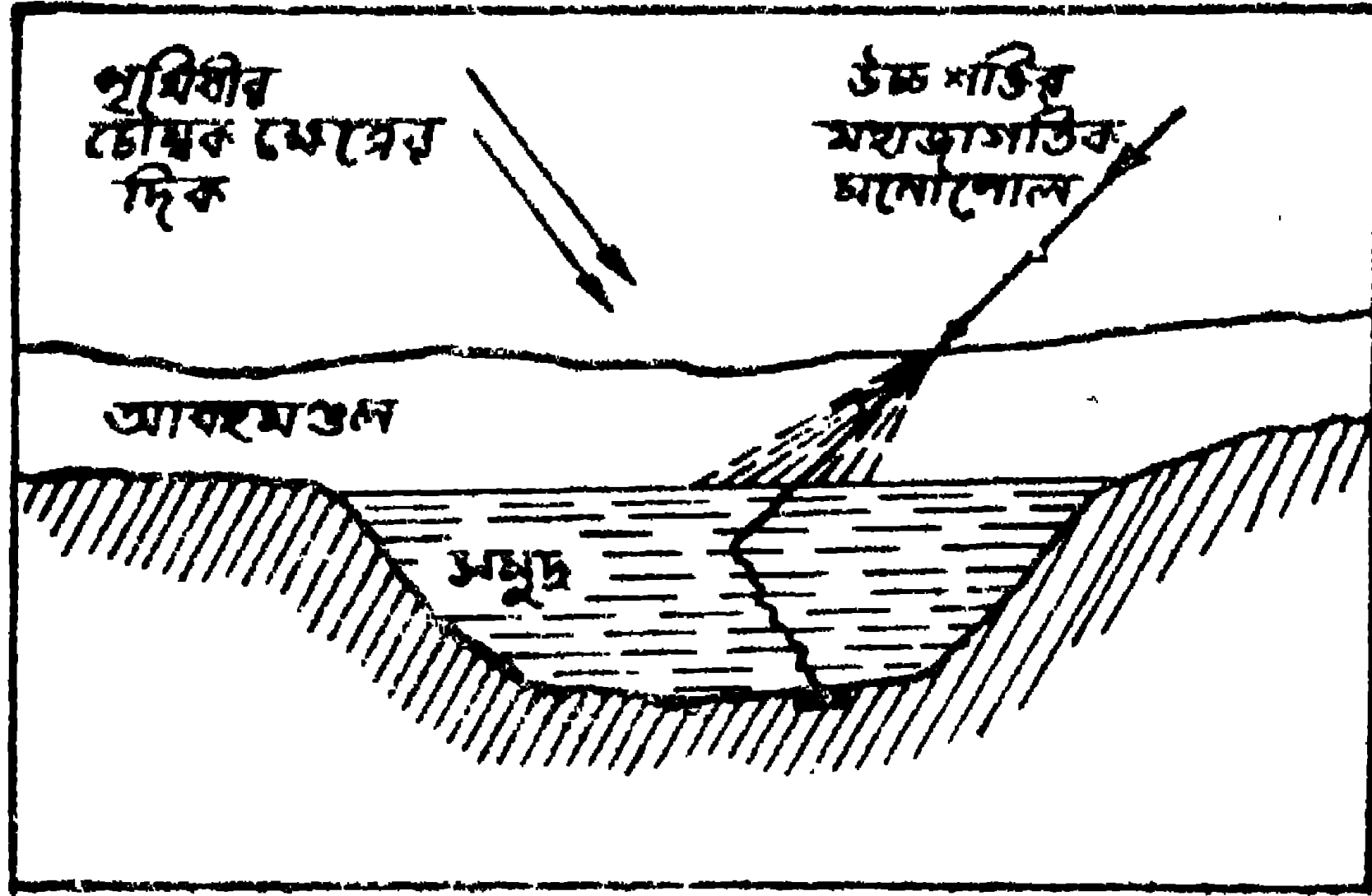
2নং চিত্র—মনোপোল অন্বেষণের অপর একটি প্রকল্প। এখানে উচ্চশক্তির মহাজাগতিক মনোপোল কণার ক্রমশঃ তাপীয় গতি প্রাপ্ত হয়ে সমুদ্রতলে আবদ্ধ হতে দেখা যাচ্ছে।
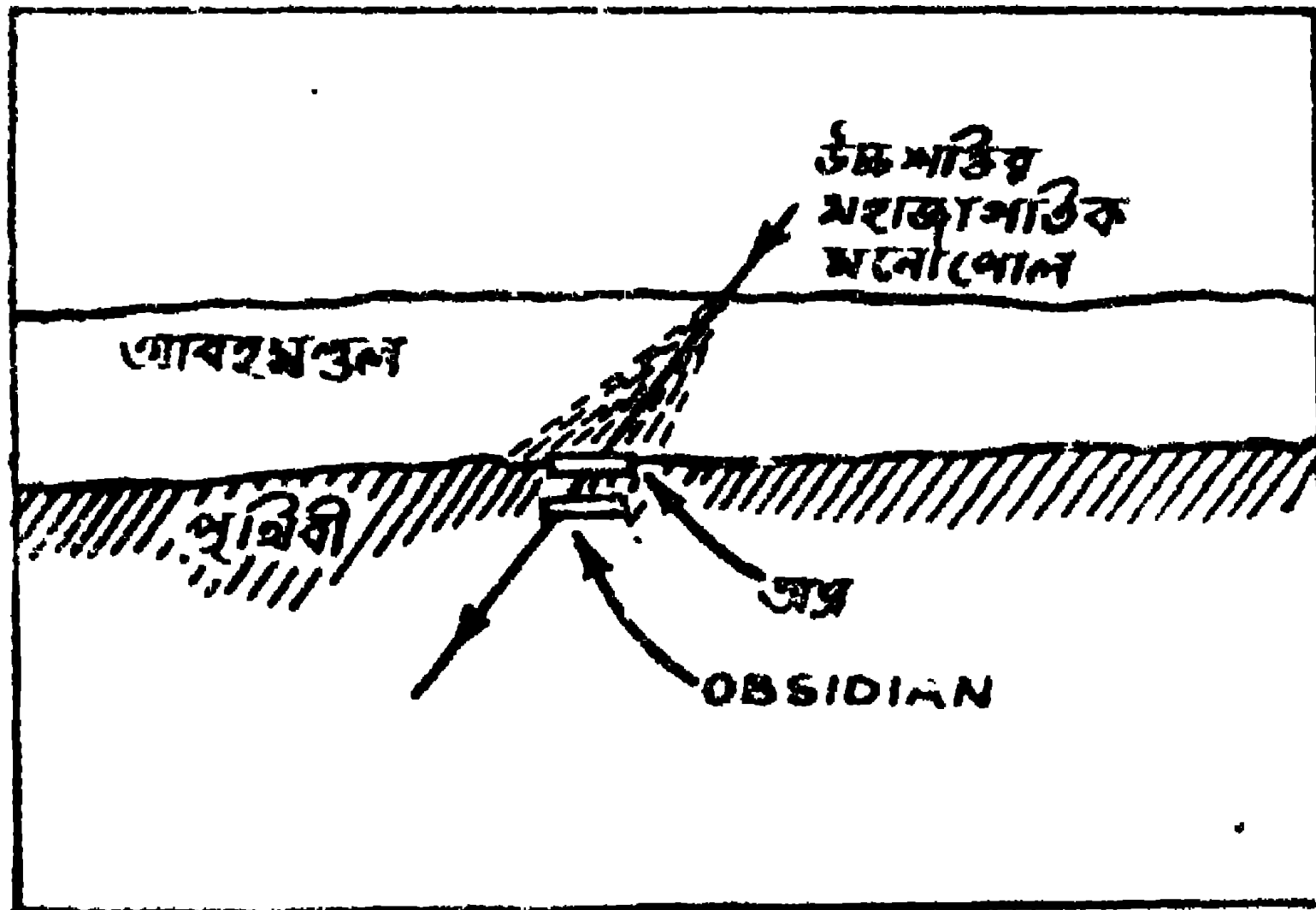
3নং চিত্র—মনোপোল অন্বেষণের এই প্রকল্পে শক্তিশালী মনোপোল কণাটিকে ভূত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে অভ্র বা obsidian-এর সাহায্যে এর নির্দেশন সম্ভব।

ev-এর উপরে) এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে এত শক্তিশালী যে, সেগুলিকে গ্যালাক্সীর হেঁয়ালির মতই রয়ে গেছে, কারণ কণাগুলি চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে ধরে রাখা সম্ভব নয়,

N. A. Porter-এর মতে এগুলি সবই মনোপোল। তাঁর মতে, এই কণাগুলির সৃষ্টি হয়েছে মহাশূন্যে সেই মহাবিস্ফোরণে, যার ফলে আমাদের এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। গ্যালাক্সীর চৌম্বক ক্ষেত্র ভাসমান এই কণাগুলিকে ক্রমশঃই ত্বরিত করতে থাকে, ফলে সেই মহাবিস্ফোরণের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় 100 কোটি বছরের ব্যবধানে কণাগুলির অস্বাভাবিক শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। মাঝে মাঝে এদেরেই দলছুট কিছু কণা এসে আমাদের পৃথিবীকে আঘাত হানে উচ্চশক্তির মহাজাগতিক রশ্মির পরিচয়ে। শক্তি, ভর ও চুম্বকীয় আধান অনুযায়ী এই কণাগুলি হয় মন্থর হয়ে তাপীয় গতি (Thermal velocity) প্রাপ্ত হয় এবং কঠিন পদার্থে ধরা পড়ে (2নং চিত্র), নয়তো ভূত্বকের গভীরে প্রবেশ করে (3নং চিত্র)।

1963 সালে E. Goto, H. Kolm ও K. Ford, M. I. T-র National Magnet Laboratory-তে উপরিউক্ত ধারণার যথার্থতা প্রমাণে সচেষ্ট হন। তাঁরা New York-এর Adirondack পর্বতে ভূত্বকের উপরিভাগে অবস্থিত ম্যাগনেটাইটের স্তরগুলি পরীক্ষা করেন। যদি কোন মনোপোল এইরকম কোন স্তরে আবদ্ধ থাকে, তবে বহুকাল অবধি কণাটিকে এই স্তরে পাওয়া যাবে এবং শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রের সাহায্যে কণাটিকে মুক্ত করে ফটোগ্রাফিক ইমালসনের (Photographic emulsion) মধ্যে দিয়ে পাঠানো যেতে পারে, যেখানে কণাটি তার যাত্রাপথ চিহ্নিত করে রেখে যাবে। এই পরীক্ষার সাহায্যে কোন মনোপোলের সন্ধান পাওয়া যায় নি। হয়তো লৌহস্তরের উপরিভাগ প্রাকৃতিক কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় মনোপোল পাওয়া যায় নি, কিম্বা হয়তো মনোপোল আদৌ নেই।

Goto ও তাঁর সঙ্গীরা উপরিউক্ত পদ্ধতিতে পৃথিবীতে ছুটে-আসা কিছু উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করেন; তাঁদের সে চেষ্টাও নিষ্ফল হয়। এক্ষেত্রে হয়তো বাতাসের ঘর্ষণে উল্কাপিণ্ডের উপরিভাগ জ্বলে যাওয়ায় মনোপোলটির স্থানচ্যুতি ঘটেছে কিম্বা মনোপোল বলে আদৌ কিছু নেই।

সম্প্রতি California University-র Lawrence Raditation Laboratory-তে বিজ্ঞানী L. W. Alverz অ্যাপোলো মহাকাশচারী কর্তৃক আনীত কিছু চান্দ্রশিলা পরীক্ষা করে কোন মনোপোলের সন্ধান পান নি।

মধ্যবর্তী শক্তির মনোপোলের সন্ধান সমুদ্রের তলদেশে পাওয়া যেতে পারে (2নং চিত্র)। 1968 সালে R. F. Fleischer ও তাঁর চারজন সঙ্গী এই উদ্দেশ্যে সমুদ্রের তলদেশের বহু নমুনা পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল: (1) এই পরীক্ষায় সমুদ্রের তলদেশের Ferromagnetic পদার্থের যে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেটির সঙ্গে সমুদ্রের প্রায় 16 কোটি বছর ধরে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। অতএব সেটির পক্ষে তাপীয় গতিপ্রাপ্ত কিছু মনোপোল ধরে রাখা সম্ভব ছিল;

(ii) এই মনোপোলগুলিকে উৎপাটন করবার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং

(iii) সলিড-ষ্টেট নির্দেশন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, যেটি শুধু উচ্চ আয়নন ক্ষমতাসম্পন্ন কণার ক্ষেত্রেই (যেমন, মনোপোল) সংবেদনশীল।

এই পরীক্ষায় প্রায় আট কে.জি সমুদ্রতলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়, কিন্তু কোন মনোপোল আবিষ্কার করা হয় নি।

উপরিউক্ত বিজ্ঞানীদের দলটি শক্তিশালী মনোপোল অন্বেষণের আরও একটি ক্ষেত্র, অর্থাৎ 3নং চিত্রের সম্ভাবনাটিও পরীক্ষা করেন। এই ক্ষেত্রে অবশ্য ভূত্বকের গভীর থেকে মনোপোল সংগ্রহ করা অসম্ভব; তবে কোন কোন প্রাকৃতিক

পদার্থে, যেমন অভ্র (Mica) ও Obsidian-এ সলিড-ষ্টেট নির্দেশন যন্ত্রের দুটি প্রধান গুণ বিদ্যমান থাকে; অর্থাৎ এগুলি শুধুমাত্র অত্যধিক আয়নকারী কণার যাত্রাপথ চিহ্নিত করতে সক্ষম এবং সে চিহ্নগুলিকে এগুলি বহুকাল অবিকৃত রাখতেও সক্ষম। এই পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা এমন অভ্রখণ্ড ব্যবহার করেছিলেন, সেটি প্রায় 185 থেকে 335 কোটি বছর ধরে বহু পথচিহ্ন সংগ্রহ করে রেখেছে। তবে মনোপোল যে ধরণের চিহ্ন রেখে যেতে পারে, সে রকম কোন চিহ্ন পাওয়া সম্ভব হয় নি।

মনোপোল—এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের মধ্যেও প্রকৃতির এক উদ্ধত চ্যালেঞ্জ। তাই মানুষ এক ছন্দপতনের সূত্র ধরে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃতির চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বহু ক্ষেত্রেই সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, অনেক বিজ্ঞানী তাঁদের পরীক্ষার সাহায্যে মনোপোল আবিষ্কারের সম্ভাবনাতেও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, কিন্তু কেউই মনোপোলের অস্তিত্বকে বাতিল করে দিতে সক্ষম হন নি। তাই মনোপোলের সম্যক পরিচয়ের আশায় আমাদের ভবিষ্যতের আরও চাঞ্চল্যকর কোন পরীক্ষার অপেক্ষায় থাকতে হবে।

সঞ্চয়ন

কীট-পতঙ্গের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম

কীট-পতঙ্গ মানুষের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি-সাধন করে থাকে। কত ভাবেই না কীট-পতঙ্গ মানুষের অনিষ্ট করে, এরা মানুষকে হত্যা করে, মানুষের খাদ্যবস্তু খেয়ে উজাড় করে দেয়, এক দেহ থেকে অন্য দেহে রোগ-জীবাণু সঞ্চারিত করে থাকে। কীট-পতঙ্গ যে মানুষের পয়লা নম্বরের শত্রু, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এই শত্রু সর্বত্র তার মরণফাঁদ বিস্তার করে রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কৃষি গবেষণা শাখার পরিচালক পদে ডক্টর ই. এফ. নিপলিং বহু বছর নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তরের সহযোগী এবং বিজ্ঞান উপদেষ্টার পদ অলঙ্কৃত করছেন। মানুষের পরম শত্রু ঐ কীটাদি সম্বন্ধে তিনি অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, যে কোন প্রাণীর চেয়ে এরা মারাত্মক। এই পতঙ্গের দল সব রকম পরিবেশেই থাকতে পারে। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সর্বত্রই এরা বেঁচে থাকে। এরা গাছগাছড়া কেটে সাবাড় করে। সব রকম জন্তুজানোয়ারকে আক্রমণ করে। মানুষও এদের উপদ্রব থেকে রেহাই পায় না। বহু রকমের কীট-পতঙ্গ দেখা যায়। শস্যের প্রভূত ক্ষতি এদের দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। আবাদী জমিতে বীজ থেকে শস্য অঙ্কুরিত হওয়া থেকে শস্য কাটা হয়ে গুদামজাত করা পর্যন্ত প্রতি স্তরে মানুষের ভোগ্য পণ্য কীট পতঙ্গের দ্বারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কীট-পতঙ্গ আমাদের খাদ্যশস্য ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয় না, তারা আরও অনেক কিছু করে। এই সম্পর্কে ডক্টর নিপলিং বলেছেন, কীট-পতঙ্গ ম্যালেরিয়া জ্বর বিকার, পীত জ্বর,

ফাইলেরিয়া এবং মানুষের আরও অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধি দেহ থেকে দেহান্তরে সংক্রামিত করে। শুধু তাই নয়, কীট-পতঙ্গ মানুষ ভিন্ন অন্যান্য প্রাণীর দেহেও রোগজীবাণু ছড়িয়ে থাকে। এই ধরণের সংক্রমণের ফলেই গবাদিপশুতে ঝিমুনি রোগ প্রভৃতি দেখা যায়। এই ধরণের রোগ থেকে মানুষও রেহাই পায় না। গাছগাছড়ার নানা ধরণের রোগ দেখা যায়, সেগুলি কীট-পতঙ্গের দ্বারাই এক গাছ থেকে অন্য গাছে সংক্রামিত হয়ে থাকে। জীবজগতের পরম শত্রু এই কীট-পতঙ্গ দমনের জন্যে অনেক চেষ্টা মানুষ করেছে। এই ব্যাপারে মানুষের ভাবনা-চিন্তা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। কীটের ধ্বংসসাধনে মানুষ সফলতাও লাভ করেছে।

কীটঘ্ন ওষুধের দ্বারা কীটনাশের পথটাই মানুষের সবচেয়ে সফলতার দিক। অবশ্য এই সব কীটঘ্ন ওষুধ প্রয়োগের ফলে নতুন নতুন অনেক বিপদও সংঘটিত হয়ে থাকে। ডক্টর নিপলিং এই কথা স্বীকার করে বলেছেন যে, কীটঘ্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি অতীতেও যেমন মানুষের কাছে অমূল্য সম্পদ ছিল, বর্তমানেও তেমনি আছে। ভবিষ্যতেও সেগুলি সমান অমূল্যই থাকবে। কীট দমনের জন্যে সর্বাধিক সার্থক নতুন কীটঘ্ন ওষুধ বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের গোড়ার দিকে প্রথম বেরোয়। এই সময়ে আবিষ্কার হয় ডি. ডি. টি। তারপর পঞ্চম দশকের গোড়া থেকে ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এক ডজন অথবা আরও কিছু বেশী জোরালো কীটঘ্ন ওষুধ একের পর এক বের হতে থাকে। কীট দমনের জন্যে মানুষ অনেক মারাত্মক রাসায়নিক ওষুধ আবিষ্কার করেছে। এইসব রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হলেও এইসব দ্রব্যের যথেচ্ছ প্রয়োগের ব্যাপারে অনেক রকম অপকারিতার কথাও বিদগ্ধ সমাজ থেকে উত্থাপিত হয়েছে।

যেমন ডি. ডি. টি-র কথাই ধরা যাক। কীটঘ্ন হিসাবে ডি. ডি. টি-র ব্যবহার খুবই সুবিধাজনক। এর সহজ প্রয়োগ ব্যবস্থার ফলেই এটিকে একটি মারাত্মক কীটঘ্ন ওষুধে পর্যবসিত করেছে। ডি. ডি. টি-র কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী। ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশা ধ্বংসের জন্যে ঘরের দেয়াল বা জলা জায়গায় ডি. ডি. টি ছড়ানো-ছিটানো হলে এর বিষক্রিয়া অনেক কাল ধরে বজায় থাকে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের দেহে ডি. ডি. টি. র বিষ সংক্রামিত হয়ে খাদ্যের ভিতর দিয়ে তা প্রাণীদেহে সংক্রামিত হয়। এই সব সংক্রামিত পশুর মাংস যে খায়, শেষ পর্যন্ত তার দেহেও ডি. ডি. টি-র বিষক্রিয়া প্রভাব বিস্তার করে। এই ভাবে ডি. ডি. টি-র তেজস্কর তথা অবিনশ্বর বিষ-শক্তি দেয়াল থেকে স্তরে স্তরে বিভিন্নরূপে মানব-দেহে গিয়ে সংক্রামিত হয়। এই ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি মানুষের দেহের মাংস-পেশীতে বর্তমানে কিছু না কিছু ডি. ডি. টি. সঞ্চারিত হয়ে আছে।

কিন্তু তার জন্যে আমাদের ভীত হতে নিষেধ করেছেন ডক্টর নিপলিং। তাঁর অভয়বাণীতে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন যে, ডি. ডি. টি. ও অন্যান্য কীটঘ্ন ওষুধের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবার জন্যে মানুষের খাদ্যদ্রব্যের নিরাপত্তার জন্যে বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। কেননা খাদ্য বস্তুতে কীটঘ্ন ওষুধের অবশেষ কতখানি আছে, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আর তা ছাড়া, ঐগুলি মেনে নেবার উপযোগী একটা সহনশক্তি মানুষের দেহে আপনা থেকেই এসে যাচ্ছে।

এই রকম পরিস্থিতিতে ডক্টর নিপলিং কীট-পতঙ্গের সমস্যা সমাধানের জন্যে কিছু বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছেন। এই সব নতুন বিকল্প পন্থার কয়েকটি প্রথম প্রথম বিতর্ক-মূলক মনে হতে পারে। যে সব কীট বিনাশের জন্যে মানুষ উঠেপড়ে লেগেছে, সেই সব লক্ষ

লক্ষ কীটই পালন করতে হবে ও খেতখামারে ছেড়ে দিতে হবে। এই সব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে স্ত্রী-গুবরে পোকাগুলি যেভাবে নানা প্রলোভন দেখিয়ে পুরুষ পোকাদের আকৃষ্ট করে সেই পন্থার উন্নতিসাধন। মানুষের মত কীট-পতঙ্গও ভাইরাস ও রোগ-জীবাণুর দ্বারা নানা ভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কাজেই কোন খামারে তামাকের পোকার দেহে ডবল নিউ-মোনিয়া সঞ্চারিত করতে পারলে তামাকের চাষের জন্যে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। সৌভাগ্যের কথা, যে জাতের ভাইরাস কীট-পতঙ্গের দেহে জীবিত থাকে, মানুষের দেহে তা থাকে না।

কীট-পতঙ্গ বিনাশের আরও কতগুলি উপায় আছে। এই উপায়ে কোন কোন কীট-পতঙ্গ ধ্বংস হবে, কিন্তু অন্য কোন কোন কীট-পতঙ্গের ক্ষতি সাধিত হবে না।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, এমন কতগুলি কীটঘ্ন ওষুধ আছে, যেগুলি কেবলমাত্র বিশেষ কয়েক ধরণের কীটের ক্ষতি করবে। এই ধরণের কীট মাছ বা বন্যপ্রাণীর অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্ট করে। এই সব নতুন আবিষ্কৃত কীটঘ্ন ওষুধ কীট-পতঙ্গের জীবনবর্ধক হর্মোন থেকে উৎপন্ন।

এই সব হর্মোন কীট-পতঙ্গের দেহ থেকে উদ্ভূত বলে এবং এইগুলি কোন কোন বিশেষ ধরণের পতঙ্গের ধ্বংসের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে বলে মানুষ অথবা অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে এগুলি মারাত্মক নয়। এই সব কীটঘ্নের কোন কোনটি আবার পতঙ্গকে চিরতারুণ্য দান করে। এই ধরণের ওষুধ ব্যবহার করে চিরতরুণ হয়ে থাকা বা প্রিয় কোন প্রাণীকে চিরকাল কচিকাঁচা করে রাখবার জন্যে মানুষের মনেও স্বপ্ন বাসা বাঁধে। তবে চির নবীনত্ব প্রদায়ী এই রকমের হর্মোন পরিমাণে কীটের বংশকেই লোপ করে দিতে পারে। ওষুধ প্রয়োগের ফলে বিশেষ বিশেষ কীট হয়তো আকারে বড় হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তারা কোন দিনই প্রজননক্ষমতা লাভ করবে না। ফলে এই প্রজন্মের পর তাদের বংশ থাকবে না। তাই এই ধরণের কীটঘ্ন আজকাল খুব কমই প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ডক্টর নিপলিং বলেছেন যে, মশা আর মশার ডিম বিনাশ করবার জন্যে হর্মোনঘটিত এই নতুন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারার্থে রেজেষ্ট্রারি-ভুক্ত হয়েছে। প্রচলিত মামুলী কীটঘ্ন ওষুধে পৃথিবীর কোন অঞ্চলের মশাই এখন আর বাগ মানতে চায় না।

মার্কিন বিজ্ঞানী এমন পরিস্থিতিতে একটা অতি প্রয়োজনীয় সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। কীটঘ্ন ওষুধ প্রয়োগ করলে যদি এক কোটি মশাকে বিনাশ করে দেয় এবং মাত্র গোটা-চারেক মশা একেবারে অক্ষত থাকে, তা হলে বোঝা যাবে তাদের 'জীনে' সংক্রমণ পরিপন্থী এমন শক্তি রয়েছে, যার ফলে বিশেষ কোন কীটঘ্ন ওষুধে তারা দমে না। তাদের গায়ে যেমন কোন আঁচ লাগে না, অন্য দিকে তারা কিন্তু বংশবৃদ্ধিও করতে পারে না। কাজেই মশকজাতির এক নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠছে, যারা ডি. ডি. টি.-র আধিপত্যের কথা একদম ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে। যেহেতু ডি. ডি. টি. দিয়ে এখন আর কোন কাজ হয় না, কাজেই এর বিকল্প অন্য কোন ওষুধের কথা চিন্তা করতে হবে। এই সব নতুন কীটঘ্ন লিনডেন, ডিয়েলড্রিন, ম্যালাথিয়ন এবং আরও অনেক কিছু হতে পারে। এই সব রাসায়নিক দ্রব্যও যদি প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে পড়ে, তা হলে মানুষকে একদিন কীটঘ্ন ওষুধ প্রয়োগের কার্যসূচী ত্যাগ করতেই হবে। এতে কেবল মানুষের পরিবেশই বিষাক্ত হবে। আর চার দিকে ভ্যান ভ্যান

করবে বিষ প্রতিরোধক ঝাঁকে ঝাঁকে দুর্বিনীত মশক বাহিনী।

এই প্রথায় কীট-পতঙ্গ দমন করা সম্ভব হচ্ছে না বলেই ডক্টর নিপলিং এর পরিপূরক অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে জোর দিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন যে, কীট প্রভৃতি দমনের জন্যে রোগ-জীবাণু ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যে সব রোগ-জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয় কীট-পতঙ্গও সেই সব জীবাণুর দ্বারা সমান ভাবেই কবলিত হয়ে থাকে। কাজেই নানা ধরণের রোগ-জীবাণু সৃষ্টি করে স্থান ও কাল অনুসারে সেইগুলি কীট দমনের কাজে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে স্বাভাবিক রোগ-জীবাণুর চেয়ে এদের দমন-পীড়ন আরও ব্যাপক হতে পারে।

কীট বিনাশের ব্যাপারে ভবিষ্যতে এই সব ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে হবে বলে আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে ডক্টর নিপলিং বলেছেন যে, জীবদেহের রোগ-জীবাণু প্রয়োগ করে কীট দমনের ব্যাপারে এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তবে কোন কোন পতঙ্গের রোগ-জীবাণু বর্তমানে প্রয়োগ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, জাপানী গুবরে পোকার ডিম এক বিশেষ ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়। বিগত কিছু কাল যাবৎ ঐ রোগ-জীবাণু কীট দমনে প্রয়োগ করা হচ্ছে। তামাক গাছ, বাঁধাকপি প্রভৃতির কীট দমনের জন্যে এক ধরণের জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

কীটঘ্ন ওষুধের ব্যবহার না করে রোগ-জীবাণুর প্রয়োগের দ্বারা কীট-পতঙ্গ দমনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এক প্রকারের মারাত্মক মাছির দমন। ঐ মাছির ডিম ক্ষতস্থানের মধ্য দিয়ে গবাদিপশুর ত্বকে প্রবেশ করে। তারপর আস্তে আস্তে সেই পশুর মাংস ও চামড়া সমূলে বিনাশ করে দেয়।

সুখের কথা যে, ঐ মারাত্মক মাছি কিন্তু আর ঐ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় না। ফ্লোরিডার জর্জিয়া প্রভৃতি এলাকায় সেই মাছির কোন অস্তিত্ব নেই। কীটদমনকারীরা লক্ষ লক্ষ পুরুষ মাছিকে ধরে তাদের উপর নব্বই কোবাল্টের তাপ বিকিরণ করে নির্বীজন করে ওদের ছেড়ে দিয়েছে। বন্ধ্যা মাছি প্রজননশক্তিসম্পন্ন বন্য মাছির সঙ্গে যৌন মিলন ঘটিয়েছে। এর ফলে যে ডিম হয়েছে, সেগুলি ফুটে কিন্তু আর বাচ্চা বেরোয় নি। এই ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ক্যারাবিয়ান দ্বীপে অবলম্বন করতে দেখা যায়। তারপর এর সফল প্রয়োগ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। কিন্তু এই অঞ্চলের দূরবর্তী কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে মাছি-দমনের এই অভিযান অবিরাম গতিতে চলছে। প্রতি সপ্তাহে সেখানে 20 কোটি মাছিকে নির্বীজন করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

পুরুষগুলিকে নির্বীজন করে মাছি দমনের এই পদ্ধতি এত কার্যকরী হয়েছে যে, তুলার পোকা, গুবরে পোকা প্রভৃতি অন্যান্য মারাত্মক কীট-পতঙ্গ দমনের ব্যাপারে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু পোকা-মাকড়ের দমনের জন্যে আরও অন্যান্য অমোঘ কৌশলও অবলম্বন করা হচ্ছে।

ডক্টর নিপলিং কীট পতঙ্গ ধ্বংসের আরও একটি অভিনব কৌশলের কথা শুনিয়েছেন। সেটা হলো ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে পোকা-মাকড়কে আকৃষ্ট করা। এই কৌশল সম্বন্ধে সকলেরই প্রবল আগ্রহ দেখা গিয়েছে। আর ব্যবস্থার উন্নতিও দিন দিন অনেক সাধিত হয়েছে।

মথ, প্রজাপতি এবং গুবরে পোকা প্রভৃতি মারাত্মক কীটাদির স্ত্রীজাতীয় পোকাগুলি নিজ নিজ দেহ থেকে একটা বিশেষ গন্ধ নিঃসৃত

করে। তার ফলে পুরুষ কীটগুলি খুব আকৃষ্ট হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষজাতীয় পোকারাও সুবাস বিলিয়ে থাকে। সে যাই হোক, এর ফল খুব সুদূরপ্রসারী হয়

তিনি আরও বলেছেন যে, বিগত দুই দশক অথবা এই রকম সময়ের মধ্যে রসায়ন-বিজ্ঞান এতদূর অগ্রগতি লাভ করেছে যে, আজকালকার রসায়ন-বিজ্ঞানীরা এই সব অতি সক্রিয় প্রাকৃতিক জিনিষগুলিকে আলাদা করতে, সনাক্ত করতে এবং কৃত্রিমভাবে তৈরী করতে পারেন।

কাজেই এই উপায়ে ভবঘুরে মথ অথবা গোলআলুর পোকাকে একই ফাঁদে বন্দী করে ঝাঁকে ঝাঁকে মেরে শেষ করা যায়।

কীট-পতঙ্গ দমনের অনেক কৌশলের কথাই তো এখানে বিশ্লেষণ করা হলো। এখন প্রশ্ন হলো কীটনাশের কোন্ পথটা সবচেয়ে বেশী সমীচীন? আর কোন্ পথই বা আমরা অবলম্বন করব?

ডক্টর নিপলিং এই প্রসঙ্গে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন যে, আমাদের কীটধ্বংসের সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করা বিধেয়। একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গুবরে পোকার বীজ দূর করার জন্যে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে যেখানে যেটা খাটে, সেই হিসেবে কীটঘ্ন ওষুধের প্রয়োগ, ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রলোভন বা নির্বীজন প্রক্রিয়া—সব অস্ত্রের সংহতিসাধন করতে হবে।

কীট-পতঙ্গ বিনাশের দীর্ঘতম যুদ্ধে মানুষের বিজয়শঙ্খ হয়তো একদিন নিনাদিত হয়ে উঠবে। কিন্তু ডক্টর নিপলিং আমাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, কীট-পতঙ্গের সঙ্গে মানুষের এই যুদ্ধের কোন দিনই অবসান হবে না। ওরা যেমন সংখ্যায় প্রচুর, আকার-প্রকারেও তেমনি অসীম। এই সমস্যা সমাধানে দিন দিনই আমাদের উন্নতি হচ্ছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 62তম অধিবেশন

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

1963 সালের পর এক যুগ ব্যবধানে 1975 সালে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের আসর বসেছিল। এবার ছিল বিজ্ঞান কংগ্রেসের 62তম বার্ষিক অধিবেশন। নানা কারণে এবারের অধিবেশনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান কংগ্রেসের দীর্ঘ 62 বছরের ইতিহাসে এইবার প্রথম একজন বিশিষ্ট মহিলা-বিজ্ঞানী মূল সভাপতির পদে বৃত হয়েছিলেন। আর রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশে এই বছরটি 'আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ' রূপে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। তাই প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় মূল সভাপতি হওয়ায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারের অধিবেশনটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল।

তেসরা জানুয়ারী সকালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিজ্ঞান কংগ্রেসের 62তম অধিবেশনের উদ্বোধন হয়। বহু বছর ধরে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করে আসছি। কিন্তু এই বছরই প্রথম দেখলুম উন্মুক্ত প্রান্তরে মূল অধিবেশন হচ্ছে। এ এক

বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যা সবচেয়ে বেশী পীড়িত করেছিল তা হচ্ছে, মূল সভাপতি, উদ্বোধক ও দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বসবার মণ্ডপের দৈন্যদশা। 62তম বার্ষিক অধিবেশনের নির্দেশক কোন ফেষ্টুন ছিল না সেই মণ্ডপে, ছিল না দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রতীকচিহ্ন। আর মণ্ডপ আলোকিত করবার জন্যে যে বিজলী বাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল।

উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আর. সি. মেহরোত্রা সমবেত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রতিনিধিদের স্বাগত জ্ঞাপন করেন। এরপর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এস. এম. সরকার বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের পরিচিতি প্রদান করেন এবং বিদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থা প্রেরিত শুভেচ্ছা-বাণী পাঠ করেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল অধিবেশনে সভাপতি অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণ পাঠ করছেন ; ডানদিকে উদ্বোধক প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

এবার বিদেশ থেকে 20 জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় আড়াই হাজার প্রতিনিধি কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আফগানিস্থানের ডক্টর এস. এম. হোসেন ; বাংলাদেশের অধ্যাপক এইচ. আমেদ, ডক্টর এম. আলিম বিশ্বাস, ডক্টর এম. মিজাহুল ইসলাম ; শ্রীলঙ্কার অধ্যাপক বেনেট জয়ইরা, চেকোশ্লোভাকিয়ার ডক্টর লাদিস্লাভ মাচো ; পশ্চিম জার্মেনীর অধ্যাপক রেনার আনসার্জ ; পূর্ব জার্মেনীর অধ্যাপিকা (শ্রীমতী) হেলগা বুকে, ডক্টর হেনিং লরটার ; হাঙ্গেরীর অধ্যাপক এফ. মার্তা ; ইরানের ডক্টর আলী আফজলপুরী ; জাপানের অধ্যাপক টি, ওতানবি ; মালয়েশিয়ার

ডক্টর জেরারানে ক্যাখিরিথাস্রি; পোল্যাণ্ডের অধ্যাপক ইগনাসি মালেকি; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডক্টর রোজার রেভেলি এবং সোভিয়েট রাশিয়ার অ্যাকাডেমিশিয়ান এস. এফ. সেভেরিন এবং ডক্টর এ. আই. ভোলোদারস্কি।

অধিবেশনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। উদ্বোধনী ভাষণের আগে তিনি কয়েকজন তরুণ বিজ্ঞানীকে তাঁদের কর্মকৃতির নিদর্শনস্বরূপ ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান আক্যাডেমি পদক অর্পণ করেন। উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন—1975 সাল আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ হিসাবে পালিত হচ্ছে। এমন এক সন্ধিক্ষণে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করছেন একজন প্রখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী। সারা পৃথিবীতে এই ঘটনা সুন্দর দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো।

সাম্প্রতিক পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত গবেষণায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে শ্রীমতী গান্ধী বলেন—এই ঘটনায় আমরা সকলে আনন্দিত। কিন্তু এই সঙ্গে অন্যান্য দিকও আমাদের দেখা দরকার। দেশের জনসাধারণকে যাতে বিজ্ঞান-সচেতন করে তোলা যায়, তার জন্যে বিজ্ঞানীদের সচেষ্ট হতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে কলকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গের বিজ্ঞানীদের প্রশংসা করে তিনি বলেন—কৃষিকার্যে পশ্চিম বঙ্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা বীজ-সংরক্ষণ ব্যবস্থা। এর অভাবেই চাষের জন্যে সেখানকার মানুষকে বীজের সন্ধানে ছুটতে হয় পাঞ্জাব, হরিয়ানার মত দূরাঞ্চলে। অথচ পশ্চিম বঙ্গে কৃতী বিজ্ঞানীর সংখ্যা অনেক বেশী। আমার তাই প্রশ্ন, চেষ্টা করলে তাঁরা কি এই ধরণের সমস্যার সমাধান বের করতে পারেন না?

শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণের পর মূল সভাপতি অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণের প্রারম্ভে বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি আচার্য সত্যেন বসু এবং ডক্টর লক্ষণস্বামী মুদালিয়রের প্রয়াণের কথা উল্লেখ করে সমবেত সকলকে এক মিনিট নীরবে দাঁড়াবার জন্যে অনুরোধ জানান। তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়।

এতদিন প্রচলিত রীতি ছিল মূল সভাপতি পদে যিনি বৃত হন, তিনি তাঁর ভাষণে নিজের গবেষণার ক্ষেত্র বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু এবার মূল সভাপতি অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায় তার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিলেন 'ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'। এতে তাঁর নিজের গবেষণার ক্ষেত্র রসায়নের স্থান ছিল গৌণ। এদেশে বৈজ্ঞানিক উদ্যোগের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং কিভাবে তা দূর করা যায় তার উপরই গুরুত্ব দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য বলেছিলেন।

তিনি বলেন—পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনার বর্তমান বছরটি দেশের কাছে এক সন্ধিক্ষণ। ইতিমধ্যে চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অতিক্রান্ত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতির দিক থেকে বিচার করলে এই সময়ের মধ্যে মৌল গবেষণার অনেক কাজ আমরা করেছি। কিন্তু ফলিত গবেষণার উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। দেশের সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, জলসরবরাহ, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জাতীয় লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

এই প্রসঙ্গে তিনি বিদ্যালয়স্তর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান-সচেতন করে তোলবার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলেন—দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় ও প্রগতি ত্বরান্বিত করতে হলে বিদ্যালয়স্তর থেকে ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন

করে তুলতে হবে। এজন্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বৈজ্ঞানিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ে লোকরঞ্জক বক্তৃতা, বিজ্ঞান সংগ্রহশালা, হাতে-কলমে কেন্দ্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে এবং শুধু শহরাঞ্চলে নয়, গ্রামাঞ্চলেও এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। এই ব্যাপারে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস একটি কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায় বলেন—বিশ্ববিদ্যালয়েই আমাদের প্রতিভাধর তরুণ ছাত্রছাত্রীরা শেষ স্তরের শিক্ষণ পেয়ে থাকে। সাধারণের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বগত গবেষণার দিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী, ফলিত গবেষণার দিকে তেমন নজর দেওয়া হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসাবে আমি বলতে পারি, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বগত গবেষণার দিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে সত্য, কিন্তু একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, মৌলিক গবেষণার ফল হচ্ছে ফলিত গবেষণা।

গবেষণার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন—আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাখাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা নিতান্তই অপ্রতুল। জাপানে গবেষণা ও উন্নয়নখাতে ব্যয়বরাদ্দের অর্ধেক পরিমাণ দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। সেই তুলনায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার জন্যে যে অর্থসাহায্য করা হয়, তা অতি নগণ্য। তরুণ বিজ্ঞানীদের প্রতিভা বিকাশের জন্যে অর্থের পরিমাণ বাড়ানো উচিত বলে আমি মনে করি। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে উচ্চমানের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং তাঁদের যথোপযুক্ত বেতন ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

তিনি বলেন—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর বহু সংখ্যক বিজ্ঞান-স্নাতক বেরিয়ে আসেন। তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এখন একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যার আশু সমাধান না হলে সামাজিক সমস্যাই শুধু বাড়বে। দেশের সমৃদ্ধির জন্যে দরকার বেশী সংখ্যক বিজ্ঞানী নয়, প্রযুক্তিবিদ্।

অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায় ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন, কেউ কেউ বলে থাকেন স্বাধীনতার পর এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা কতটুকু সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন? যে প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণার জন্যে ব্যয় করা হচ্ছে, তার প্রতিদানে দেশ কতখানি উপকৃত হয়েছে? এর উত্তরে এটুকু বলতে পারি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাফল্য শিল্পসমৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করা সব সময় সম্ভব নয়। এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও দক্ষ গবেষকের অভাব নেই। তবু আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত না হবার কারণ—যেসব সংস্থায় তাঁরা কাজ করেন, সেখানকার দুর্বল পরিচালন ব্যবস্থা।

ভারতীয় ভেষজ গবেষণার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন—এদেশে ভেষজ গবেষণায় রসায়ন-বিদ্দের বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তবে আরও ব্যাপক গবেষণা দরকার। এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করে সংশ্লেষিত প্রকৃতিজ ভেষজ উদ্ভাবনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিশেষে বিজ্ঞান ও মানবিকতা প্রসঙ্গ আলোচনা করে অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায় বলেন—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নয়নের আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে, যদি আমরা বিজ্ঞানের মানবিক দিকটির প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব না দিই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা উভয়ই বিশ্বের সকল জাতির সাংস্কৃতিক, অর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক কার্যকলাপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে

জড়িত। বিজ্ঞান ও মানবিকতার সমন্বয় আজ একান্ত দরকার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার লক্ষ্য শুধু বৈষয়িক সমৃদ্ধি নয় বিশ্বভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ এক উন্নততর বিশ্বরচনাও তার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য-সাধনে বিজ্ঞানীদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাময় বাণী উল্লেখ করে তিনি উপসংহার করেন—

'জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছুসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসি—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।'

অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণের মধ্যে চিন্তা করবার অনেক কিছু ছিল এবং সে কারণে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিদের কাছে তাঁর বক্তব্য সমাদৃত হয়েছিল।

এতদিন বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন চলতো এক সপ্তাহব্যাপী। কিন্তু এবারই প্রথম দু-দিন কমিয়ে 5 দিন অধিবেশন বসেছিল। তার ফল ভালই হয়েছিল। অন্যান্য বছর শেষ দু-তিন দিনে আলোচনার আসরে বিশেষ কাউকে দেখা যেত না। এবার সব কয়টি আলোচনা-চক্রেই যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এটি শুভ লক্ষণ নিঃসন্দেহে। সময় সংক্ষেপিত হওয়ায় উদ্বোধনী দিবসেই মধ্যাহ্নে তেরটি বিভিন্ন শাখার সভাপতিরা তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন এবং বিভিন্ন আলোচনাচক্র শুরু হয়।

অন্যান্য বারের মত এবারও বিভিন্ন শাখায় বিশেষ বক্তৃতা, কয়েকটি স্মৃতি-বক্তৃতা এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের লোকরঞ্জক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রতিনিধিদের জন্যে কয়েক দিন রাত্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান পুস্তকের একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

যে প্রত্যাশা নিয়ে আমরা এবার দিল্লীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের 62তম অধিবেশনে যোগদান করতে গিয়েছিলাম, তার অনেকটাই পূর্ণ হয় নি। বিশেষ করে হতাশ করেছিল অভ্যর্থনা সমিতির পরিবহন ব্যবস্থা। শুধু প্রথম দিন ষ্টেশন থেকে বিভিন্ন হোষ্টেলে যাবার পরিবহন ব্যবস্থা ছিল, অধিবেশন চলাকালীন আর কোন দিনই পরিবহন পাওয়া যায় নি। এর ফলে আমাদের বিশেষ করে মহিলা প্রতিনিধিদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। প্রতিনিধিদের প্রীতিসম্মেলনে আপ্যায়িত করা হয়েছিল একটিমাত্র দিনে, তাও নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়েও অনেকের ভাগ্যে এক কাপ চা-ও জোটে নি! এবারের অধিবেশনে যা দেখেছি যা শুনেছি, তাতে মধুস্মৃতি নিয়ে দিল্লী থেকে ফিরতে পারি নি—একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না।

পুস্তক পরিচয়

সংকলন—জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, 54/3 কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-12, 1973। পৃষ্ঠা সংখ্যা 240। মূল্য 8 টাকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন নীলরতন সরকার অধ্যাপক ও ও বিভাগীয় প্রধান ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ীর সত্তর বৎসর বয়স পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহার শিষ্য ও গুণগ্রাহিরা তাঁহার রচনাগুলির আলোচ্য সংকলনটি প্রকাশ করেন। শিক্ষক হিসাবে ও প্রাণিবিজ্ঞানের গবেষণায় তাঁহার খ্যাতি সুবিদিত। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার বাংলা লেখা ও এই বিষয়ে গভীর আগ্রহের কথা ততটা পরিচিত নয়। এই সংকলনটি সেই দিক দিয়া খুবই মূল্যবান। একজন প্রকৃত অধিকারীর হাতে বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা কিরূপ হইতে পারে এই সংকলনের কয়েকটি প্রবন্ধপাঠে তাহা সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

সংকলনের প্রবন্ধগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কেরেটিমা কেঁচো, উত্তর ভারতে দক্ষিণী ব্যাং, রক্তলেহী বাদুড়, মাছ, প্রাণী-বিদ্যায় শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণের মূল নীতি, কৃকলাস, আধুনিক গবেষণায় ব্যাং ও ময়ূর—এই আটটি প্রবন্ধ প্রাণী-বিদ্যা বিষয়ে। প্রবন্ধগুলি সরল, সাবলীল ও জনপ্রিয় ভাষায় লিখিত। ব্যাং সম্বন্ধে প্রবন্ধ দুইটি তাঁহার নিজের গবেষণাভিত্তিক। ময়ূর প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে কাব্যও আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে বিজ্ঞানের তথ্যনিষ্ঠা ভারাক্রান্ত হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু প্রবন্ধটি অধিকতর সুখপাঠ্য হইয়াছে।

বাংলায় বিজ্ঞান রচনা ও পরিভাষা সম্পর্কে দশটি প্রবন্ধ এই সংকলনের দ্বিতীয় অংশ। বাংলা পরিভাষা, রচনাশৈলী, অক্ষরান্তরিত ইংরেজী শব্দের বানান সমস্যা প্রভৃতি সম্পর্কে ডক্টর ভাদুড়ীর প্রবন্ধগুলি প্রায় গবেষণার পর্যায়ে পড়ে। পরিভাষা সম্পর্কে তাঁহার আগ্রহ কতটা গভীর ও ঐকান্তিক, তাহা এই প্রবন্ধগুলি পাঠে জানা যায়। ইংরেজি নার্ভ (Nerve) ও প্রোটো-প্লাজম (Protoplasm) শব্দ দুইটির বাংলা পরিভাষা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ 22 পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনায় তিনি বাংলা 1280 সন থেকে 1340 সন অবধি দীর্ঘ ষাট বৎসরের পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে ইহাদের যে পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার তালিকা দিয়াছেন। ইদানীং পরিভাষা সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করিয়া থাকেন ও পরিভাষা সংকলনের কথা বলেন। তাঁহাদের নিকট এইপ্রবন্ধটি দিগ্‌-দর্শক হিসাবে কাজ করিবে। ভাবিলে দুঃখ হয়, ডক্টর ভাদুড়ীর মত আরও কাহারও কাহারও হয়তো পরিভাষা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, আগ্রহ ও সংগ্রহ ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সম্মিলিত-ভাবে বাংলা পরিভাষা রচনার কোন ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা হইল না।

এই অংশে আর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ বাংলা পরিভাষার গ্রন্থপঞ্জী। এই তালিকাটি বাংলা পরিভাষা রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিবে। পরিভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্রন্থকারের পত্রবিনিময় প্রবন্ধগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে।

পরিশেষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে লেখা বিক্ষিপ্ত রচনার সংকলনে একটি ত্রুটি সব-সময়েই থাকে। তাহা হইল যে, ঐরূপ সংকলন কোন বিশেষ পাঠক শ্রেণীর উপযোগী নয়। যেমন এই সংকলনের প্রাণী-বিষয়ক রচনাগুলি স্কুল হইতে সুরু করিয়া কলেজের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠকের নিকটও খুবই আকর্ষণীয়। পরিভাষা সম্পর্কিত অংশটি কেবলমাত্র আগ্রহী বিজ্ঞান লেখকের উপযোগী। অথচ সমগ্র পুস্তকটিই ক্রয় করিতে হইবে। শুধুমাত্র প্রাণী-বিদ্যা বিষয়ক প্রথম আটটি প্রবন্ধ লইয়া একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ সুলভমূল্যে প্রকাশিত হইলে তাহা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগের পাঠ্য ও পারিতোষিক পুস্তকের সমাদর লাভ করিবে বলিয়া মনে করি।

রাধাকান্ত মণ্ডল

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী – 1975

অষ্টাবিংশতিতম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

1973 সালের এপ্রিল মাসে ফ্লোরিডা থেকে পায়োনিয়ার-11 মহাকাশযান শনিগ্রহের অভিমুখে উৎক্ষিপ্ত হয়। পায়োনিয়ার-11-এর 1979 সালে শনিগ্রহে পৌছুবার কথা। 260 কিলোগ্রামের মহাকাশযানটি শনির সর্ববৃহৎ উপগ্রহ টিটিয়ানে প্রবেশ করবার পর 20,000 কিলোমিটার অতিক্রম করবে। এই স্থানেই জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে। কারণ এই স্থানে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব আছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

সিংহ

'সিংহ মশায় সিংহ মশায় মাংস যদি চাও ; রাজহংস দেব খেতে হিংসা ভুলে যাও'। এই ছোট্ট একটি ছড়ার ভিতরে সিংহকে মাংসলোভী হিংস্র প্রাণী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সিংহ বংশের এমন দূরবস্থা যে, ছড়াটি যদি পাল্টে মানুষকে সম্বোধন করা হতো, তাহলে বোধ হয় যথোপযুক্ত হতো। বস্তুতঃ এই বন্য সিংহ, যারা পুরাণের দেবীবাহন, পশুকুলাধিপতি, মানব সমাজের বহুবিধ রূপক ও পদবী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তার মূলে রয়েছে তাদের সঙ্গে মানুষের বহুদিনের পরিচয়। কিন্তু এই পরিচয়ের প্রতিদানে মানুষ পেয়েছে কেবল মৃত্যুর অভিশাপ। আজ তাই আমাদের চরম খেয়ালী জিঘাংসা প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির রোষ এদের ভারতের মাটিতে নিশ্চিহ্নপ্রায়

বিশ্রামরত সিংহ

আলোকচিত্র—প্রদ্যোতকুমার চট্টোপাধ্যায়

করে ফেলেছে। সময় থাকতে সতর্ক না হলে অদূর ভবিষ্যতে সিংহ হয়তো কেবলমাত্র সিংহাসনে খোদাই হয়ে থাকবে, আর ছোটদের কাছে হবে রূপকথা মাত্র।

সিংহের (Panthera leo, Linn) দৈহিক বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা সকলের আছে। বরং ভারতের মাটিতে তাদের আসন ও

অবলুপ্তির কারণ হিসেবে দু-একটা কথা বলা দরকার। সিংহের জীবাশ্ম (Fossil) ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মেনীতে পাওয়া গেছে। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমগ্র মধ্য ইউরোপ তাদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। গ্রীসে, বলকান ও ডানিয়ুব নদীর উপত্যকায়ও এদের বাস ছিল। তারপর ইউরোপ থেকে কিছু চলে যায় আফ্রিকায় এবং পরমানন্দে রাজত্ব বিস্তার করতে থাকে। আর কিছু ইরাক, ইরাণ ও বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে পাড়ি দেয় ভারতের মাটিতে এবং এখানে 'পশুরাজ' উপাধি লাভ করে। দক্ষিণে নর্মদা নদীর উপকূল পর্যন্ত এদের বিস্তার ছিল। এদের সীমিত বিস্তৃতি প্রমাণ করে যে, এরা ভারতে অপেক্ষাকৃত অনেক পরে এসেছে।

সিংহ গভীর অরণ্যের চেয়ে একটু আলো-বাতাসযুক্ত খোলামেলা জায়গায় থাকতে ভালবাসে। অবশ্য ছোটখাটো ঝোপঝাড় এবং বাঁশকাঁটার জঙ্গলও এদের দুপুরের বিশ্রামের জন্যে দরকার। রোদ, তাপ এবং শুকনো আবহাওয়া এরা অনেক বেশী সহ্য করতে পারে। মরুভূমি বা কিছুটা মরুভূমির মত জায়গায় বাসের অভ্যাসের ফলে এদের গায়ের রংও ধূসর কিংবা বালির মত হয়েছে। এতে ওদের শিকারের চোখে ধূলি দিয়ে বালির সঙ্গে শরীরের রং মিলিয়ে শিকারের অপেক্ষায় বালির উপর চুপটি করে বসে থাকতে সুবিধা হয়।

ভারতীয় সিংহ লম্বায় 9 ফুট 7 ইঞ্চির মত হয়ে থাকে বলে জানা গেছে। আর এই এতবড় শরীরটাকে খাদ্য যোগাবার জন্যে ওদের ছোটখাটো জীব-জন্তু দিয়ে পোষায় না। বড় বড় গরু, মহিষ, বুনো ছাগল, হরিণ প্রভৃতি এদের প্রধান খাদ্য। সিংহের মেজাজটা একটু অলস প্রকৃতির। খুব একটা বেশী দৌড়ঝাঁপ বা ছুটাছুটি পছন্দ করে না। এরা সাধারণতঃ শিকার করে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময়, যখন গবাদি পশুর পাল বাড়ী ফেরে অথবা চরে বেড়াবার জন্যে বেরোয়। এইসব পশুর মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট পথ থাকে। ঐ পথের ধারে সিংহ ওৎ পেতে বসে থাকে এবং সুবিধামত শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাতের বেলা গর্জন করে বন কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ইউরোপে সিংহের বংশ ধ্বংস পর বৃটিশেরা ভারতে এলে এখানের সিংহের দল রক্ষা পেল না তাঁদের হাত থেকে। সিংহেরা ফাঁকা জায়গায় কয়েকটি মিলে দল বেঁধে থাকে এবং খুব একটা স্থান পরিবর্তন করে না। তাছাড়া বেশীর ভাগ সময়েই সামনে থেকে আক্রমণ করে শত্রুর মোকাবিলা করে। এসব কারণে ওদের গুলি করে মারা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সিংহেরা বাঘের চেয়ে কতকটা কম শক্তিশালী হওয়ায় বহু সিংহও বাঘের হাতে মারা পড়ে, যখন তারা একই শিকারের পিছনে ধাওয়া করে।

তারপর সাহেবদের দেখাদেখি ভারতের তৎকালীন রাজা-জমিদারেরা মেতে ওঠলেন সিংহ-শিকারে। কে কতগুলি সিংহ হত্যা করেছে, তার উপর নির্ভর করতো তখনকার দিনের রাজা বা জমিদারের গৌরব, সম্মান, উপাধি ও প্রতিপত্তি। অনেকে

আবার নিজস্ব সখের চিড়িয়াখানা তৈরী করে সিংহ ধরে এতে পুষতেন এবং দরকারমত কোন শত্রু বা দুষ্কৃতকারীকে সেই সিংহের মুখে ফেলে দিতেন।

অধুনা একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় (13th seminar on Trypanosomiasis '73) প্রমাণিত হয়েছে যে, কিছু কিছু তৃণভোজী প্রাণীর দেহে 'ট্রাইপ্যানোসোমা' নামে একরকম সারা (Surra) রোগের জীবাণু স্বাভাবিকভাবে বাস করে। কিন্তু এসব তৃণভোজী প্রাণীকে যখন কোন মাংসাশী প্রাণী খায় তখন ঐ জীবাণুর দ্বারা তারাও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সিংহ এবং আরও কিছু কিছু মাংসাশী প্রাণী এভাবে খাদ্য-খাদক রোগ-সংক্রমণের বলি হয়ে সংখ্যায় হ্রাস পেতে পারে।

সিংহীদের বাচ্চা হবার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। সাধারণতঃ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সিংহের যৌন-মিলন ঘটে এবং জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে বাচ্চা হয়। একসঙ্গে মাত্র দু-তিনটির বেশী বাচ্চা হয় না। (কিন্তু বন্দী অবস্থায় প্রসবের মাত্রা খুব কমে যায়। অন্ততঃ কম করে মাঝে দু-বছর ফাঁক দিয়ে বাচ্চা হয়)। 3 বছর বয়স থেকে সিংহীদের সন্তান-ধারণের ক্ষমতা হয়ে থাকে। এদের জীবনকাল মাত্র 20 বছর। এসব থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার আশা বেশ কম।

সিংহ সাধারণতঃ মানুষ খায় না এবং নিতান্ত বিপাকে না পড়লে সিংহ মানুষকে তাড়া করে না। 1880 সাল পর্যন্ত এদের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, সিন্ধু উপত্যকা ও বিহারের পালামৌ প্রভৃতি স্থানে প্রায়ই দেখা যেত। 1890 সাল থেকে এদের সংখ্যা কমতে থাকে। বিজ্ঞানী উইন্টার ব্লিথের মতে, 1959 সালেও কাঠিয়াবাড়ের গীর জঙ্গলে (500 বঃ মাঃ) 290টি সিংহ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ওই জঙ্গলে মাত্র 170টি সিংহ বাস করে (1968 সালের গণনানুসারে) এবং ভারতে এখন গীরই সিংহের একমাত্র বাসস্থান। অধুনা ভারত সরকার সিংহ শিকার আইনতঃ দণ্ডনীয় একটি অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন। এদের অবক্ষয়ের পথ রোধ করবার জন্যে জনসাধারণেরও যথেষ্ট সচেতন হওয়া দরকার।

শ্রীতাপসকুমার দে

ইলেকট্রনিক কম্পিউটার

বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। এই কম্পিউটার যদি না থাকতো, তাহলে মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না চাঁদে পাড়ি দেওয়া এবং বর্তমান প্রায় সমগ্র গবেষণার কাজই ব্যাহত হতো। ইলেকট্রনিক কম্পিউটার আজকের যুগে চিকিৎসাবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগকে নিঃশব্দে সেবা করে চলেছে।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটার, যা আজ আমরা ব্যবহার করছি, তা তৈরী হয়েছে বহু বৈজ্ঞানিকের চেষ্টার ফলে। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় এবং দ্রুত মেসিন হচ্ছে আই. বি. এম. 370। এই মেসিনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, পেনসিল ও কাগজে যে কাজ করতে লাগতো প্রায় 15 বছর, এখন সেই কাজ কম্পিউটারে করতে লাগছে 8 সেকেণ্ডের মত। ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের আগে ছিল ডেস্ক ক্যাল-কুলেটার। এই ডেস্ক ক্যালকুলেটারেও চারটি অপারেসন করা যেত—যোগ বিয়োগ, গুণ ও ভাগ। কিন্তু ডেস্ক ক্যালকুলেটর কোন লজিক্যাল ডিসিসন নিতে পারতো না। বর্তমান ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ঐ পাঁচটি অপারেসন করছে একই সঙ্গে এবং অনেক দ্রুত গতিতে। যদিও এই মেসিনের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করেন চার্লস বোবেজ নামে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের এক অধ্যাপক 1828 সালে, কিন্তু তারপরও শতাধিক বছর লেগেছে প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তৈরী করতে। সেই কম্পিউটার উন্নত হতে হতে বর্তমানে আমরা পেয়েছি আই. বি. এম. 370।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের এক অবিভাজ্য অঙ্গ হচ্ছে পাঞ্চ কার্ড মেসিন। পাঞ্চ কার্ড হচ্ছে 80 কলাম কার্ড। এর 12টি সারি আছে, তার মধ্যে 2টি বিশেষ সারি আছে— আলফা অক্ষর অর্থাৎ A. B. C. D এবং বিশেষ বিশেষ অঙ্ক নির্দেশ করবার জন্যে। এই পাঞ্চ কার্ড যখন পাঞ্চ কার্ড মেসিনের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন ঐ মেসিনের যে যে চাবিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে, সেই চাবি অনুযায়ী কার্ডে ছিদ্র হয় এবং তা কার্ডের উপর ছাপা হয়ে যায়। এই মেসিন 1901 সালে হলারিথ প্রথম প্রচলিত করেন। তখন কার্ডে শুধু সংখ্যাটি ব্যবহার করা যেত, তারপর এই পাঞ্চ মেসিন উন্নত হতে হতে আজ আমরা পেয়েছি আই. বি. এম. 029 পাঞ্চ কার্ড মেসিন। পাঞ্চ কার্ড মেসিন আমাদের টাইপ রাইটার মেসিনের মত, এখানে শুধু কার্ডের উপর ছিদ্র হয়ে যায়।

পাঞ্চ কার্ড মেসিনে কার্ডটি পাঞ্চ হয়ে যাবার পর কার্ডটি ভেরিফায়ার মেসিনের মধ্যে দিয়ে চালনা করা হয়। যদি কোন জায়গায় ভুল ছিদ্র হয়ে থাকে, তবে ভেরিফায়ার

মেশিন সেইখানেই আটকে যাবে, আর যাবে না,—যতক্ষণ না এই কার্ডটি আবার ঠিক ভাবে পাঞ্চ হচ্ছে। পাঞ্চ মেশিন ও ভেরিফায়ার মেশিন—যেমন একটি অন্যটির পরিপূরক। ভেরিফায়ার মেসিনেরও নম্বর আছে, যেমন—আই. বি. এম. 029

কোন বিষয়ের বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমে ঐ বিষয়টি কি ভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে, তা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে ঠিক করে নিতে হবে। তারপর ঐ ফ্লো চার্ট অনুযায়ী প্রোগ্রাম করতে হবে। প্রোগ্রাম করবার জন্যে নানা রকমের ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ মেশিন তো আর আমাদের ভাষা বোঝে না। এই ভাষাগুলির মধ্যে অ্যাসেমব্লার, ফ্রোটন, অ্যালগল, ক্রোবল প্রভৃতি অন্যতম। এই ভাষাগুলির মধ্যে যে কোন একটি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে হবে। তারপর ঐ প্রোগ্রাম পাঞ্চ কার্ডে পাঞ্চ করে নিতে হবে। সমস্ত প্রোগ্রাম পাঞ্চ কার্ডে পাঞ্চ হয়ে যাবার পর ঐ পাঞ্চ কার্ড আসবে কম্পিউটারে।

ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটারকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—কার্ডরিডার, সেন্ট্রাল প্রসেসার এবং প্রিন্টার। প্রথমে পাঞ্চ কার্ডগুলি কার্ডরিডারের মধ্যে দিয়ে চালনা করা হয়, তখন কার্ডরিডার কার্ডগুলি পড়ে নেয় এবং প্রিন্টার কার্ডে যা যা পড়া হচ্ছে, তা সঙ্গে সঙ্গে ছেপে দেয়। সমস্ত কাজ করে সেন্ট্রাল প্রসেসার। সেন্ট্রাল প্রসেসারকে মানুষের মাথার সঙ্গে তুলনা করা যায়। মানুষের মাথা যেমন দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চালনা করে এবং যা যা মনে রাখবার দরকার সেই সমস্ত তথ্য স্টোর করে রেখে দেয়, তেমনি সেন্ট্রাল প্রসেসারও রিডার ও প্রিন্টারকে চালনা করে এবং সমস্ত তথ্য স্টোর করে রাখতে পারে। কার্ডরিডার এক মিনিটে প্রায় 800 শত কার্ড পড়তে পারে। কার্ডগুলি পড়া হয়ে যাবার পর তার সমস্ত অনুভূতি সেন্ট্রাল প্রসেসারে চলে আসে। সেন্ট্রাল প্রসেসার প্রথমে ঐ প্রোগ্রামটি পরীক্ষা করে দেখে কোথাও কোন ভুল আছে কি না। সেন্ট্রাল প্রসেসারের চক্রকাল হচ্ছে 2·2 মাইক্রো-সেকেণ্ড (1 মাইক্রো সেকেণ্ড $=10^{-6}$ সেকেণ্ড)। সেন্ট্রাল প্রসেসার যদি দেখে কোথাও ভুল আছে, তাহলে কোথায় ভুল এবং কি রকমের ভুল, তা প্রিন্টারে ছেপে দেয়। আর যদি ভুল না থাকে, তবে ঐ প্রোগ্রামটি স্টোর করে রেখে দেয়। তারপর যখন সংখ্যা-দেওয়া কার্ড কার্ডরিডার থেকে পড়বার পর সেন্ট্রাল প্রসেসারে আসে, তখন সেন্ট্রাল প্রসেসার আগে যে প্রোগ্রামটি স্টোর করে রেখেছে, সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী ঐ সংখ্যা-কার্ড নিয়ে বিশ্লেষণ আরম্ভ করে। বিশ্লেষণ শেষ হবার পর ঐ বিষয়ের যা যা উত্তর হলো, তা প্রিন্টারে ছেপে দেয়। প্রিন্টার এক মিনিটে প্রায় 400 লাইন ছাপতে পারে।

এখন এই গতির যুগে আমাদের কাজ অনেক বেড়ে গেছে এবং তা করতে হচ্ছে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে এবং নির্ভুলভাবে। তাই ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই। সেই ইলেকট্রনিক কম্পিউটারকেই সবচেয়ে

বড় বলা হয়, যার ষ্টোর করবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী এবং বিশ্লেষণ করতে পারে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে। প্রত্যেক বছরেই মেসিনের প্রভূত উন্নতি হচ্ছে। সুতরাং কোন্ মেসিন যে সবচেয়ে বড় এবং বিশ্লেষণের গতি সবচেয়ে দ্রুত, তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। এখনও পর্যন্ত আই. বি. এম, 370 মেসিন সবচেয়ে বড় এবং দ্রুত। তার ষ্টোর করবার ক্ষমতা এত বেশী যে, কারও পক্ষে সমস্ত স্টোর ব্যবহার করা সম্ভব নয় এবং তার বিশ্লেষণের গতি হচ্ছে 1 মাইক্রো-সেকেণ্ড। ইলেকট্রনিক কম্পিউটার আজ মানুষের সেবায় নিয়োজিত থেকে নিঃশব্দে মানুষের অশেষ উপকার করে চলেছে।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যে ভাবে দ্রুতগতিতে উন্নত হচ্ছে, তা দেখে হয়তো মনে হতে পারে যে, এমন একদিন আসবে, যখন কোন বৈজ্ঞানিকের বদলে একটা কম্পিউটার কাজ করবে। কিন্তু তা কোন দিনই সম্ভব নয়; কারণ ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের কোন বুদ্ধি নেই, কাজেই নতুন কোন পরিস্থিতিতে কি ভাবে কাজ করতে হবে, তা চিন্তা করবার তার কোন ক্ষমতা নেই। সুতরাং ইলেকট্রনিক কম্পিউটার কখনও কোনও বৈজ্ঞানিকের পরিবর্তে ব্যবহার হতে পারে না, শুধুমাত্র এসব ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য করে দ্রুত গতিতে কোন নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে।

শ্রীসৌমেন্দ্রকুমার দত্ত*

* কম্পিউটার সেণ্টার, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

গত 4ঠা ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'সত্যেন্দ্র ভবনে' আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পরিষদ-সভাপতি অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায় এবং আচার্য বসু সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক সুবোধনাথ বাগচী।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কিশোর কল্যাণ পরিষদের বনানী মিত্র, বুলবুলি কর ও বিজন ভট্টাচার্য। এর পর পরিষদের কর্ম-সচিব অধ্যাপক পরিমলকান্তি ঘোষ এই স্মৃতি-সভায় বক্তৃতা প্রদানের জন্যে অধ্যাপক বাগচীকে আহ্বান জানান।

অধ্যাপক বাগচী তাঁর বক্তৃতায় আচার্য বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করে 'বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্ম' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য বসুর কাছে আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন: 'যাঁরা দেশকে ভালবাসেন এবং দেশের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, তাঁদের পক্ষে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে উপেক্ষা করে স্বীয় ক্ষমতা ও নিজস্ব

চরিত্রমাহাত্ম্য বজায় রেখে খুব বড় কিছু দেশের জন্যে করা সম্ভব হয় না। আমার মনে হয়, অনুকূল পরিবেশের অভাবেই সত্যেন বোসের মত প্রতিভাও তার পরিপূর্ণতা ও বিকাশ লাভ করতে পারে নি। এজন্যে বর্তমানে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, জনসাধারণের জীবন-দর্শন পরিবর্তন এবং যুক্তিবাদী মানবতার প্রতিষ্ঠা।'

সভাপতি অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে আচার্য বসুর স্মৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন: 'আমরা যদি আচার্যদেবের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ এবং তাঁর অন্তরাকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি, তবেই সার্থক হবে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন।'

অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত।

সত্যেন্দ্রনাথ বোস ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্যাল সায়েন্সেস

4ঠা ফেব্রুয়ারী ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত স্মৃতি সভায় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ 'আয়নমণ্ডল গবেষণায় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান' সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং আচার্য বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিজ্ঞান বিভাগের ডীন অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়। প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন সহ-উপাচার্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দুকুমার বসু।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

কলকাতার ময়দানে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে গত বছরের মত এই বছরও বিজ্ঞান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়।

ফেব্রুয়ারী (1975) মাসের 15 তারিখ পর্যন্ত বিকেল 3টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল। এখানে বহু আকর্ষণীয় মডেল প্রদর্শিত হয়েছে। মডেলের সংখ্যা প্রায় 200-র কাছাকাছি। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বালী বিজ্ঞান তীর্থ, কোন্নগর সায়েন্স ক্লাব, বিজ্ঞান দীপ, বি. ই. কলেজ প্রভৃতি প্রায় 18টি সংস্থা। প্রদর্শনীটির এই মণ্ডপকে রামেন্দ্রসুন্দর মণ্ডপ নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এখানে মাতৃভাষার মাধ্যমেই সমস্ত মডেল ব্যাখ্যা করা হয়।

বিজ্ঞানের নানান বিভাগকে কেন্দ্র করেই সমস্ত মডেল সাজানো হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ যে কতটা বিস্তার লাভ করেছে, তা প্রদর্শনী দেখবার জন্যে অপেক্ষমান জনতার ভীড় দেখে সহজেই অনুমান করা গেছে। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত প্রদর্শনী দেখেছে।

বালী বিজ্ঞান তীর্থের পরিচালনায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী

বালী বিজ্ঞান তীর্থ 25শে ডিসেম্বর '74 থেকে 29শে ডিসেম্বর '74 পর্যন্ত বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ।

প্রদর্শনীতে স্বয়ংক্রিয় লোকগণক-যন্ত্র, দেড় মিনিটে চা বা কফি তৈরীর যন্ত্র, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপ, ইনটেগরেটেড স্কেল প্রভৃতি বিভিন্ন মডেল খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বিজ্ঞান তীর্থের মুখপত্রটির নাম 'শাশ্বত'। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বলিত বহু আকর্ষণীয় প্রবন্ধ অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় এতে প্রকাশিত হয়েছে। এটি খুবই ভাল হয়েছে। প্রদর্শনীতে বহু লোকসমাগম হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকেও কিছু মডেল এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল।

শ্রীরামপুর চাতরায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী

কল্পতরু ছোটদের আসর আয়োজিত সপ্তম বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় চাতরা দত্তপাড়া লেনে 29শে ডিসেম্বর '74 থেকে 1লা জানুয়ারী' 75 পর্যন্ত। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগগুলিতে প্রদর্শিত নানান মডেলগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় রোবট্, এরোমডেল, বাটিক্ প্রিন্ট করবার পদ্ধতি, বাড়ীতে ব্যবহৃত রেডিওগ্রামকে স্টিরিওতে পরিণত করবার সহজ উপায় এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে ডাকটিকিট সংগ্রহ করবার নিয়ম।

এই সঙ্গে আয়োজিত প্রতিযোগিতাতে বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে পীযুষকান্তি রায়, রমা সরকার, শ্যামল সাহা, অসীম বক্সি, তপন রায়, বিমল নাগুরী ও অভয় দীঘাঙ্গী।

প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক রচনা সম্বলিত ক্ষুদ্র স্মারক পত্রিকাটিও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। প্রদর্শনীতে স্থানীয় বহু ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণের সমাগম হয়েছিল।

বৃহস্পতি গ্রহে জল

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বৃহস্পতির বাষ্প-মণ্ডলে জলের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন—সৌরমণ্ডলের এই গ্রহটিতে কোন না কোন ধরণের জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে কিনা, সে প্রশ্নের মীমাংসার পথে এই আবিষ্কারকে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ বলেই মনে করেছেন।

অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যারল্ড লারসন এক সাক্ষাৎকারে বলেন—'সন্দেহ নেই, ওখানে জল রয়েছে।'

17 ফেব্রুয়ারী'75 গডার্ড মহাকাশ কেন্দ্রে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতির সভায় বিশেষজ্ঞদের সামনে এই আবিষ্কার সংক্রান্ত সকল তথ্য উপস্থিত করা হয়।

এর আগে চলতি শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই বৃহস্পতির বাষ্পমণ্ডলে এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি পৃথিবীতে জীবন-সৃষ্টির আদি-পর্বে প্রয়োজন হয়েছিল।

ডক্টর লারসন বলেন—বৃহস্পতি গ্রহে জলের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় সৌরমণ্ডলের রাসায়নিক গঠনের চিত্রটি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠলো। এতদিন পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে গবেষণায় জলের অস্তিত্ব শুধুমাত্র অনুমান করে নেওয়া হয়েছিল—এবার তার প্রমাণ মিলেছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সত্যেন্দ্র ভবন

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6

ষড়বিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন, 1974

27শে ডিসেম্বর '74 — শুক্রবার, বৈকাল 5 30 মিঃ

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই ষড়বিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট 31 জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অধিবেশন পরিচালিত হয়।

1. কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীজয়ন্ত বসু এই অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণকে স্বাগত জানিয়ে গত 1973-74 সালের জন্যে পরিষদের বিবিধ কাজ-কর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে তাঁর লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তিনি প্রারম্ভে বলেন যে, গত জুলাই মাসে পরিষদের ষড়বিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানের সভায় পঠিত কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বছরে পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা ও আর্থিক অবস্থাদির বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছিল এবং সেটিকেই মোটামুটিভাবে 1973-74 সালের বার্ষিক বিবরণী হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। (উক্ত বিবরণী 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নভেম্বর '74 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।) যা হোক, তিনি পরিষদের বিবিধ কাজ-কর্ম ও আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণী প্রদান করেন।

এই বিবরণীতে তিনি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক প্রকাশ, বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা, বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন, গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও হাতে-কলমে বিভাগ পরিচালনা এবং 'সত্যেন বোস বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের' উদ্বোধন, 'আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি ফলক' অর্পণ, পরিষদের শাখা গঠন প্রভৃতি কর্মধারা বর্ণনা করেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের স্মরণে উৎসর্গীকৃত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' দুটি বিশেষ সংখ্যার (মার্চ ও জুলাই-অগাষ্ট, '74) বিষয় তিনি উল্লেখ করেন এবং জানান যে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যা অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরও শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর জন্য বিজ্ঞান-পরিষদ প্রণীত ও পূর্ব-প্রকাশিত 'ভৌত বিজ্ঞান' নামক পাঠ্যপুস্তকটির পরিপূরক হিসাবে দশম শ্রেণীর জন্যও ঐ বিষয়ে একটি পাঠ্যপুস্তক পরিষদ কর্তৃক সম্প্রতি রচিত হয়েছে। আলোচ্য বছরে পরিষদ পরিচালিত পাঠাগার কর্তৃক যে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছিল, তিনি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরিষদের অন্যান্য কর্মধারার মধ্যে তিনি বিশেষভাবে গত অক্টোবর মাসে সত্যেন্দ্র ভবনের নবনির্মিত দ্বিতলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও হাতে-কলমে কেন্দ্রের উদ্বোধনের বিষয় উল্লেখ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিবিধ কাজের বাস্তব রূপায়ণের জন্যে কর্মসচিব মহাশয় সভ্যবৃন্দের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করেন।

2. হিসাব-বিবরণী ও ব্যয়-বরাদ্দ

গত 1973-74 সালের পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালান্স সিট) পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ সভার অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপিত করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেন। উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক আলোচনান্তে উক্ত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কোষাধ্যক্ষ মহাশয় পরিষদের বিদায়ী কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত 1974-75 সালের জন্য পরিষদের আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দপত্র বা বাজেট সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। উক্ত ব্যয়-বরাদ্দপত্র উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

3. কার্যকরী সমিতি গঠন

1974-75 সালের জন্য পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও সদস্যপদের উদ্দেশ্যে যে সব মনোনয়ন-পত্র পাওয়া গেছে, সেগুলির তালিকা কর্মসচিব মহাশয় সভায় পেশ করেন। এই বিষয়ে আলোচনায় শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ, শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ, শ্রীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীআশিষ সিংহ প্রমুখ সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উল্লিখিত পদগুলির জন্য যে তালিকা বিদায়ী কার্যকরী সমিতি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে, কর্মসচিব মহাশয় অতঃপর সেটি সভায় সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন এবং সভ্যগণ কর্তৃক যথোচিত আলোচনার পর সেটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এই তালিকা অনুযায়ী পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলীর বিভিন্ন পদে ও সাধারণ সদস্যরূপে নিম্নলিখিত সভ্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হলেন বলে ঘোষিত হয়।

কার্যকরী সমিতি

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ঃ

সভাপতি—শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সভাপতি—শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ

শ্রীঅমূল্যধন দেব

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ

শ্রীমহাদেব দত্ত

শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর

কর্মসচিব—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীজয়ন্ত বসু

সহযোগী কর্মসচিব—শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

সদস্য ঃ

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

শ্রীগণেশচন্দ্র নন্দী

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় দেব

শ্রীদেবাশিষ বসু

শ্রীনলিনীচাঁদ কুণ্ডু

শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত

শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরমেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী

শ্রীসমীরকুমার ঘোষ

শ্রীসুনীলকুমার সিংহ

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

4. হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের 1974 7..

সালের হিসাব-পত্র পরীক্ষা করবার জন্য হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর) রূপে পরিষদের পূর্বতন হিসাব-পরীক্ষক মেসার্স মুখার্জী, গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর নাম প্রস্তাবিত হয় এবং এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

5. অনুমোদকমণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ অনুমোদক হিসাবে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
শ্রীঅমূল্যধন দেব
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় দেব
শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল

6. বিবিধ

পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীস্বপনকুমার শীল পরিষদের কাঁচড়াপাড়া শাখার পক্ষ থেকে পশ্চিম বঙ্গের মফঃস্বল অঞ্চলে পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, এই প্রচেষ্টাকে যথার্থভাবে সার্থক করে তুলতে হলে আমাদের সকলের আন্তরিক উদ্যোগের একান্ত প্রয়োজন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা ছাড়াও পরিষদের পক্ষ থেকে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী একটি ক্ষুদ্রতর পত্রিকা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। পরিষদের অন্যতম সভ্য ও প্রাক্তন কর্মসচিব শ্রীসুবোধনাথ বাগচী পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টায় সভ্যগণের সক্রিয় সহযোগিতা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের "মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার" স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হলে পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের সঙ্গে পরিষদের সংযোগসাধনের কাজে সভ্যগণকে অধিকতর সচেষ্ট হতে হবে।

7. সভাপতির ভাষণ

অধিবেশনের সভাপতি শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া উপস্থিত সভ্যগণকে পরিষদের প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রচারের মত গঠনমূলক কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন এবং বলেন যে, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার প্রধান অঙ্গ হিসাবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন কর্মসূচীগুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করা আমাদের প্রধান কর্তব্য। তিনি বিজ্ঞান পরিষদের সামগ্রিক কর্মপ্রচেষ্টায় সকল সভ্যের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

স্বাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

স্বাঃ জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অনুমোদকমণ্ডলীর স্বাক্ষর :

স্বাঃ অনাদিনাথ দাঁ
স্বাঃ অমূল্যধন দেব
স্বাঃ দেবেন্দ্রবিজয় দেব
স্বাঃ রাধাকান্ত মণ্ডল
স্বাঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞপ্তি

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 8নং ফর্ম
অনুযায় বিবৃতি :—

1. যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়, তাহার ঠিকানা :—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
2. প্রকাশনের কাল—মাসিক
3. মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
4. প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয় পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

5. সম্পাদকের নাম	জাতি ও ঠিকানা
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রধান সম্পাদক)	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীজয়ন্ত বসু	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-6

6. স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান), পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

আমি, শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে
প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা

তাং 1-3-75